বাংলা ছন্দ

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
সলিল কুমার বসু
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
পি-১২, সি. আই. টি. নিউ রোড
কলিকাতা-১৪

স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর

৺অবনীভূষণ ভট্টাচার্যের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম

গ্রন্থকারের নিবেদন

গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে যে পরিমাণ আলোচনা হইয়াছে তাহার তুলনায় বাংলা ছন্দের উপর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ইহার কারণ, বাংলা ছন্দের গঠন ও শ্রেণীভেদ সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ সমস্যাই পণ্ডিতগণের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট করায় তাঁহাদের অধিকাংশ রচনাই বাদ-বিতণ্ডা-মূলক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল রচনা হইতে ছাত্র বা সাধারণ জিজ্ঞাসুর পক্ষে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। বি-এ ক্লাশে বাংলা ছন্দ পড়াইবার সময় বিদ্যার্থী ও সাধারণ পাঠকের এই অসুবিধার কথা অনুভব করিতাম। সেজন্য কতিপয় ছাত্র ও বন্ধুর আগ্রহে ১৯৪৫ সালে এই গ্রন্থের প্রথম খসড়া রচনা করি। অপরের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আমি এই গ্রন্থ লিখি নাই। তাহার পরিবর্তে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। এবং বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ও সংস্কৃত, অপভ্রংশ, হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া ও অসমীয়া ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের তুলনা করিয়া এই সামঞ্জস্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাংলা ছন্দ বলিতে সাধারণতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পদ্য-ছন্দের কথাই বুঝান হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এখানে বাংলা ছন্দের ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া প্রাচীন বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পদ্যছন্দ, গদ্যছন্দ, সাহিত্যিক গদ্য, সনেট, প্রভৃতির কথাও বিস্তৃত ভাবে

আলোচনা করিয়াছি। ছন্দ সব দেশেই ভাষা ও সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন শুধুমাত্র বাংলা ছন্দের আলোচনা সমর্থন করা যায় না। আমরা এই গ্রন্থে বাংলা ভাষাতত্ত্বের, বিশেষ করিয়া বাংলা উচ্চারণ-তত্ত্বের দৃষ্টি হইতে বাংলা ছন্দকে পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবং বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির সহিত ইহার যোগসূত্র স্বীকার করিয়া লইয়া বাংলা ছন্দের বিবর্তন দেখানো হইয়াছে।

বাংলা-ছন্দ-কুরুক্ষেত্রের গাণ্ডীবধন্বা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে দৌলতপুর কলেজে সহকর্মীরূপে লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার সহিত দীর্ঘ আলোচনাই এই গ্রন্থ-রচনার মূল উৎস। পরে রংপুর কলেজে অধ্যাপনা-কালে সেখানকার ছাত্রদের আগ্রহে এই গ্রন্থ রচনা করি। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ও অন্য নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে চিন্তামুক্ত করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ইতি—

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য
ভাষাতত্ত্ববিৎ, ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগ,
মধ্যপ্রদেশ কেন্দ্র, ধরমপেঠ,
নাগপুর।

দোল পূর্ণিমা,
১৩৬২

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় ছন্দের ইতিহাস ও বাংলা ছন্দ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ছন্দের উপাদান

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী-বিভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ইতিহাস—আদি যুগ

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ইতিহাস—মধ্য যুগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ইতিহাস—আধুনিক যুগ

সপ্তম অধ্যায়

—গ্রন্থ সংক্ষেপ—

প. ক.	—পদ-কল্পতরু
ব. ভা. সা.	—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
বা. প্রা. পু. বি	—বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ
বা. সা. ই.	—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
O. D. B L	—The Origin and Development of the Bengali Language.

বাংলা ছন্দ

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় ছন্দের ইতিহাস ও বাংলা ছন্দ

ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার—ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা। এক জনের বক্তব্য অন্য লোকে যাহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারে, সেজন্য সমস্ত দেশেই বিধি নিষেধ দ্বারা ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। যে-শাস্ত্র ভাষাকে এই ভাবে শুদ্ধ ও স্পষ্ট করে, তাহাকে বলে ব্যাকরণ। কিন্তু মনের ভাব শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারিলেই মানুষ সব সময় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মানব জীবনের গভীর অনুভূতির কথা প্রকাশ করিতে হইলে, ব্যাকরণ-শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিলেই শুধু হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী ও মনোজ্ঞ ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সমস্ত সভ্য সমাজেই ভাষাকে শোভন ও বলশালী করিবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে। ছন্দ ও অলঙ্কার এইরূপ দুইটি কৌশল। ভাষাকে সুষমাযুক্ত, শক্তিশালী ও আভিধানিক গণ্ডী অতিক্রমে সক্ষম করিবার জন্য প্রাচীন কাল হইতেই ইহাদের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

ছন্দ ও সাহিত্য—'ছন্দস্'[১] শব্দের মূল অর্থ আনন্দ দান করা। আমরা যে সকল বাক্য ব্যবহার করি তাহাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে

১। নিরুক্ত-কার যাস্ক বলিয়াছেন—"ছন্দাংসি ছাদনাৎ"। দুর্গাচার্য ইহার টীকা করিয়াছেন, "যদেভিরাত্মানং আচ্ছাদয়ন্ দেবাঃ মৃত্যোর্বিভ্যতঃ তচ্ছন্দসাং ছন্দত্বম্"। কিন্তু 'চদি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ছন্দ শব্দের অর্থ 'আহ্লাদন'। সমস্ত অভিধানেই

সামঞ্জস্য (harmony), বিশেষ করিয়া পরিমাপ-গত সামঞ্জস্য, না থাকিলে ঐ সকল বাক্য ভাল শুনায় না। কতকগুলি বস্তু একস্থানে ভাল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলে তাহা যেমন বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইরূপ সুবিন্যস্ত শব্দ সমষ্টি দিয়া বাক্য গঠন করিলে তাহাও আমাদের প্রীতি বিধান করিয়া থাকে। বাক্যের বা পংক্তির (অর্থাৎ ছন্দ-পংক্তির) বিভিন্ন অংশের যে-বিশেষ পারিপাট্য বা সামঞ্জস্য ভাষায় এক অনির্বচনীয় দোলা উৎপন্ন করিয়া ভাষাকে শক্তিশালী ও মনোজ্ঞ করে, তাহাকে ছন্দ বা ছন্দ-স্পন্দ (rhythm) বলে। ছন্দ-যুক্ত বাণী সমস্ত দেশেই সাহিত্যের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ছন্দ রচনার বাহ্য সৌন্দর্য্য বর্ধিত করে মাত্র। অনেক রচনা উত্তম ছন্দ-যুক্ত হইয়াও কাব্য গুণের অভাবে সাহিত্য পদবী লাভ করিতে পারে না।

ছন্দের মূল তত্ত্ব—বিশ্ব সাহিত্যে নানা প্রকৃতির ছন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ছন্দের মূল তত্ত্বটি সর্বত্র সমান। ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিলে ভাষায় এক প্রকার চমৎকার গতি ও তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া ঐ পংক্তিটিকে অসাধারণত্ব দান করে, ছন্দতত্ত্বের ইহাই প্রধান কথা। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এ পর্যন্ত বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, ও তাহার ফলে ছন্দ-স্পন্দে ও ছন্দোবন্ধে নানা ভেদ দেখা দিয়াছে।

ছন্দের শ্রেণীভেদ : প্রস্ফুট ও অস্ফুট ছন্দ—ছন্দের মূল শ্রেণী দুইটি—প্রস্ফুট ছন্দ ও অস্ফুট ছন্দ। সুনির্দিষ্ট যতি-পতনের ফলে পদ্যপংক্তিতে

'ছন্দ' শব্দের এই অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্‌বেদেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—১, ৯২, ৬ ; ৮, ৭, ৩৬ দ্রষ্টব্য। পরে অর্থ-সঙ্কোচন হইয়া প্রথমে শব্দটির অর্থ হয় 'আনন্দ-দায়ক রচনা' এবং তাহার পর পদ্যের এক একটি প্যাটার্ণ বুঝাইতে শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। পরবর্তী কালে ইহার অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া শব্দটি যে-কোন বস্তুর গঠন, আকৃতি বা ভঙ্গী বুঝাইতে লাগিল। তুলনীয়, বাংলা 'ছাঁদ'।

স্পষ্ট ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন হইলে তাহাকে প্রস্ফুট ছন্দ বা পদ্য বলে। সাধারণতঃ পদ্য-বন্ধে এক প্রকার অতি-নিরূপিত ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; তাহাই প্রস্ফুট ছন্দ। প্রস্ফুট ছন্দের নিয়মিত যতি-পতন রচনাকে একটি বিশিষ্ট গঠন দান করে। পদ্যের এই বিশেষ বিশেষ ছাঁদ বা ছন্দোবন্ধ বা প্যাটার্ণকেও বাংলা ভাষায় ছন্দ নামেই অভিহিত করা হয়। যেমন পয়ার ছন্দ, ত্রিপদী ছন্দ। এই অর্থে সংস্কৃতে 'বৃত্ত' এবং ইংরেজীতে metre শব্দ ব্যবহৃত হয়। বৃত্ত শব্দে 'আবর্তন' অর্থাৎ সামঞ্জস্য-পূর্ণ পর্ব-দৈর্ঘ্যের বারম্বার আবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। এবং metre শব্দের মৌলিক অর্থ পরিমাপযোগ্য পদ্য পংক্তি। এই অতি-নিরূপতি ছাঁদ শুধু পদ্য ছন্দেই পাওয়া যায়। সেজন্য পদ্যেই ছন্দ আছে, গদ্যে নাই, এই রকম একটা ধারণা সাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। গদ্য অসম পর্বে গঠিত; ইহার নির্দিষ্ট কোন ছন্দোবন্ধ নাই। তাহা সত্বেও সুরচিত গদ্যবাক্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম ছন্দ অনুভূত হয়। ইহাকে অস্ফুট ছন্দ বলে। উৎকৃষ্ট লেখকগণের গদ্যে এই ছন্দ পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট গদ্যের ছন্দ অস্ফুট হইলেও অনস্বীকার্য।

অস্ফুট ছন্দের উপবিভাগ: হিব্রু-ছন্দ—ইয়োরোপের প্রাচীন হিব্রু-ছন্দ অস্ফুট ছন্দের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। লাতিন বাইবেল এই ছন্দে রচিত। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে বাইবেলের একটি অপূর্ব অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূল বাইবেলের সরল ছন্দ-স্পন্দটি সুন্দর ভাবে অনুকৃত হইয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যিক গদ্য এই বাইবেলী ছন্দের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বাক্যাংশের মধ্যে ভারসাম্যই (parallel clause) হইল এই প্রাচীন হিব্রু-ছন্দের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক ইংরেজী ও বাংলা গদ্য-ছন্দের উৎস অনুসন্ধান করিলে এই হিব্রু ছন্দের কথাই বার বার মনে পড়িবে।

আনুপ্রাসিক ছন্দ—প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যে এক শ্রেণীর অস্ফুট ছন্দ পাওয়া যায়। ইহার নাম alliterative verse বা আনুপ্রাসিক ছন্দ। এই ছন্দে রচিত অসম পংক্তিগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইত এবং প্রথম অংশে দুইটি ধ্বনি-সাম্য (অর্থাৎ অনুপ্রাস, alliteration) ও দ্বিতীয় অংশে অন্ততঃ একটি ধ্বনি-সাম্য থাকিত বলিয়া পংক্তিগুলিতে এক প্রকার অস্ফুট ছন্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন হইত। এই ছন্দের উদাহরণ স্বরূপ 'Widsith' নামক কাব্যের দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ; প্রথম পংক্তিতে *s*-এর ও দ্বিতীয় পংক্তিতে ***g***-এর অনুপ্রাস এক প্রকার অস্ফুট ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন করিয়াছে :

*S*wa *s*crithende | ge*s*ceapum hweorfath
*G*leemen *g*umena | *g*eond *g*rundafela.

[So wandering on the world about
Gleemen do roam through many lands]

বৃত্তগন্ধি ছন্দ—'বৃত্ত গন্ধি' নামে অভিহিত সংস্কৃত গদ্য ভঙ্গীতে অস্ফুট ছন্দ-স্পন্দ সৃষ্টি করার এক নূতন কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। "বৃত্তৈকদেশ সম্বন্ধাদ্ বৃত্তগন্ধি" (ছন্দোমঞ্জরী ৬ | ৪ —অর্থাৎ প্রস্ফুট ছন্দের এক একটি অংশ দিয়া গদ্য বাক্য রচনা করিলে, তাহা হইবে বৃত্তগন্ধি গদ্য-ভঙ্গী।

গদ্য ছন্দ—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য-ছন্দ নামে এক শ্রেণীর নূতন ছন্দে কাব্য রচনার পরীক্ষা চলিয়াছে। অস্ফুট ছন্দই এই শ্রেণীর ছন্দে স্ফুটতর হয়। গদ্য-ছন্দ অস্ফুট ছন্দেরই উৎকৃষ্ট রূপ মাত্র। এই শ্রেণীর কবিতায় পর্বগুলি অতি-নিরূপিত না হইলেও অপেক্ষাকৃত সংযত ও সংক্ষিপ্ত। পদ্য লেখকগণ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিধান মানিয়া পদ সংস্থাপন করেন বলিয়া তাঁহাদের রচনায় ছন্দ প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট। কিন্তু গদ্য-ছন্দের বাক্য বিন্যাসে যে সাম্য ও সুষমা থাকে, তাহা বিশেষ সূক্ষ্ম ধরণের।

প্রস্ফুট ছন্দের উপবিভাগ: অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দ—প্রস্ফুট ছন্দে রচিত পংক্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ ও সঙ্গতি দেখাইতে হইলে উহাদের পরিমাপ করা আবশ্যক। সেজন্য সমস্ত সমৃদ্ধ ছন্দ-গোষ্ঠীই পদ পরিমাপের কোন-না-কোন কৌশল অবলম্বন করে। পদে ব্যবহৃত অক্ষরের (syllable) সমষ্টি গণনা করা অথবা ঐ অক্ষরগুলি উচ্চারণের কাল পরিমাণ বা উহাদের মাত্রা-সমষ্টি নির্ণয় করা—এই দুই ভাবে সাধারণতঃ পদ পরিমাপ করা হয়। সুতরাং প্রস্ফুট ছন্দ দুই প্রকার, অক্ষর-ছন্দ ও মাত্রা-ছন্দ। প্রাচীন গ্রীক ছন্দের পরিমাপ মাত্রার হিসাবে করা হয়, তাই গ্রীক ছন্দ মাত্রাছন্দ (moric বা quantitative metre)। কিন্তু বৈদিক বা ইংরেজী পদ্য-বন্ধে অক্ষরকেই (syllable) পদ পরিমাপের ব্যষ্টি (unit) রূপে গ্রহণ করা হয়; তাই বৈদিক ও ইংরেজী ছন্দ অক্ষর-ছন্দ (syllabic বা qualitative metre)।

ভারতীয় ছন্দের ক্রমবিকাশ—ইয়োরোপে প্রাচীন যুগের মাত্রিক পদ্ধতি ক্রমে আক্ষরিক পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভারতীয় ছন্দের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এখানে প্রাচীন বৈদিক যুগের অবিমিশ্র অক্ষরছন্দই ক্রমে ক্রমে বাংলায় ও অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অবিমিশ্র মাত্রাছন্দে পরিণত হইয়াছে।

বৈদিক ছন্দ: মুক্তাক্ষর ও ঈষৎ বদ্ধাক্ষর—বৈদিক ছন্দ দুই প্রকার—ছন্দঃ ও অতিচ্ছন্দঃ। নিম্নলিখিত সাতটি বৈদিক ছন্দঃ বিশেষ প্রসিদ্ধ:

(১)	গায়ত্রী	২৪ অক্ষর
(২)	উষ্ণিক্	২৮ "
(৩)	অনুষ্টুভ্	৩২ "

(৪)	বৃহতী	৩৬ অক্ষর
(৫)	পংক্তি	৪০ ,,
(৬)	ত্রিষ্টুভ্	৪৪ ,,
(৭)	জগতী	৪৮ ,,

৫২ অথবা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক অক্ষর থাকিলে তাহা হইবে অতিচ্ছন্দঃ। যথা,

(১)	অতি-জগতী	৫২ অক্ষর
(২)	শক্করী	৫৬ ,,
(৩)	অতি-শক্করী	৬০ ,,
(৪)	অষ্টি	৬৪ ,,
(৫)	অত্যষ্টি	৬৮ ,,
(৬)	ধৃতি	৭২ ,,
(৭)	অতি-ধৃতি	৭৬ ,,
(৮)	কৃতি	৮০ ,,
(৯)	প্রকৃতি	৮৪ ,,
(১০)	আকৃতি	৮৮ ,,
(১১)	বিকৃতি	৯২ ,,
(১২)	সংস্কৃতি	৯৬ ,,
(১৩)	অভিকৃতি	১০০ ,,
(১৪)	উৎকৃতি	১০৪ ,,

এই সকল ছন্দে রচিত ঋক্‌গুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে দুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়—মুক্তাক্ষর ও আংশিক বদ্ধাক্ষর স্তর। প্রাচীনতম বৈদিক ছন্দ মুক্তাক্ষর (free syllabic metre), কারণ শুধু অক্ষরের সংখ্যা গণনা করিয়াই ঐ ছন্দের গঠন নির্ণয় করিতে হয়। কোন্ অক্ষর গুরু হইবে, কোন্‌টি লঘু হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। কিন্তু কোন কোন বৈদিক ছন্দে এইরূপ প্রচলনের আভাস পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর গায়ত্রী ছন্দ এই দিক্ দিয়া

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ ৮ অক্ষরের তিনটি চরণ দ্বারা গায়ত্রী ছন্দ গঠিত। এক শ্রেণীর গায়ত্রী ছন্দে অষ্টাক্ষর চরণের ৫ম ও ৭ম অক্ষর লঘু, ৬ষ্ঠ ও ৮ম অক্ষর গুরু। যেমন,

অগ্নির্হোতা | কবিক্রতুঃ
সত্যশ্চিত্র | শ্রবস্তমঃ
দেবো দেবে | -ভিরাগমেৎ। (১, ১, ৫)

অথবা

ইন্দ্রায়াহি | ধিয়েষি তা
বিপ্রজুতো | সুতাবতঃ
উপব্রহ্মা | নিবাযত। (১, ২, ৪)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বৈদিক যুগেই আংশিক ভাবে বদ্ধাক্ষরতা (fixed syllabic order) প্রবর্তিত হইয়াছিল।[১]

সংস্কৃত ছন্দঃ বৃত্ত ও জাতি

বৃত্ত ছন্দ—পরে সংস্কৃত যুগে বদ্ধাক্ষর ছন্দের বিশেষ প্রচলন হয়। এক শ্রেণীর সংস্কৃত ছন্দে পংক্তির কোন্ অক্ষর লঘু হইবে ও কোন্‌টি গুরু হইবে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে ইহার নাম বৃত্ত ছন্দ বা অক্ষর-ছন্দ। বৃত্ত ছন্দ বদ্ধাক্ষর, চতুষ্পদী ও প্রধানতঃ সমপদী। এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিবার জন্য ৮টি গণ-চিহ্ন প্রবর্তিত হয়। বৃত্ত ছন্দের 'গণ' দুই প্রকার—(ক) এক অক্ষরের ও (খ) তিন অক্ষরের। (ক) একটি লঘু অক্ষর বুঝাইতে 'ল' এবং গুরু অক্ষর বুঝাইতে 'গ' ব্যবহার করা হয়। (খ) তিন অক্ষরের গণ আদি লঘু=য়, মধ্য লঘু=র, অন্ত লঘু=ত, আদি গুরু=ভ, মধ্য গুরু=জ, অন্ত গুরু=স, সর্ব লঘু=ন, সর্ব গুরু=ম। কয়েকটি সমপদী বৃত্তছন্দ :

১ E. V. Arnold. *Vedic Metre*, পৃঃ ৯-১০ দ্রষ্টব্য

ছন্দের নাম	অক্ষর-বিন্যাস	অক্ষর-সংখ
অনুষ্টুভ্	ঈষৎ বদ্ধাক্ষর	৮ × ৪ = ৩২
ইন্দ্রবজ্রা	ত ত জ গ গ	১১ × ৪ = ৪৪
উপেন্দ্রবজ্রা	জ ত জ গ গ	১১ × ৪ = ৪৪
তোটক	স স স স	১২ × ৪ = ৪৮
ভুজঙ্গপ্রয়াত	য য য য	১২ × ৪ = ৪৮
দ্রুতবিলম্বিত	ন ভ ভ র	১২ × ৪ = ৪৮
বংশস্থ	জ ত জ র	১২ × ৪ = ৪৮
রুচিরা	জ ভ স জ গ	১৩ × ৪ = ৫২
মত্তময়ূরী	ম ত য স গ	১৩ × ৪ = ৫২
পথ্যা	স জ স য ল গ	১৪ × ৪ = ৫৬
বসন্ততিলক	ত ভ জ জ গ গ	১৪ × ৪ = ৫৬
তূণক	র জ র জ র	১৫ × ৪ = ৬০
মালিনী	ন ন ম য য	১৫ × ৪ = ৬০
পঞ্চামর	জ ব জ র জ গ	১৬ × ৪ = ৬৪
মন্দাক্রান্তা	ম ভ ন ত ত গ গ	১৭ × ৪ = ৬৮
শিখরিণী	য ম ন স ভ ল গ	১৭ × ৪ = ৬৮
হরিণী	ন স ম ব স ল গ	১৭ × ৪ = ৬৮
চিত্রলেখা	ম ভ ন য য য	১৮ × ৪ = ৭২
শার্দূলবিক্রীড়িত	ম স জ স ত ত গ	১৯ × ৪ = ৭৬
সুবদনা	ম র ভ ন য ম ল গ	২০ × ৪ = ৮০
স্রগ্ধরা	ম র ভ ন য য য	২১ × ৪ = ৮৪

মালিনী ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত :

সহি গগন-বিহারী কল্মষ ধ্বংস-কারী
দশ শত কর-ধারী জ্যোতিষাং মধ্যচারী।
বিধুরপি বিধিযোগাদ্ গ্রস্ততে রাহুণাসৌ
লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্‌ঝিতুং কঃ সমর্থঃ।

[যিনি গগন মার্গে বিচরণ করেন, যিনি অন্ধকার ধ্বংস করেন, যিনি কিরণ-রূপ দশ শত ভুজের অধিকারী এবং গ্রহগণের মধ্যে চলা-ফেরা করা যাঁহার অভ্যাস, সেই চন্দ্রকেও কি না দৈব-বশে রাহুগ্রস্ত হইতে হয় ! সুতরাং ললাট-লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে ?]

এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৫টি করিয়া অক্ষর (syllable) থাকে। ইহার ১-৬, ১০ ও ১৩, এই আটটি অক্ষর লঘু এবং অবশিষ্ট ৭টি অক্ষর গুরু। এই ভাবে অক্ষরগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় মালিনী ছন্দের প্রতি পাদে ১৫ অক্ষরে ২২ মাত্রা পাওয়া যাইবে। বৃত্তছন্দ বদ্ধাক্ষর বলিয়া ইহার মাত্রা সংখ্যাতেও মিল থাকিবে। কিন্তু এই ছন্দের গঠন গুরু-লঘু অক্ষরের অবস্থানের উপরেই নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে অক্ষর-ছন্দ বলা হয়।

জাতি ছন্দ—সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে আর এক শ্রেণীর ছন্দের কথা বলা হইয়াছে, তাহার নাম জাতি ছন্দ। বৃত্ত ছন্দের ন্যায় জাতি ছন্দও চতুষ্পদী। কিন্তু বৃত্ত ছন্দের সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য হইল, অক্ষর সংখ্যার পরিবর্তে অক্ষরের মাত্রা-সংখ্যা গণনা করিয়া এই ছন্দের গঠন নির্ণয় করিতে হয়। সেজন্য এই ছন্দের অন্য নাম মাত্রা-ছন্দ। তাহা ছাড়া, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বৃত্ত ছন্দ প্রধানতঃ সমপদী, কিন্তু জাতি ছন্দ প্রধানতঃ অসমপদী। 'আর্যা' প্রাচীনতম মাত্রাছন্দ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয়ে ১৮ ও চতুর্থে ১৫ মাত্রা থাকিবে। আর্যার একটি উদাহরণ :

গুণিগণ গণনারম্ভে
ন পততি কঠিনী সুসম্ভ্রমাদ্ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী
বদ বন্ধ্যা কীদৃশী নামা।

[গুণবান্ পুরুষ নির্ণয় কালে যাহার নাম সসম্ভ্রমে প্রথমে লিখিত না হয়, তাহার জননীও যদি পুত্রবতী হন, তবে বন্ধ্যা কে ?]

সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে বৈতালীয় ও ঔপচ্ছন্দসিক নামে আরও দুইটি মাত্রাছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুইটি ছন্দ মিশ্র মাত্রাছন্দ, কারণ ইহাদের প্রথম অংশ মুক্তাক্ষর কিন্তু দ্বিতীয় অংশ বদ্ধাক্ষর।

প্রাকৃত ছন্দ—সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় প্রাকৃত ছন্দও দুই প্রকার, বৃত্ত ও জাতি। বৃত্ত ছন্দে রচিত সুন্দর সুন্দর কবিতা প্রাকৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জাতি ছন্দ বা মাত্রাছন্দের প্রচলন নাই। সেজন্য মনে হয়, মাত্রাছন্দ প্রাকৃত যুগেরই নিজস্ব ছন্দ।

অপভ্রংশ ছন্দ: গাথা ও মাত্রাসমক-পাদাকুলক

ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসে প্রাকৃতোত্তর যুগের নাম অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ যুগ। এই সময় মাত্রাছন্দের প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং কবিদের লেখনী-মুখে অনেক নূতন ছন্দ সৃষ্টি হয়। অপভ্রংশ সাহিত্যের কবিগণ ছন্দ রচনায় প্রাকৃত যুগের কবি অপেক্ষা অধিক সাহসিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন। অপভ্রংশ ছন্দ বলিতে আমরা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত মাত্রাছন্দের কথাই বুঝাইব। অপভ্রংশ ছন্দের বৈশিষ্ট্য:

(১) চরণে চরণে মিত্রাক্ষর বা মিল ব্যবহার করার রীতি অপভ্রংশ ছন্দে প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই রীতি পরবর্তী যুগে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল।

(২) অপভ্রংশ ছন্দে অনেক সময় সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব-মাত্রিক ও হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘ-মাত্রিক প্রয়োগ পাওয়া যায়। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে রচিত অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ছন্দ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে স্পষ্টই লেখা আছে:

> জই দীহো বিঅ বণ্ণো
> লহু জীহা পঢ়ই হোই সে বি লহু।
> বণ্‌ণো বি তুরিঅ পঢ়িও
> দো তিণ্‌ণি বি এক্ক জাণেহু॥ (১, ৬,)

[যদি দীর্ঘ বর্ণ (ধ্বনি) লঘু করিয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহা লঘুই হইবে। এবং দুই তিনটি বর্ণের সংযুক্ত অক্ষর যদি ত্বরিত উচ্চারণে পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহাও এক মাত্রা বলিয়াই জানিবে।]

শতাবধান ভট্টাচার্য্যের পুত্র চিরঞ্জীব কৃত 'বৃত্ত-রত্নাবলী'তেও এই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় :

ক্বচিৎ সবিন্দুঃ ক্বচিদর্ধ বিন্দু
রোকার যুক্তোঽপি লঘুঃ ক্বচিৎ স্যাৎ।
উচ্চার্যমাণা ত্বরিত প্রযত্নাৎ
দ্বিত্রাশ্চ বর্ণাঃ ক্বচিদেক ভাবম্॥

দীর্ঘ ধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণের কথাই এই দুই স্থানে বলা হইয়াছে। কিন্তু 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' উচ্চারণ-শৈথিল্য বুঝাইবার জন্য যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে হ্রস্ব ধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণও পাওয়া যায়। যেমন,

মাণিণি | মাণহিঁ | কাইঁ	৪ + ৪ + ৩ = ১১ মাত্রা
ফল এও | জে চর | -ণে পড়ু | কান্ত	৪ + ৪ + ৪ + ৩ = ১৫ ,,
সহজে ভু | -অঙ্গম | জই	৪ + ৪ + ৩ = ১১ ,,
ণমই | কিং করি | -এ মণি | -মন্ত	৪ + ৪ + ৪ + ৩ = ১৫ ,,

শ্লোকটি অসম ছন্দে রচিত। ইহার দ্বিতীয় চরণে 'এ-ও', এই দুইটি দীর্ঘ ধ্বনিই হ্রস্ব ; তৃতীয় চরণে 'জে' হ্রস্ব। কিন্তু চতুর্থ চরণে 'ণমই'-র হ্রস্ব 'ই' দীর্ঘ, অর্থাৎ ইহা দুই মাত্রার করিয়া পড়িতে হইবে। সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, অপভ্রংশ ছন্দে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই সুলভ। ছান্দসিকগণও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

(৩) অপভ্রংশ ছন্দে বদ্ধাক্ষরতা পাওয়া গেলেও এই প্রকার ছন্দের সংখ্যা ও তাহাতে বদ্ধমাত্রিক অক্ষরের সংখ্যা অল্প। এই সময় হইতেই মাত্রিক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে।

(৪) জাতি ছন্দের ধারা অনুসরণ করিয়া এই যুগেও অসম ছন্দের অনুশীলন হইতে থাকে। আর্যাকে অপভ্রংশ ছন্দ-শাস্ত্রে বলা হয় গাহা বা গাথা ছন্দ। এই শাখা হইতে অপভ্রংশে নানা প্রকার অসম-পদী মাত্রাছন্দ সৃষ্টি হয়; যেমন, লক্ষ্মী, উগ্‌গাহা, বিগ্‌গাহা, গাহিনী, সিংহিনী, ইত্যাদি। হিন্দীর দোহা ছন্দে এইরূপ অসম ছন্দের ধারা প্রধানতঃ রক্ষিত হইয়াছে।

(৫) বৃত্ত ছন্দের সমপদ রচনার ধারাও এই যুগে অব্যাহত থাকে। অপভ্রংশ সাহিত্যে এক শ্রেণীর সমপদী মাত্রাছন্দ প্রাধান্য লাভ করে, তাহার নাম মাত্রাসমক। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬টি করিয়া মাত্রা থাকিবে। পাদাকুলক এক শ্রেণীর মাত্রাসমক ছন্দ। মাত্রাসমক ছন্দের কোন কোন অক্ষর বদ্ধ-মাত্রিক, কিন্তু পাদাকুলক ছন্দ সম্পূর্ণ মুক্তাক্ষর অর্থাৎ খাঁটি মাত্রাছন্দ। ইহাতে লঘু-গুরু অক্ষরের বিন্যাস সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, প্রতি চরণে ১৬টি করিয়া মাত্রা থাকিলেই হইল। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' আছে:

লহু গুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা
পঅ পঅ লেক্খউ উত্তম রেহা।
সুকই ফণিন্দহ কণ্ঠহ বলঅং
সোলহ মত্তং পাআউলঅম্‌॥ (১, ১২৯)

[যেখানে লঘু-গুরু সম্বন্ধে একটি নিয়মও মানিতে হয় না, যাহার প্রতি চরণে লঘু অক্ষর উত্তমরূপে (অর্থাৎ অধিক সংখ্যায়) ব্যবহৃত হয়, এইরূপ ১৬ মাত্রার ছন্দের নাম পাদাকুলক। এই ছন্দ সুকবি ফণীন্দ্রের (অর্থাৎ পিঙ্গল নাগের, ইনি ভারতীয় ছন্দ-শাস্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া কথিত) কণ্ঠ-বলয় (বিশেষ আদরের বস্তু)।]

পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত:

সের এক জই ¦ পাবউ | ঘিত্তা	৮ + ৪ + ৪ = ১৬
মণ্ডা | বীস প | -কাবউ ণিত্তা।	৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬
টংকু এক্ক জউ | সেধব | পাআ	৮ + ৪ + ৪ = ১৬
জো হউ | রংকো | সো হউ | রাআ॥	৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬

(১, ১৩০)

[যদি এক সের ঘি পাই, তাহা হইলে রোজ কুড়িটি করিয়া মণ্ডা বানাইব। ইহার উপর যদি এক 'টংক' পরিমাণ সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে দরিদ্রের রাজা হইতে বাকী কি থাকে ?]

অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ সাহিত্যে পাদাকুলক ছন্দের বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। "ফণীন্দ্রের কণ্ঠবলয়" যে জন-সাধারণেরও বিশেষ আদরের বস্তু হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই ছন্দ অপভ্রংশ যুগের নিজস্ব ছন্দ বলিয়া মনে হয়। এতদিনে বদ্ধাক্ষরতার বন্ধন হইতে কবিগণ মুক্তি পাইলেন। অবশ্য বদ্ধাক্ষরতা বৃত্তছন্দকে যে পারিপাট্য ও সুষমা দান করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। বৃত্তছন্দ ভারতীয় কাব্য-প্রতিভার এক অপূর্ব সৃষ্টি ও বিশ্ব সাহিত্যে এক বিস্ময়ের বস্তু, একথা অসঙ্কোচে বলা চলে। কিন্তু একই প্রকার অক্ষর-বিন্যাস বারম্বার আবর্তিত হয় বলিয়া বৃত্তছন্দ কিছুটা বৈচিত্র্যহীন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। অক্ষম কবিদের রচনায় ইহা সহজেই ধরা পড়ে। পাদাকুলক ছন্দে কবি স্বাধীন ভাবে অক্ষর ব্যবহার করিয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক পংক্তির সহিত অন্য পংক্তির অক্ষর-বিন্যাস-গত মিল না থাকায় ছন্দে গতি-বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইল। বাংলা ছন্দে এবং অপভ্রংশোত্তর অধিকাংশ প্রাদেশিক ছন্দে বদ্ধাক্ষরতা নাই। সেজন্য পাদাকুলক ছন্দ নবযুগের সূচনা করিল।

(৬) বৈদিক ও সংস্কৃত ছন্দে শ্লোকের এক একটি পাদ বা চরণ ইউনিট-রূপে গৃহীত হয়। অপভ্রংশ ছন্দেও তাই। চরণের মোট মাত্রা-সংখ্যার উপরেই অপভ্রংশ ছন্দের গঠন নির্ভর করে। কিন্তু অপভ্রংশ যুগে এক নূতন ক্রম-বর্ধমান ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিয়মিত যতি স্থাপন করিয়া একটি পদ্য পংক্তিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিবার চেষ্টা মাত্রাছন্দের প্রথম যুগ হইতেই দেখা যায়। তখন চার মাত্রার পরে সামান্য যতি স্থাপনের সূত্রপাত হয়। পিঙ্গল তাঁহার "ছন্দ-সূত্রে"

নামক প্রামাণিক ও আদি গ্রন্থে এইরূপ এক একটি অংশকে ৪ মাত্রার 'গণ' বলিয়া অভিহিত করেন। সেজন্য জাতি বা মাত্রাছন্দের আর এক নাম 'গণচ্ছন্দ'। আর্যা ছন্দেই চার মাত্রার 'গণ'-এর সূত্রপাত হইয়াছিল, বৈতালীয় ও ঔপশ্ছন্দসিক ছন্দে চার মাত্রার গণ-বিভাগ আরও স্পষ্ট। কিন্তু তখনও ভারতীয় ভাষার উচ্চারণে শ্বাসাঘাত (stressed accent) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় চার মাত্রার 'গণ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত জাতিছন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। অপভ্রংশ যুগের উচ্চারণে শ্বাসাঘাত অপেক্ষাকৃত প্রবল, সেজন্য সেই যুগের ছন্দে চার মাত্রার পরে যতি-স্থাপনের রীতি প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাহাই নহে, পাঁচ, ছয়, ও সাত মাত্রার পরে নিয়মিত যতি স্থাপন করিয়াও নূতন নূতন অপভ্রংশ ছন্দ রচিত হইতে থাকে।

(৭) অপভ্রংশ ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। বৈদিক ছন্দে বিভিন্ন গঠনের স্তবক (stanza) পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ চার চরণের এক একটি স্তবকে বা শ্লোকে রচিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়া যাওয়ায় সংস্কৃত ছন্দে স্তবক-বৈচিত্র্য নাই। অপভ্রংশ যুগে কবিগণ পুনরায় স্তবক-বৈচিত্র্যের প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। সেজন্য চার চরণের স্তবক তো আছেই। ইহা ছাড়া, দুই, তিন, পাঁচ ও ছয় চরণের স্তবকের কথাও 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' পাওয়া যায়। পূর্ব বর্ণিত পাদাকুলক ছন্দে প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের এবং তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মিল দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা হইতে মনে হয় পাদাকুলক ছন্দ প্রকৃত পক্ষে দুই চরণের ছন্দ। রাজসেনা (১৫, ১২, ১৫, ২১, ১৫), করভী, (১৩, ১১, ১৩, ১১, ১৫), নন্দ (১৪, ১১, ১৪, ১১, ১৪), প্রভৃতি ছন্দে পাঁচ চরণের স্তবক পাওয়া যায়। কুণ্ডলিকা ছন্দ (১৫+১৩, ১৫+১৩, ১৬+৮, ১৬+৮, ১৬+৮, ১৬+৮) ছয়টি চরণ দ্বারা গঠিত।

বাংলা ছন্দ—এবার ভারতীয় ছন্দের দৃষ্টিকোণ হইতে বাংলা ছন্দ পর্যালোচনা করিলে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িবে। বাংলা ছন্দের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা নীচে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল; পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে:

(১) বাংলা ছন্দ প্রধানতঃ অপভ্রংশ ছন্দ হইতে উৎপন্ন। অপভ্রংশের ধারা বাংলা ছন্দে পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়াছে।

(২) অপভ্রংশ ভাষায় অক্ষরবৃত্ত রচিত হইলেও খাঁটি অপভ্রংশ ছন্দ মাত্রাছন্দ। সেইরূপ বাংলার প্রধান ছন্দও মাত্রাছন্দ।

(৩) অপভ্রংশের মিত্রাক্ষরতা বাংলায় গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য বাংলায় অমিল ছন্দও আছে। মিলের বন্ধন হইতে ছন্দকে মুক্তি দিয়া বাঙালী কবি মধুসূদন অপভ্রংশ-পরবর্তী বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নবযুগ প্রবর্তন করেন।

(৪) বাংলা ছন্দেও স্বরধ্বনির তৎসম প্রয়োগ-রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। তবে পার্থক্য এই যে, আধুনিক বাংলা ছন্দে স্বরধ্বনির মাত্রা-মূল্য সম্বন্ধে বাংলার স্বকীয় রীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই বিষয়েও বাংলা ছন্দ অপভ্রংশ ছন্দ অপেক্ষা একপদ অধিক অগ্রসর হইয়াছে।

(৫) বাংলা ছন্দেও সমপদী ও অসমপদী, এই দুই প্রকার গঠনই পাওয়া যায়। তবে অপভ্রংশে যে-মাত্রাসমকতা দেখা দিয়াছিল, বাংলায় তাহাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

(৬) বাংলা ছন্দ বৃত্তছন্দের ন্যায় প্রধানতঃ সমপদী হইলেও বৃত্তছন্দ 'চতুষ্পদী', কিন্তু বাংলায় এমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। অপভ্রংশের এবং আধুনিক কালে ইংরেজী ছন্দের অনুসরণ করিয়া বাংলাতেও নানা প্রকার ও নানা সংখ্যার চরণ দ্বারা স্তবক রচিত হয়।

(৭) অপভ্রংশ যুগের অসম-মাত্রিক গাথা ছন্দ হিন্দীর উপর এবং সম-মাত্রিক ১৬ মাত্রার ছন্দ বাংলার উপর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হিন্দী চৌপঈ ছন্দ ষোড়শ-মাত্রিক। মালিক মহম্মদ জায়সীর কাব্যে ও তুলসীদাসের রামায়ণে এই ছন্দের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু হিন্দীর অন্যতম প্রধান ছন্দ 'দোহা' এবং প্রাচীন 'পৃথ্বিরাজ রাসৌ' কাব্যের বহু অসম ছন্দ গাথা হইতে উৎপন্ন বা গাথার অনুকরণ করিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। বাংলায় গাথা বা দোহা ছন্দের প্রচলন নাই। চর্য্যার কবিগণ এবং জয়দেব ১৬ মাত্রার এবং ১৬+১২=২৮ মাত্রার অপভ্রংশ ছন্দই অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুই ছন্দ হইতেই বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী উৎপন্ন হইয়াছে।

(৮) বাংলা ছন্দ অপভ্রংশ হইতে কি কি গ্রহণ বা বর্জন করিয়াছে, নূতন কি-ই বা সংযোজন করিয়াছে, এবং বাংলা ছন্দের সহিত বৈদিক, বৃত্ত ও জাতি ছন্দের সম্পর্ক ও পার্থক্য কি, এই সকল কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এবার প্রাক্ বাংলা ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের প্রধান পার্থক্যের কথা বলিব। বৈদিক, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দে পদ্য-পংক্তিই ছন্দের 'ইউনিট'। ঐ সকল ছন্দ সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত বলিয়া ছন্দের এক একটি অংশ দীর্ঘ হইতে পারিত। মন্দাক্রান্তা, শার্দূল-বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি ছন্দের দীর্ঘ চরণগুলি একটানা সুরে আবৃত্তি করা কষ্টকর এবং শ্রুতিকটু। সেজন্য ঐ সকল ছন্দে পাদের মধ্যে একটি বা দুইটি স্থানে সুরের বিরতি দেওয়া হইত। ইহার নাম যতি (caesura)। যেমন, ১৭ অক্ষরের মন্দাক্রান্তা চরণে ৪র্থ ও ১০ম অক্ষরের পরে ধ্বনি-যন্ত্র সামান্য বিশ্রাম পায়। যথা,

কশ্চিৎ কান্তা,-বিরহ গুরুণা, স্বাধিকার প্রমত্তঃ

কিন্তু এই ছন্দের গঠনে যতির কোন দান নাই। ঐ ১৭ অক্ষরের এক একটি চরণই মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রধান উপাদান। পূর্বের সমস্ত ছন্দেই সমগ্র পংক্তির দৈর্ঘ্য অনুসারে ছন্দের গঠন নির্ণয় করা হইত। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে শ্বাসাঘাত থাকায় বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় এক প্রকার 'ঝোঁক' উৎপন্ন হয়। এই 'ঝোঁক' বাংলা কবিতার এক একটি চরণকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে। সংস্কৃত ছন্দে যতি শুধু জিহ্বাকে বিরাম দেয়, ছন্দ গঠন করে না। কিন্তু বাংলা ছন্দে যাহাকে 'ঝোঁক' বলা হইল, তাহা বাংলা ছন্দ গঠন করে। সুতরাং 'যতি' ও এই ঝোঁক' এক বস্তু নহে। তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই 'ঝোঁক' বুঝাইবার জন্য 'যতি' শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। সেজন্য আমরাও ইহাকে 'যতি' বলিব। এই যতি-বিভক্ত চরণাংশকে পর্ব বলে। এই পর্বই বাংলা ছন্দের, বিশেষ করিয়া প্রস্ফুট ছন্দের, প্রধান উপাদান। প্রাক্-বাংলা ছন্দ পংক্তি-নির্ভর, কিন্তু বাংলা ছন্দ পর্ব-নির্ভর। প্রাক্-বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিতে হইলে পদ্য পংক্তিতে মোট কত অক্ষর বা কত মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পংক্তির কোন্ অক্ষর গুরু ও কোন্‌টি লঘু, তাহা নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু বাংলা ছন্দে পংক্তির মোট মাত্রা-সংখ্যা গণনা করিলেই চলিবে না। ঐ পংক্তি কয়টি পর্বে বিভক্ত, এবং তাহাদের মাত্রা-সংখ্যা কত, তাহা বলিতে হইবে। জাতিছন্দে নিয়মিত যতি পতনের সূত্রপাত হয় এবং অপভ্রংশ ছন্দে ইহা আরও স্পষ্ট হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কোন কোন অপভ্রংশ ছন্দের বর্ণনায় পর্ব-বিভাগের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়—যেমন, কুণ্ডলিকা বা দ্বিপদী ছন্দ। কিন্তু সে যুগে ছন্দের গঠনে যতি-বিভক্ত অংশের দান পুরাপুরি ভাবে স্বীকৃত হয় নাই। বাংলা ছন্দেই যতি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

বৈদিক কাল হইতে অপভ্রংশ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ বৎসর অথবা তাহারও পূর্ব হইতে খ্রীষ্টীয় ১০০০ বৎসর পর্যন্ত, ভারতীয় ছন্দের ক্রমবিকাশের কথা আলোচিত হইল। ইহার পরবর্তী ইতিহাস, অর্থাৎ জয়দেব ও চর্য্যা-কবিদের কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশের ধারাও আমরা দেখাইব। কিন্তু তাহার পূর্বে বাংলা ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার। বাংলা ছন্দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে বলা হইল। ঐ সকল বিষয় এবং বাংলা ছন্দের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। এ পর্যন্ত অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত বাংলা ছন্দের কথাই আমরা জানিতে পারিলাম। কিন্তু মূল সংস্কৃত এবং দেশী ও বিদেশী ছন্দ-গোষ্ঠী হইতেও নানা প্রকার ছন্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, বা হইতে পারে। তাহাদের কথাও জানা দরকার। সেজন্য এখন আমরা বাংলা ছন্দের গঠন, ইহার উৎপত্তি, ও ইহার বিভিন্ন শৈলীর কথা আলোচনা করিব। তাহার পর পুনরায় ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ দেখান হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ছন্দের উপাদান

বাংলা ছন্দের উপাদান চারটি,—অক্ষর বা মাত্রা, পর্ব (পদ), চরণ এবং স্তবক। এই চারটির মধ্যে অক্ষর বা মাত্রা বাংলা ছন্দের মূল উপাদান, পর্ব (পদ) ইহার প্রধান উপাদান। অক্ষর ও মাত্রা বাংলা ছন্দের ক্ষুদ্রতম ইউনিট (unit) এবং স্তবক ইহার বৃহত্তম ইউনিট। এখন আমরা এই সকল উপাদানের কথা একে একে আলোচনা করিব।

অক্ষর ও মাত্রা

অক্ষর—স্বরধ্বনি, অথবা স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত ক্ষুদ্রতম শব্দ বা শব্দাংশ 'অক্ষর' (syllable)। অ, আ, প্রভৃতি স্বরধ্বনি স্বয়ং উচ্চার্য, সেজন্য ইহারা 'অক্ষর'। কিন্তু ক্, খ্ প্রভৃতি ব্যঞ্জন-খণ্ড স্বরধ্বনির সহায়তা ব্যতীত স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা যায় না। সেজন্য 'ক্' অক্ষর হইবে না, ইহা একটি ধ্বনি (phoneme)। স্বরধ্বনি যুক্ত হইলে তবে ব্যঞ্জন-খণ্ডকে 'অক্ষর' বলা হইবে। যেমন, ক, কা, কি (ক্+অ, ক্+আ, ক্+ই) ইত্যাদি। (কোন কোন ভাষায় 'র্', 'ল্' ও 'ম্' দিয়াও 'অক্ষর' গঠন করিতে দেখা যায়। যেমন ইংরেজী, lit-tle, a-cre; ফারসী, হু-কুম্।)

অক্ষর সম্বন্ধে পারিভাষিক সমস্যা—বাংলা ভাষায় অক্ষর শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কখনও 'অক্ষর' শব্দের অর্থ ধ্বনি (phoneme); কখনও এই শব্দের দ্বারা ধ্বনির লিপি-মূর্তি বা হরফ (letter) বুঝান হয়; কখনও বা 'অক্ষর' বলিতে আমরা বুঝি শব্দের ক্ষুদ্রতম উচ্চার্য অংশ (syllable)। অক্ষর শব্দের এই বহু-বাচিতা বাংলা ছন্দের আলোচনায় অযথা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

রোমক লিপি ধ্বনি-মূলক (phonemic), যেমন, a, b, c, প্রভৃতি। কিন্তু ব্রাহ্মী হইতে উৎপন্ন ভারতীয় লিপি সমূহ আক্ষরিক (syllabic)—অর্থাৎ এক্ষেত্রে উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্য হরফের সঙ্গেই একটি অদৃশ্য -অ-কার সম্পৃক্ত থাকে। যেমন, ক=ক্+অ। এই লিপি-পদ্ধতির মূল অভিপ্রায় হইল, প্রতিটি অক্ষর বা উচ্চার্য-ধ্বনির জন্য এক একটি লিপি-চিহ্ন ব্যবহার করা। এই অদৃশ্য -অ-কারটি উচ্চারণ করিলে অক্ষর ও বর্ণে বড় বেশি ভেদ থাকে না। সংস্কৃত উচ্চারণে 'কম্পন' শব্দের শেষ ব্যঞ্জনাশ্রিত -অ উচ্চারিত হয়। সেক্ষেত্রে শব্দটিতে ৩টি বর্ণ এবং ৩টি অক্ষর পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে শব্দান্ত ব্যঞ্জনাশ্রয়ী -অ প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে বর্ণ ও অক্ষরের ভেদ ধরা পড়ে। 'কম্পন' শব্দটি ৩টি হরফ দিয়াই আমরা লিখি, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে ইহাতে ২টি অক্ষর (কম্-পন্), ও ৬টি ধ্বনি পাওয়া যায় (ক্-অ-ম্-প্-অ-ন্)। বর্ণ বা হরফ গণিয়া বাংলা ছন্দ নির্ণয়ের পুরাতন পদ্ধতিটি শুধু অবৈজ্ঞানিক নহে, ইহা ভ্রমপ্রসূ। বাংলাছন্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে, কি ভাবে শব্দটি লেখা হইতেছে তাহা বিচার্য নহে। শব্দের প্রকৃত উচ্চারণই সেখানে বিচার্য বিষয়। সেইজন্য অক্ষর শব্দের পারিভাষিক প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত শব্দগুলি নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হইবে:

অক্ষর: স্পষ্টভাবে উচ্চার্য ক্ষুদ্রতম শব্দ বা শব্দাংশ (syllable)।

ধ্বনি: একই উচ্চারণ-স্থান হইতে একই প্রণালীতে উচ্চারিত বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যে যেটি প্রধান (phoneme)।

বর্ণ: ধ্বনি বা অক্ষরের লিপি-রূপ, বা হরফ (letter)।

মৌলিক ও যৌগিক অক্ষর—একটি মাত্র অযুক্ত স্বরধ্বনি শেষে থাকিয়া অক্ষর গঠন করিলে উহাকে বলা হইবে মৌলিক অক্ষর।

যেমন, অ, রা, প্র, স্ক্রু (screw)। মৌলিক অক্ষরের শেষে যদি আরও উচ্চারিত স্বর বা ব্যঞ্জন থাকে এবং সব কয়টি ধ্বনিই যদি রসনার একটি অবিরাম গতি দ্বারা উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যৌগিক অক্ষর বলা হইবে। যেমন, অপ্, রাম্, প্রৌ (প্র+উ), স্ক্রুপ্। এখানে শব্দগুলির অক্ষর-গত বা উচ্চারণ-গত রূপ দেখান হইল। ইহাদের বর্ণ-রূপ (অর্থাৎ যে-ভাবে আমরা লিখি) হইবে—অপ, রাম, স্ক্রুপ।

স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর—অক্ষরের শেষে স্বর থাকিলে তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলিব। ইহা দুই প্রকার, মৌলিক স্বরান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত। ক-লি-কা-তা (ko-li-ka-ta , চার অক্ষর, চারটিই মৌলিক স্বরান্ত। পা-লা-মৌ (Pa-la-mau) তিন অক্ষর, প্রথম দুইটি মৌলিক স্বরান্ত ও তৃতীয়টি যৌগিক স্বরান্ত। অক্ষরের শেষ ধ্বনিটি ব্যঞ্জন হইলে তাহাকে ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর বলিব। যেমন, 'যায়' একটি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর; 'রাম্ দাস্ সেন্' তিনটি; 'রবীন্দ্র'—ইহার প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর মৌলিক স্বরান্ত, দ্বিতীয় অক্ষর হলন্ত (র+বীন্+দ্র)।

অক্ষরছন্দ—যে ছন্দে অক্ষরকে পংক্তি পরিমাপের মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম অক্ষরছন্দ। যেমন, বৈদিক ছন্দ। ইংরেজী ছন্দও অক্ষর-ছন্দ, তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অক্ষরের শ্বাসাঘাতও (stressed accent) বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। সংস্কৃত বৃত্তছন্দ আর এক প্রকার অক্ষরছন্দ। ইহা বৈদিক ছন্দের ন্যায় স্বাধীন অক্ষরছন্দ নহে, এই ছন্দের পংক্তিতে গুরু-লঘু অক্ষরের স্থান নির্দিষ্ট থাকে। বৃত্তছন্দের গঠন অনুকরণ করিয়া বাংলায় কবিতা রচিত হইতে পারে। কেবল এই সকল তৎসম ছন্দই বাংলা সাহিত্যে খাঁটি অক্ষর ছন্দ।

মাত্রা—অক্ষর উচ্চারণের কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। একটি অক্ষর স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করিতে এক মাত্রা সময় লাগে। এক মাত্রায় উচ্চারিত অক্ষরকে লঘু বা হ্রস্ব অক্ষর বলা হয়। দুই মাত্রায় উচ্চারিত অক্ষর গুরু বা দীর্ঘ। তিন মাত্রায় উচ্চারিত অক্ষরকে বলা হয় প্লুত।

মাত্রাছন্দ—যে ছন্দে অক্ষরের মাত্রাকে পংক্তি-পরিমাপের মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম মাত্রাছন্দ। প্রাচীন গ্রীক ছন্দ ও সংস্কৃত জাতিছন্দ মাত্রাছন্দ। তৎসম ছন্দ ব্যতীত বাংলার সমস্ত ছন্দই মাত্রাছন্দ। কিভাবে বাংলা ছন্দের মাত্রা নির্ণয় করিতে হইবে তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

মাত্রা-বিচার—সেকালে বাংলা পদ্যে সমস্ত অক্ষরকেই ছন্দের প্রয়োজনে কখনও গুরু, কখনও বা লঘুরূপে ব্যবহার করা হইত। তখনকার পদ্যে (সম্ভবতঃ স্বাভাবিক উচ্চারণেও) কোন অক্ষরেরই মাত্রামূল্য নির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু মধুসূদন ও রবীন্দ্র যুগের কবিগণের দৃঢ়-বন্ধ পদ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, কেবল কয়েক শ্রেণীর অক্ষরই কোন কোন সময় দুই মাত্রায় উচ্চারিত হয়। এই সকল দীর্ঘ অক্ষরের তালিকা:

(১) দীর্ঘ মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর— আ-, ঈ-, ঊ-, এ-, এবং ও-কার-যুক্ত অক্ষর।

(২) যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর—ঐ, ঔ, আও, এও, প্রভৃতি যৌগিক ধ্বনি-মূলক অক্ষর।

(৩) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর—(ক) অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত অক্ষর। যেমন, সিং, দুঃ(খ), বাং(লা)।

(খ) যুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অক্ষর—যথা, অঙ্‌(ক), অন্‌(ন), ব্যঞ্‌(জন), পদ্‌(মা), কল্‌(লোল), শক্‌(ত), রোদ্‌(দুর),

কল্(পনা)। অনেক সময় যুগ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনিকে একটি যুক্ত বর্ণের দ্বারা না লিখিয়া পূর্ব ধ্বনিটিকে একটি পৃথক্ স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, অথবা খণ্ডিত ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়। সে গুলিও এই শ্রেণীভুক্ত। যেমন, তুস(মন), কল(কাতা), রথ(তলা), উৎ(পল), ফিট্(কিরি)।

(গ) বাংলা উচ্চারণে শব্দের শেষ ব্যঞ্জনাশ্রিত -অ-কার লুপ্ত হইয়া যে সকল শব্দান্ত নূতন ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর সৃষ্টি করে। যেমন, রাম, বিরাম, কাশীরাম।

দীর্ঘ স্বরান্ত, যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত—এই তিন শ্রেণীর অক্ষরই ছন্দের প্রয়োজনে বাংলা পদ্যে দুই মাত্রার মর্যাদা পায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রেও এই তিন শ্রেণীর অক্ষরই গুরু বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং সংস্কৃত উচ্চারণে যেগুলি দীর্ঘ অক্ষর, বাংলা পদ্যে সেই গুলিই বিকল্পে দীর্ঘ হয়। অতি-নিয়মিত ছন্দ রচনায় রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পদ্য বিশ্লেষণ করিলে বাংলা ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষরের এই মূল তত্ত্বটি পাওয়া যায়।

বাংলা ছন্দে দীর্ঘ অক্ষর—বাংলা উচ্চারণে অধিকাংশ অক্ষর এক-মাত্রিক। কিন্তু পদ্য-ছন্দ আবৃত্তি করিবার সময় ছন্দের প্রয়োজনে কয়েক শ্রেণীর অক্ষর দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। এই সকল দীর্ঘ অক্ষর অস্বাভাবিক শুনায় কি না, তাহা বিবেচ্য।

উপরে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর অক্ষর, অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ, এ, ও—এই কয়টি দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর বাংলা পদ্যে সচরাচর দীর্ঘ রূপে ব্যবহৃত হয় না। কদাচিৎ কোন কোন কবিতায় এইরূপ দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরের 'তৎসম' প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন,

(১) বল ছিন্ন বীণা | বল উচ্চস্বরে,
না না না | অবনী ভিতরে

(২) ভীত বদনা পৃথিবী হেরিছে ঘোর অন্ধকার নিশি

(৩) ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা

(৪) অবনত ভারত চাহে তোমারে

দৃষ্টান্ত গুলিতে দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর নিয়মিত ভাবে দীর্ঘ নহে। সমগ্র কবিতার দুই এক স্থানে মাত্র দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরকে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল অক্ষরে লেখকের আবেগ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অক্ষরগুলির দীর্ঘ উচ্চারণ পাঠকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। বাংলা গানেও দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের "জনগণ-মন-অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা", "দেশ দেশ নন্দিত কবি মন্দ্রিত তব ভেরী", প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গানগুলি এই দিক্ দিয়া সার্থক সৃষ্টি। অনেক কবি হাসির গানে বা কবিতায় দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর দীর্ঘরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত 'কর্ণ বিমর্দন কাহিনী'র উল্লেখ করা যাইতে পারে:

জানো নাকি কদাচন মূঢ়।
কর্ণ বিমর্দন মর্ম কি গূঢ়॥
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য।
যদি না তা আকর্ষণ জন্য॥

বাংলা গানে বা হাস্য-রসাত্মক রচনায় দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরের তৎসম প্রয়োগ চলিতে পারে। কিন্তু আবৃত্তিমূলক গুরু-গম্ভীর রচনায় দীর্ঘ মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করাই বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর গুরু অক্ষরের তৎসম প্রয়োগ বাঙ্গালীর কানে যে এখনও অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই, তাহার

একটি প্রমাণ এই যে, অনেক বাঙালী কবি-প্রধান তাঁহাদের রচনায় এইরূপ প্রয়োগ করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্র কবিতায় সর্বত্র এই নিয়ম বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সাবধানতা সত্ত্বেও অভ্যাস বশে কোন কোন দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর লঘু-মাত্রিক রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু অপর দুই শ্রেণীর অক্ষর, অর্থাৎ যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর, বাংলা পদ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার

—এই পংক্তিতে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরগুলি দীর্ঘ। এই তৎসম উচ্চারণ বাঙালীর নিকট এখন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। এই দুই শ্রেণীর অক্ষরকে নিয়মিত ভাবে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়া রবীন্দ্রনাথ ও অন্য অনেক বাঙালী কবি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

মাত্রা-সম্প্রসারণ ও মাত্রা-সঙ্কোচন—সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ছন্দ-শাস্ত্রে দীর্ঘ অক্ষর বলিতে দুই মাত্রায় উচ্চারিত একটি অক্ষর এবং হ্রস্ব অক্ষর বলিতে এক মাত্রায় উচ্চারিত একটি অক্ষর বুঝায়। যেমন, দীর্ঘ 'ঈ' প্রকৃত পক্ষে 'ইই', কিন্তু উচ্চারণ করা হয় 'ই-', বা 'ইই'। সেইরূপ 'রাম্' বা 'মৌ' দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইলে বলা হয় 'রা-ম্', 'মো-উ', বা রা৺-ম্, মো৺উ। এখানে 'রা'=১ মাত্রা, ফাঁক বা শ্রুতি-স্বর=½ মাত্রা, 'ম্'=½ মাত্রা; 'মো'=১ মাত্রা, ফাঁক=½মাত্রা, 'উ'=½ মাত্রা। কিন্তু ঈ, রাম্, বা মৌ যখন হ্রস্ব উচ্চারণ করা হয়, তখন ঐ ফাঁকটুকু তো থাকেই না, উপরন্তু 'রা' ½ এবং 'মৌ' ½ মাত্রায় উচ্চারণ করা হয়। দীর্ঘ অক্ষর উচ্চারণ করার সময় অক্ষরে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়, উহা আসলে স্বর-সম্প্রসারণ। রসনা নূতন অক্ষর উচ্চারণের প্রয়াস না করিয়া পূর্ব-উচ্চারিত স্বরেরই উচ্চারণ-কাল সম্প্রসারিত করে, এবং প্রায়শঃ বিনা চেষ্টায়

উচ্চারিত একটি স্মৃতি-স্বর বা glide vowel এই স্থানটুকু পূরণ করিয়া দেয়। আবৃত্তির সময় দীর্ঘ মৌলিক স্বরান্ত, যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে সুরের দ্বারা সম্প্রসারিত করিয়া দুই মাত্রায় উচ্চারণ করিলে তাহাকে মাত্রা-সম্প্রসারণ বলে ; এবং সংক্ষেপে এক মাত্রায় উচ্চারণ করিলে তাহাকে মাত্রা-সঙ্কোচন বলে। যেমন,

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে

এখানে মোর্, চিত্, পুণ্ এবং তীর্—এই কয়টি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরই সম্প্রসারিত, অর্থাৎ গুরু। কিন্তু,

চিত্ত যেথা ভয়-শূন্য উচ্চ যেথা শির

এখানে চিত্, শূন্, উচ্, এইগুলি সঙ্কুচিত, অর্থাৎ লঘু। প্রথম পংক্তির 'চিত্ত' ও 'পুণ্য' এবং দ্বিতীয় পংক্তির 'চিত্ত' ও 'শূন্য'—ইহাদের আবৃত্তি-কালীন উচ্চারণ মিলাইয়া দেখিলেই এই তত্ত্বটি বুঝা যাইবে।

মাত্রা-চিহ্ন—দীর্ঘ বা সম্প্রসারিত অক্ষরের উপর একটি সমান্তরাল ক্ষুদ্র রেখা দেওয়া হয় ; যেমন, রাম্ ; সঙ্কুচিত অক্ষরের উপর একটি ক্ষুদ্র অর্ধ-বৃত্ত চিহ্ন দেওয়া হয় ; যেমন, রাম্। অবশিষ্ট অন্যান্য লঘু অক্ষরের উপর একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত চিহ্ন দিতে হয়। যেমন, ক।

মাত্রা-চিহ্নিত কয়েকটি পদ্য-পংক্তি :

(১) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী =২২ মাত্রা

(২) হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য হেথায় দ্রাবিড় চীন =২০ মাত্রা

(৩) দুঃখে সুখে পাপে পুণ্যে পতনে উত্থানে =১৪ মাত্রা

পর্ব

বিরতি—রসনার বিশ্রামকে বিরতি বলে। নদীর একটানা স্রোতে কোন ছন্দ নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ যখন নদী-স্রোতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি

করে, তখনই সেখানে ছন্দের আবির্ভাব হইয়াছে বলা চলে। দ্রুত এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি অক্ষর-গঠিত বাক্য বলিলে বা পদ্য-পংক্তি আবৃত্তি করিলে, তাহা বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই যন্ত্রণাদায়ক হইবে। ঐ সকল বাক্য বা পদ্য-পংক্তি বিরতির দ্বারা তরঙ্গায়িত হইলে তখনই তাহা সুশ্রাব্য হয়। রসনা বা বাগ্‌যন্ত্রকে আমরা সাধারণতঃ তিন স্থানে বিশ্রাম দিয়া থাকি—

(১) সম্প্রসারণ-মূলক বিরতি, (২) অর্থবোধক বিরতি বা 'ছেদ' ও (৩) ছন্দ-বোধক বিরতি বা 'যতি'।

সম্প্রসারণ-মূলক বিরতি - ছন্দে অক্ষরের মাত্রা বা উচ্চারণ কাল অনেক সময় সম্প্রসারিত করা হয়। বিপ্রকর্ষ বা স্বরাগমের দ্বারা যে দীর্ঘীকরণ বা অক্ষরের সংখ্যা-বৃদ্ধি (যেমন, প্রাণ—পরাণ; লালাইত—লালায়িত), সেখানে রসনা বিশ্রাম পায় না। কিন্তু সম্প্রসারণ-মূলক উচ্চারণে রসনা ১/২ মাত্রা বিশ্রাম পায়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মাত্রা-সম্প্রসারণ বাংলা ছন্দে এক প্রকার অনির্বচনীয় তরঙ্গ ভঙ্গ সৃষ্টি করে। প্রকৃত পক্ষে এই তরঙ্গায়ণের মূলে রহিয়াছে বাগ্‌যন্ত্রের ঈষৎ বিশ্রাম। এই ভাবে কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ প্রলম্বিত হওয়ায় পংক্তি-মধ্যে ঐ সকল অক্ষর প্রাধান্য লাভ করে ও অক্ষরগুলি একটু জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়। যেমন,

যদিও স‌ন্ধ্যা | নামিছে ম‌ন্দ | ম‌ন্থরে
ন‌ব সঙ্গীত | গেছে ই‌ঙ্গিতে | থামিয়া

এখানে 'মন্থরে'র মন্ ছাড়া যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী অন্যান্য ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরগুলি, (যথা, সন্, মন্, সঙ্, ইঙ্) পর্বের আরম্ভে না পড়িয়া মাঝে পড়িয়াছে। তথাপি পর্বের আরম্ভে যে আঘাত বা ঝোঁক পড়ে, তাহার প্রতিস্পর্ধী দ্বিতীয় এক একটি ঝোঁক এই অক্ষরগুলিতে

পাওয়া যাইতেছে। এই শ্রেণীর ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর যদি পর্বের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দুইটি ঝোঁক মিলিয়া এক অনির্বচনীয় দোলা সৃষ্টি করে। যেমন,

(১) ছিন্ন শিখের | মুণ্ড লইয়া | বর্শা ফলকে। তুলি

(২) তুরঙ্গ সম | অন্ধ নিয়তি | বন্ধন করি | তায়

(৩) নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন | গন্ধ নিন্দিত | অঙ্গ

ছেদ—অর্থ-বোধক বিরতিকে ছেদ বলা হয়। কমা, সেমিকোলন এবং দাঁড় দ্বারা ইহা বুঝান হইয়া থাকে। অর্থবোধক আবৃত্তি ছাড়া গদ্যের অন্য কোন প্রকার আবৃত্তি হইতে পারে না। সেজন্য গদ্যে শুধু ছেদ বিরতি পাওয়া যায়। ছেদ-বিরতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে গদ্যছন্দের সৃষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট ও শক্তিশালী গদ্য লিখিতে হইলে চিন্তা-ধারাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেদ দ্বারা বিভক্ত করা আবশ্যক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্যেই প্রথম ছেদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সামঞ্জস্য পূর্ণ বাক্যাংশ ব্যবহার করার দিকে মনোযোগ দেখা যায়। 'সীতার বনবাসে'র প্রথম বাক্যটি তাঁহার ছেদ-নিয়মিত গদ্য-রচনার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।—"রাম, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপত্য-নির্বিশেষে, প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।"

যতি—ছন্দ-বোধক বিরতিকে যতি বলে। পদ্যের কোন চরণ আবৃত্তি করিবার সময় আমরা ছন্দের প্রয়োজনে চরণটি এক বা একাধিক ঝোঁকে আবৃত্তি করি। এইরূপ ঝোঁক, তাল, বা আঘাত শেষ হইলে রসনার যে-নিশ্চেষ্টতা দেখা দেয়, তাহাই যতি। পদ্য-পংক্তিতে ছন্দ-তরঙ্গের যে উত্থান-পতন থাকে, যতি তাহারই

নির্দেশক। একটি, দুইটি, বা তিনটি মৃদু ঝোঁকের পর একটি তীব্র ঝোঁক, তারপর পুনরায় ছন্দের প্যাটার্ণ অনুসারে এক বা একাধিক মৃদু ঝোঁকের পর আর একটি তীব্র ঝোঁক, এইভাবে বাংলা ছন্দের প্রবাহ চলিতে থাকে। যতি তিন প্রকার—অন্ত যতি, মধ্য যতি ও অল্প যতি।

অন্তযতি—দীর্ঘতম যতিকে অন্ত যতি বলে। ছন্দের এক প্রকার গতি আছে, তরঙ্গায়িত জল-প্রবাহের সহিত তাহার তুলনা করা চলে। একটির পর আর একটি, এই ভাবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরঙ্গ-ভঙ্গের পর যেখানে সেই ধারাটি শেষ হয়, স্বভাবতঃই রসনা সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় নূতন ধারা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হয়। এইরূপ দীর্ঘ বিরতিকে অন্ত যতি বলে। অন্ত যতি দ্বারা কবিতার চরণ বা পংক্তি নির্ণয় করা হয়। অন্ত যতির পর অর্থের দিক দিয়া আকাঙ্ক্ষা বা অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে; কিন্তু সেখানে ছন্দের গতি সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়। অন্ত যতির চিহ্ন [I]। অন্ত যতির দৃষ্টান্ত:

পঞ্চ নদীর তীরে I
বেণী পাকাইয়া শিরে I
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ I
নির্মম নির্ভীক I

অথবা

শুধু তব অন্তর বেদন
চিরন্তন হ'য়ে থাক, সম্রাটের ছিল সে সাধনা I

মধ্য যতি—পূর্ণ যতি দ্বারা কবিতা কয়েকটি পংক্তিতে বিভক্ত হয়। এই সকল পংক্তির মধ্যেও প্রায়ই এক বা একাধিক প্রবল ঝোঁক পড়িয়া পংক্তিটিকে কয়েকটি প্রধান অংশে বিভক্ত করে। যেমন, উপরে উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তে তৃতীয় পংক্তিটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে আর একটি

প্রবল ঝোঁক পড়িয়া পংক্তিটিকে দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত করিতেছে। যথা, (১) দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে, (২) জাগিয়া উঠেছে শিখ। পংক্তির মধ্যবর্তী এইরূপ প্রবল যতিকে মধ্য যতি বলে। মধ্যে যতি দ্বারা চিহ্নিত চরণাংশকে পর্ব বা পদ বলা হয়। মধ্য যতির চিহ্ন [|]। মধ্য যতির দৃষ্টান্ত :

(১) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে ঋণে ‖

(২) কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ ‖

অল্প যতি—মধ্য যতি দ্বারা বিভক্ত চরণাংশের মধ্যেও ছন্দের স্পন্দন পাওয়া যায়। এবার যতি আরও দুর্বল ও কিছুটা অস্পষ্ট। এই সামান্য বিরতিই অল্প যতি বা লঘু যতি। অল্প যতি দ্বারা বিভক্ত চরণাংশকে পর্বাঙ্গ বলা হয়। ইহার চিহ্ন [:]। দৃষ্টান্ত :

শুধু : বিঘে : দুই | ছিল : মোর : ভুঁই | আর সবি : গেছে : ঋণে ‖

বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি—ভাষা অবিচ্ছেদী হইতে পারে না। ভাষার উদ্দেশ্য যদি অর্থ-দ্যোতন হয়, তবে অর্থ অনুসারে মাঝে মাঝে থামিয়া শব্দগুলি প্রকাশ করিতে হইবে। এই ছেদ-যুক্ত বা অর্থ-বিরতি-যুক্ত ভাষাকে গদ্য বলে। ছেদ-যুক্ত ভাষাকেই যতির দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিলে তাহা হইবে পদ্য। সুতরাং গদ্য ও পদ্যের রূপ-গত ভেদ হইল, গদ্য ছেদ-নির্ভর, কিন্তু পদ্যে ছেদ ও যতি দুইই থাকিবে। মুক্তক ছন্দে কেবল ছন্দ যতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।

বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর সম্পর্ক কি, এবং ইহারা কি ভাবে বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তাহা এবার আলোচনা করিব। যতি ও ছেদের ভিত্তিতে বাংলা ছন্দকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যতি-প্রধান ছন্দ ও ছেদ-প্রধান ছন্দ। যতি-প্রধান ছন্দে যতি-বিরতিই প্রধান, ছেদ গৌণ। এই সকল ক্ষেত্রে ছেদ-বিরতি সাধারণতঃ যতির সমকালীন হয়, অর্থাৎ উভয় বিরতিই প্রায়শঃ

এক সময়ে ও এক সঙ্গে পড়ে। কিন্তু যতি ও ছেদে কালের বা মাত্রার ব্যবধান থাকিলে, সেখানে ছেদকে উপেক্ষা করিয়া যতি অনুসারেই কবিতা আবৃত্তির দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যেমন,

(আর) ভাষাটাও তা | ছাড়া, মোটে | বেঁকে না, রয় | খাড়া I

এখানে দীর্ঘ দাঁড়ি দ্বারা যতি-বিরতি ও কমা দ্বারা ছেদ-বিরতি দেখান হইয়াছে। সমগ্র কবিতার ছন্দ-প্রবাহের সহিত মিল রাখিয়া পড়িতে হইলে পংক্তিটিকে 'ভাষাটাও তা | ছাড়া মোটে | বেঁকে না রয় | খাড়া' —এইভাবে যতি-গুচ্ছে বিভক্ত করিতে হয়। কিন্তু এই পংক্তির ছেদ-বিভাগ হইবে, 'ভাষাটাও তা ছাড়া, মোটে বেঁকে না, রয় খাড়া'। পদ্যটির অন্যান্য পংক্তিতে ছেদ যতির অনুগামী। যেমন,

(দেখ) হ'তে পারতাম, | আমি একটা | মস্ত বড়, | বীর ; I
(কিন্তু) গোলাগুলির, | গোলেই এমন, | মাথা রয় না, | স্থির ; I

অনেক সময় যতি একটি শব্দের মাঝে পড়িয়া শব্দটিকে দুইটি সম বা অসম অংশে বিভক্ত করে। ছেদ ভীষণ ভাবে উপেক্ষিত হইলেও ঐ সকল ক্ষেত্রে শব্দটি খণ্ডিত করিয়া পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন,

(১) ঝম্পি ঘন গর | -জন্তি সন্ততি
(২) মরি মরি অ | -নঙ্গ দেব | -তা

যতি-প্রধান বাংলা ছন্দে ছেদ সাধারণতঃ যতির সহগামী হয়। উপরে যে অসদ্ভাবের কথা বলা হইল, ঐরূপ দৃষ্টান্ত খুব অল্প। বিশেষ করিয়া চরণের শেষে ছেদ ও যতি প্রায়ই অভিন্ন। মধুসূদনের পূর্বে ইহাই ছিল সাধারণ রীতি। তখন এক এক পংক্তিতে এক একটি ভাব সমাপ্ত করা হইত। এবং চরণ শেষে যতি ও ছেদের মিলন-ভূমির পতাকা স্বরূপ সেখানে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া ঐ স্থানটিকে প্রাধান্য দেওয়া হইত।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের দান ছেদ-প্রধান ছন্দ। উনিশ শতকে বাংলাদেশে শুধু যে গদ্য রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা নহে, এই সময় পদ্য ভঙ্গীকেও গদ্য-ধর্মী করার চেষ্টা হয়। এই নূতন আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন মধুসূদন। তিনি অমিত্র ছন্দ নামে যে নূতন পদ্য-ভঙ্গী প্রচলিত করেন, তাহা আসলে ছেদ-প্রধান ছন্দ। এই ছন্দে যতি গৌন। ছেদ অনুযায়ী এই পদ্য আবৃত্তি করিতে হয় বলিয়া যতি-প্রধান ছন্দে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠকের পক্ষে অমিত্র ছন্দ আবৃত্তি করা প্রথম প্রথম কষ্টকর হইয়াছিল। ছেদ-প্রধান ছন্দের দৃষ্টান্ত :

ধন্য ইন্দ্রজিৎ, ধন্য | প্রমীলা সুন্দরী | ,
ভিখারী রাঘব, দূতি, | বিদিত জগতে, |
বনবাসী, ধনহীন, | বিধি-বিড়ম্বনে, |
কি প্রসাদ, সুবদনে, | (সাজে যা তোমারে), |
দিব আজি, সুখে থাক, | আশীর্বাদ করি, |

এখানে 'কমা' দ্বারা ছেদ ও দীর্ঘ দাঁড়ি দ্বারা যতি চিহ্নিত হইল। কমা চিহ্ন অনুসরণ করিয়াই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে হইবে, এবং দাঁড়ি চিহ্নিত যতি উপেক্ষিত হইবে। অর্থাৎ পয়ারের ৮+৬-এর যতি-বিভাগ এই ছন্দে রক্ষিত হইলেও কবিতাটি আবৃত্তি করিবার সময় অর্থ-বিভাগ অনুযায়ী পড়িতে হইবে। মধুসূদনের অমিত্র ছন্দে ছেদ ও যতির মধ্যে মিল নাই। গৈরিশ ছন্দও ছেদ-প্রধান, কিন্তু ঐ ছন্দে যতি সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত।

পর্ব ও পদ—মধ্য যতি দ্বারা নিরূপিত চরণাংশকে পর্ব বলে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত কবিতা সুর করিয়া পড়া হইত বলিয়া সংস্কৃত ছন্দ চরণ-নির্ভর, কিন্তু বাংলা উচ্চারণ শ্বাসাঘাত-মূলক সেজন্য বাংলা ছন্দ পর্ব-নির্ভর। পর্বই বাংলা ছন্দের প্রধান উপাদান।

পর্বের অন্য নাম পদ। প্রাচীনেরা পর্ব অর্থে পদ শব্দ ব্যবহার করিতেন। বাংলা ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দের কথা আমরা জানি। পয়ার ছন্দকেও প্রকৃত পক্ষে তখন দ্বিপদী বলিয়াই গণ্য করা হইত। প্রাচীন বাংলা ছন্দও সুর করিয়া পড়া হইত বলিয়া পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দের এক একটি পদ বেশ দীর্ঘ হইত। আধুনিক শ্বাসাঘাত-মূলক আবৃত্তির প্রয়োজনে ঐ পদগুলিকে দুইটি পর্বে বিভক্ত করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। অবশ্য পয়ারে ৮ মাত্রার পরে ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে ৮ ও ১৬ মাত্রার পরে মধ্য-যতি এখনও স্বাভাবিক। 'পাখী সব করে রব + রাতি পোহাইল'—এই ভাবে পংক্তিটিকে ৮+৬-এর দ্বিপদী ছন্দ রূপে আবৃত্তি করাই উচিত। 'পাখী সব+করে রব' —এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বে বিভক্ত করিলে পয়ার ছন্দের পুরাতন সুর ও সরল গাম্ভীর্যটুকু নষ্ট হইয়া যাইবে। এক এক চরণে ৪+৪+৪+২ অথবা ৪+৪+৬—এইরূপ পর্ব সমাবেশ করিয়াও কবিতা রচিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে পয়ার ছন্দ বলা হইবে কিনা বিবেচ্য। পয়ার ছন্দ দ্বিপদী অর্থাৎ দ্বিপর্বিক। পয়ার-জাতীয় ছন্দে দীর্ঘ পর্বের কথা পরে আলোচিত হইবে।

সমপর্বিক ও অসমপর্বিক ছন্দ—সম-মাত্রিক পর্বের দ্বারা গঠিত ছন্দকে সমপর্বিক ছন্দ বলে। একটি পদ্যের সমস্ত পর্বেই সমান সংখ্যক মাত্রা থাকিবে, এমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। পংক্তির শেষ পর্বটি বাংলায় প্রায়ই অসমান হয়। শুধু শেষ পর্বটি অসম হইলে তাহাকে সমছন্দই বলা হইবে। পংক্তির অন্য স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন মাপের পর্ব ব্যবহার করিয়া বাংলায় পদ্য রচিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসমপর্বিক ছন্দ আবার অসমছন্দ ও বিষমছন্দ ভেদে দ্বিবিধ। অসম ছন্দ শুধু অসম-পর্বিক; কিন্তু বিষম ছন্দ অসম-পর্বিক ও অসম-পংক্তিক।

অসমছন্দের দৃষ্টান্ত :

(১) গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুবা |
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি = ৭ + ৫ + ৯ (অথবা ৭ + ৫ + ৭ + ২)

(২) নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে | এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা |
বিশ্রাম বিহীন = ৮ + ১০ + ৭

(৩) কখনো চড়ে গিরি, | ধীরি ধীরি ; | কখনও সবে
নদীর ধারে ধারে | পদচারে | নবোৎসবে। = ৭ + ৪ + ৫

বিষমছন্দের দৃষ্টান্ত :

গৈরিশ ছন্দ—আরে দুঃশাসন, | আরে দুর্যোধন, = ৬ + ৬
আরে নরাধম সুত-সুত, = ১০
বিরাট শ্যালক, = ৬
ভীমসেনে, | কুক্ষণে করিলি আর, = ৪ + ৮

মুক্তক ছন্দ—হে সম্রাট, | তাই তব শঙ্কিত হৃদয় = ৪ + ১০
চেয়েছিল করিবারে | সময়ের হৃদয় হরণ | = ৮ + ১০

অপূর্ণ ও অতি-পূর্ণ-পর্ব—সমপর্বিক ছন্দের শেষ পর্বটি অপেক্ষাকৃত ছোট বা বড় হইতে পারে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ ছোট পর্বকে অপূর্ণ পর্ব ও বড় পর্বকে অতি-পূর্ণ পর্ব বলে।

অপূর্ণ পর্ব—

(১) কেতকী কেশরে | কেশপাশ করো | সুরভি = ৬ + ৬ + ৩
ক্ষীণ কটিতটে | গাঁথি লয়ে পরো | করবী = ৬ + ৬ + ৩

(২) সাতকোটি সন্তানেরে | হে মুগ্ধ জননী = ৮ + ৬
রেখেছ বাঙালী করি | মানুষ করোনি = ৮ + ৬

অতি-পূর্ণ পর্ব—

(১) আজি হেরিতেছি আমি | হে হিমাদ্রী গম্ভীর নির্জনে = ৮ + ১
(২) কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ = ৬ + ৬ + ৮
(৩) অনাথ পিশুদ | কহিলা অম্বুদ নিনাদে = ৬ + ৯

পর্বে মাত্রা-দৈর্ঘ্য—বাংলা পদ্য সাহিত্যের এক একটি পর্বে সাধারণতঃ চার হইতে দশ মাত্রা পর্যন্ত পাওয়া যায় :

চার মাত্রার পর্ব—

(১) ঝিনেদার | জমিদার | কালাচাঁদ | রায়রা = ৪ + ৪ + ৪ + ৩

(২) পাহাড়ের | বুক চিরে | এস প্রেম | -দাত্রী

পাঁচ মাত্রার পর্ব—

(১) পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | ক'রেছ একি | সন্ন্যাসী = ৫ + ৫ + ৫ + ৪

(২) গোপন রাতে | অচল গড়ে | নফর যারে | এনেছে ধরে = ৫ + ৫ + ৫ + ৫

(৩) তুঙ্গ মণি | -মন্দিরে | ঘন বিজুরি | সঞ্চরে ঐ

ছয় মাত্রার পর্ব—

(১) প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি = ৬ + ৬

(২) হাজার হাজার | বছর কেটেছে | কেহ ত বহেনি | কথা = ৬ + ৬ + ৬ + ২

সাত মাত্রার পর্ব—

(১) হৃদয় আজি মোর | কেমনে গেল খুলি = ৭ + ৭

(২) ললাটে জয়-টীকা | প্রসূন হার গলে | চলে রে বীর চলে = ৭ + ৭ + ৭

আট মাত্রার পর্ব—

(১) তোরি হাতে বাঁধা খাতা | তারি শ'খানেক পাতা |
ফেলিয়াছি অক্ষরেতে ঢেকে = ৮ + ৮ + ১০

(২) কে তুমি পড়িছ বসি | আমার কবিতাখানি |
কৌতূহল ভরে = ৮ + ৮ + ৬

দশ মাত্রার পর্ব—

(১) আনন্দময়ীর আগমনে | আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে = ১০ + ১০

চরণ বা পংক্তি

অন্ত-যতির পর ছন্দ-প্রবাহ দীর্ঘ বিশ্রাম লাভ করে। এই অন্ত-যতি দ্বারা বিভক্ত অংশকে চরণ বা পংক্তি বলে। অন্ত-যতি ও অন্ত-মিলের সাহায্যে চরণ নির্ণয় করিতে হয়।

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে
জাগোরে ধীরে,

—এই ভাবে দুই ছত্রে লিখিত হইলেও, ইহা একটিই চরণ। বাংলা পদ্যে সাধারণতঃ পঞ্চ-পর্বিক চরণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে এক-পর্বিক ও পঞ্চ-পর্বিক চরণ বাংলায় অল্প ব্যবহৃত হয়। দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী চরণই বাংলা সাহিত্যে অধিক প্রচলিত। পূর্বেও বাংলা ছন্দ দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী—এই তিন শ্রেণীতে প্রধানতঃ বিভক্ত হইত।

এক-পর্বিক বা এক-পদী চরণ—

একপদী কবিতা বাংলায় অল্প পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলা কাব্যের দশাক্ষরা বৃত্তিতে এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনেক কবিতায় একপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি একপদী কবিতা লিখিয়াছেন। বিষমছন্দেও এক-পদী চরণ পাওয়া যায়। যেমন,

(১) কি ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে | মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে I
নিঃশব্দ প্রখর I
ছায়ামূর্তি তব অনুচর। I

(২) তাপসী অপর্ণা, I
ঝর্ণা। I

দ্বি-পর্বিক বা দ্বিপদী চরণ—

(১) কাননে কুসুম কলি | সকলি ফুটিল
(২) পাল্কী চলে | পাল্কী চলে
(৩) মাতৃহারা মা যদি না পায় | তবে মিছে মঙ্গল কলস
(৪) তুই শুধু ছিন্ন-বাধা | পলাতক বালকের মত

ত্রি-পর্বিক বা ত্রিপদী চরণ—

(১) কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ —লঘু ত্রিপদী
(২) ব'লো না কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে |
এ জীবন নিশার স্বপন —দীর্ঘ ত্রিপদী

(৩) তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি

(৪) মিথ্যে তুমি | গাঁথলে মালা | নবীন ফুলে

চতুষ্পর্বিক বা চৌপদী চরণ—

(১) ভাগুমালী | লাউ ডাঁটাতে | ভরেছে তার | ঝাঁকাটা

(২) ধন্য তোমারে | হে রাজমন্ত্রী | চরণ-পদ্মে | নমস্কার

(৩) স্বজন প্রতিবাসী | এত যে মেশামেশি |
ও কেন কোণে বসে | নয়ন বোজে

(৪) বনের মর্মর মাঝে | বিজন বাঁশরী বাজে |
তারি সুরে মাঝে মাঝে | ঘুঘু দুটি গান গায়

পঞ্চ-পর্বিকবা পঞ্চপদী চরণ—

(১) যারা আমার | সাঁঝ সকালের | গানের দীপে | জ্বালিয়ে দিয়ে | আলো
আপন হিয়ার | পরশ দিয়ে | এই জীবনের | সকল সাদা | কালো

(২) ওরে সবুজ | ওরে অবুঝ | আধ মরাদের | ঘা মেরে তুই | বাঁচা

(৩) দেয়ালগুলো | অবুঝ পারা | তাকিয়ে থাকে | ফ্যাকাশে দৃষ্ | -টিতে

সম-চরণ ও মিশ্র-চরণ ছন্দ—একটি পদ্যের সমস্ত চরণ নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্বের দ্বারা রচিত হইলে তাহাকে সম-চরণ ছন্দ বলে। যেমন, পয়ার ছন্দের সমস্ত পংক্তি দ্বিপদী। এইরূপ ছন্দকে সম-চরণ অথবা নিয়মিত-চরণ ছন্দ বলা হয়। কবিতার চরণ গুলিতে পর্ব-সংখ্যা সমান না হইলে তাহাকে মিশ্র-চরণ ছন্দ বলে। তুলনীয় বিষমছন্দ :

তবে আমি | যাইগো তবে | যাই —ত্রি-পর্ব
ভোরের বেলা | শূন্য কোলে —দ্বি-পর্ব
ডাকবি যখন | খোকা বলে —দ্বি-পর্ব
বলব আমি | নাই সে খোকা | নাই —ত্রি-পর্ব
মাগো যাই —এক-পর্ব

অতিমাত্রিক চরণ—চরণের শেষে অপূর্ণ অথবা অতিপূর্ণ পর্ব থাকিলে, তাহা একটি পর্ব বলিয়াই গণ্য হইবে, এবং মাত্রা-গণনার সময় ঐ পর্বের হিসাব লইতে হইবে। কিন্তু অনেক সময় একটি চরণে কতকগুলি অতিরিক্ত মাত্রা থাকে, পর্ব-গণনা বা মাত্রা-গণনার সময়, ঐ সকল অতিরিক্ত মাত্রা উপেক্ষা করা হয়। এই অতিরিক্ত মাত্রার ব্যবহার (বিশেষ করিয়া পংক্তির আরম্ভে) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায়। আধুনিক সাহিত্যেও ইহা অপ্রচলিত নহে। দৃষ্টান্ত :

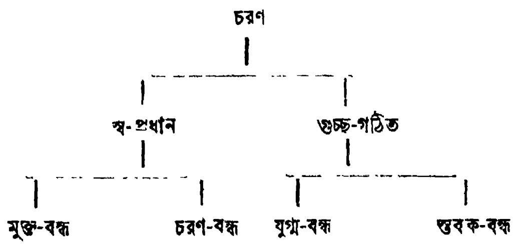
আমি) ঢালিব করুণা ধারা,
আমি) ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,

এইরূপ অতিরিক্ত মাত্রা পংক্তির মাঝখানেও পাওয়া যায়। যেমন,

আমার পরীক্ষার | নীচে আছেন | (জানি না) মরেন কিম্বা | বাঁচেন, I
এঁর ভারি | শক্ত ব্যারাম। (ইনি) হাই তোলেন আর | হাঁচেন। I (দ্বিজেন্দ্রলাল)

স্তবক

কবিতার চরণ স্ব-প্রধান অথবা গুচ্ছ-গঠিত হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর কবিতা দ্বিবিধ, মুক্ত-বন্ধ ও চরণ-বন্ধ। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাও দুই প্রকার, যুগ্ম-বন্ধ ও স্তবক-বন্ধ :



মুক্ত-বন্ধ—যে কবিতায় মিল নাই, ও প্রবহমাণতা আছে, তাহাকে মুক্ত-বন্ধ পদ্য বলে। যেমন, মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ।

চরণ-বন্ধ—অনেক আধুনিক কবি মিল ব্যবহার না করিয়া কবিতা লিখিতেছেন। ঐ সকল অমিল পদ্যে যদি প্রবহমাণতা না থাকে, অর্থাৎ এক এক পংক্তিতে যদি এক একটি ভাব শেষ হয়, তাহা হইলে তাহাকে চরণ-বন্ধ বলা হইবে। গৈরিশ ছন্দ এইরূপ চরণ-বন্ধের দৃষ্টান্ত। আধুনিক কবিগণও অনেকেই চরণ-বন্ধ কবিতা রচনা করিয়া পরম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যেমন,

মনটারে সাদা পরদা বানায়ে স্মৃতির আলোকে দেখি,
কত ছায়া ছবি ভেসে ওঠে পরদায়—
মনের কবরে একটি একটি চলিয়াছে শবাধার,
জীবনে তাহারা থাকে নাই বেশী দিন।
স্মৃতির এ শোভাযাত্রায় তারা বিলম্ব নাহি করে।

(সজনীকান্ত দাস)

যুগ্ম-বন্ধ—দুই চরণের এক একটি গুচ্ছকে যুগ্মক (couplet) বলে। কয়েকটি যুগ্মক পর পর ব্যবহার করিলে কবিতায় একটি ধারা-বাহিকতা উৎপন্ন হয়। সেজন্য যুগ্মককে স্তবক বলা চলে না। দীর্ঘ আখ্যান-মূলক বা দীর্ঘ বর্ণনা মূলক কাব্য সাধারণতঃ যুগ্মক-বন্ধে রচিত হয়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ যুগ্মকের প্রধান দৃষ্টান্ত। সমিল প্রবহমাণ পয়ারকেও (রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস") যুগ্মক-বন্ধই বলিতে হইবে।

অবশ্য একটি মাত্র যুগ্মকের দ্বারা একটি কবিতা রচিত হইলে, তাহাকে স্তবক বলা চলে। যেমন,

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে।
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

স্তবক-বন্ধ—তিন অথবা তদূর্ধ্ব চরণের গুচ্ছকে স্তবক বলে। কেবল কবিতার মুদ্রিত রূপ দেখিয়া স্তবক নির্ণয় করিলে অনেক সময়

ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, ত্রিপদী পংক্তি দীর্ঘ বলিয়া দুই সারিতে লিখিত বা মুদ্রিত হয়। তাই বলিয়া ত্রিপদী যুগ্মককে চার চরণের স্তবক বলা চলে না। সাধারণতঃ মিত্রাক্ষর-বিন্যাস পরীক্ষা করিলেই স্তবকের গঠন বুঝিতে পারা যায়।

এক এক শ্রেণীর মিল বুঝাইবার জন্য ক, খ, গ, প্রভৃতি প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এক একটি স্তবকে এক বা একাধিক শ্রেণীর মিল পাওয়া যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে পৃথক্ পৃথক্ এক এক প্রস্থ মিল ব্যবহার করা হয়।

সাধারণতঃ কবিতার স্তবকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু সম্পৃক্ত স্তবকও (interlocked stanza) পদ্য সাহিত্যে পাওয়া যায়। যেমন, শেলীর 'ওড টু দি ওয়েষ্ট উইণ্ড'। আবার দুইটি পৃথক্ স্তবক এক সঙ্গে যুক্ত করিয়া যুগ্ম-স্তবক রচনার রীতিও বাংলায় প্রচলিত। বিহারীলালের রচনায় সম্পৃক্ত ও যুগ্ম-স্তবকের দৃষ্টান্ত সুলভ।

তিন চরণের স্তবককে ত্রিপংক্তি বন্ধ, চার চরণের স্তবককে শ্লোক-বন্ধ, পাঁচ চরণের স্তবককে পঞ্চক-বন্ধ, এইভাবে ষড়ক, সপ্তক অষ্টক প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সনেটকে চতুর্দশ চরণের স্তবক বলা চলে না। সনেট ৭টি যুগ্মক অথবা ২টি সপ্তক দ্বারা, ৩টি শ্লোক ও একটি যুগ্মক দ্বারা, ১টি অষ্টক ও ১টি ষড়ক দ্বারা—এইরূপ নানা প্রকার চরণ-সমবায় দ্বারা গঠিত হইতে পারে।

মিত্রাক্ষর বিন্যাসে নূতনত্ব দেখাইয়া অথবা ভিন্ন ভিন্ন মাপের কিম্বা বিভিন্ন সংখ্যার চরণ গ্রথিত করিয়া স্তবকে নানা প্রকার বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যায়। ইংরেজ কবিগণ এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান। বাঙালী কবি স্তবক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদাসীন। মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে কদাচিৎ স্তবক-বৈচিত্র্য দেখা যায়। উনিশ

শতকেই বাঙালী কবিগণ স্তবক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন হন। কিন্তু স্তবক-বৈচিত্র্যে বাংলা পদ্য এখনও খুব বেশী সমৃদ্ধ নহে।

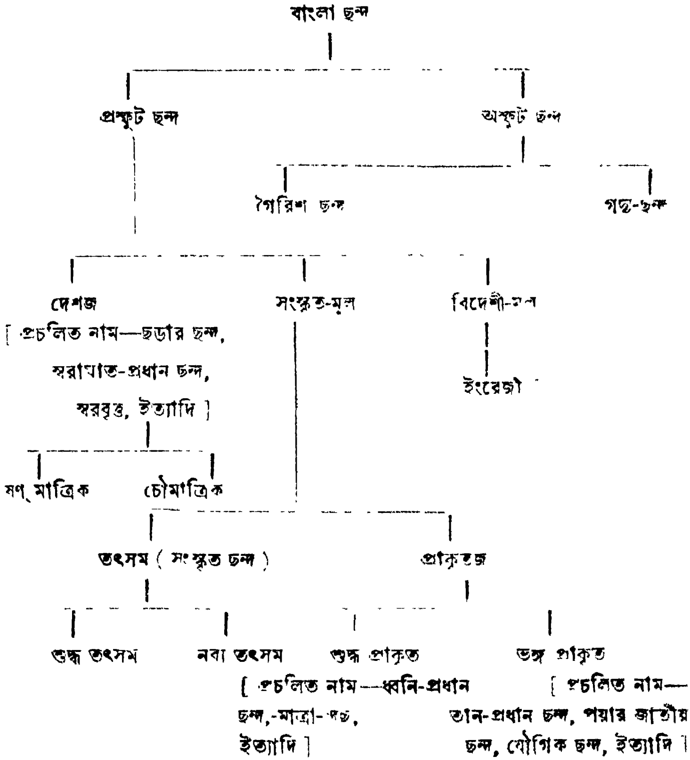
তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী-বিভাগ

পুরাতন ও নূতন প্রণালী—সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া বলা হয়, বাংলা ছন্দ দুই প্রকার—অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দ। মধ্য যুগ হইতেই এই শ্রেণী-বিভাগ চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও বিভিন্ন ছন্দাদর্শের সুন্দর সুন্দর কবিত্ব-ব্যঞ্জক নাম রাখা হইত। কয়েকটি বাংলা ছন্দের নাম হইল, মালতী, কুসুম-মালিকা, চম্পক, ললিত। পয়ার, ত্রিপদীও এইরূপ দুইটি ছন্দোবন্ধের নাম। বর্তমানে কবিগণ এত অধিক সংখ্যায় নূতন নূতন ছন্দের প্যাটার্ণ উদ্ভাবন করিতেছেন যে প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ এখন এক প্রকার অসম্ভব। তাই ইংরেজী পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এখন ছন্দের গঠন-সূচক নাম রাখা হয়। যেমন, পঞ্চমাত্রিক চতুষ্পর্ব বলিলে ছন্দের গঠনটি বুঝা গেল। এই ছন্দকে অপূর্ণ বা অতিপূর্ণ করিয়া এবং চরণে পর্বের সংখ্যা বাড়াইয়া বা কমাইয়া আরও অনেক ছন্দোবন্ধ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। তাহাদের জন্য এখন পৃথক্ পৃথক্ নাম রাখা হয় না। এই নূতন পদ্ধতির যুগোপযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীন কাল হইতে বাংলা ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই পুরাতন শ্রেণী-বিভাগ গ্রহণ-যোগ্য কিনা, তাহা এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বিশ্বের সমস্ত প্রস্ফুট ছন্দই অক্ষর অথবা মাত্রার মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায়' এই দুই শ্রেণীর বাহিরে কোন পদ্য ছন্দ নাই। সে দিক দিয়া আমাদের দেশের সনাতন শ্রেণী-বিভাগটি সুন্দর। কিন্তু বাংলায় অক্ষরছন্দ যদি একেবারেই না থাকে, সমস্ত বাংলা ছন্দই যদি মাত্রাছন্দ হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণী-বিভাগ প্রয়োগ করার প্রশ্নই উঠে না। বাংলা ছন্দে অক্ষরবৃত্ত আছে কি না তাহা আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করা হইবে। খাঁটি বাংলা ছন্দে অক্ষর-গোণা ছন্দ পাওয়া না গেলেও বাংলার তৎসম ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। সুতরাং বাংলা ছন্দকে অক্ষর ও মাত্রা-ছন্দে বিভক্ত করিলে ভুল হইবে না।

তাহা সত্ত্বেও আমরা নূতন ভাবে বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ করিবার পক্ষপাতী। নানা ছন্দ-গোষ্ঠী হইতে বিভিন্ন ছন্দাদর্শ ও ছন্দ-রীতি বাংলায় গৃহীত হইয়াছে। এই সকল ছন্দের গঠন মাত্রা-নির্ভর হইতে পারে। কিন্তু শুধু 'মাত্রাছন্দ' বলিলে ইহাদের সমস্ত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাদের গঠনের কথা বলিলেও পরিচয়ের অনেকখানি বাকী থাকে। মানুষের বেলায় দেখা যায়, বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা কুল-পরিচয়ই তাহার অভ্রান্ত পরিচয়। সেইরূপ, বাংলা কাব্যে যে কয়টি ছন্দ-ধারা পাওয়া যায়, তাহাদেরও উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী নাম স্থির করিলে বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা এখানে সেই চেষ্টাই করিব। মূল অনুযায়ী বাংলা ছন্দের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ প্রদর্শিত হইল :



দেশজ ছন্দ

দেশজ ছন্দের উৎপত্তি—যে সকল প্রাকৃত শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ তাহাদের নাম দেন দেশজ বা দেশী শব্দ। তাঁহারা এই জাতীয় শব্দ অজ্ঞাতমূল স্থানীয় শব্দ বলিয়া মনে করিতেন। আধুনিক গবেষণায় জানা গিয়াছে, এই সকল শব্দ অজ্ঞাত-মূল নহে, ইহারা প্রকৃত পক্ষে অনার্য-মূল। আমরা যে ছন্দ-রীতিকে দেশজ বলিতেছি, তাহাও অনার্য-মূল লোক-ছন্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়।

ইহাকে কি স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ বলা চলে?—দেশজ ছন্দ বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে 'স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ' নামটিই সর্বাধিক প্রচলিত। এই নামে আমাদের আপত্তি আছে। স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত (stressed accent) ভাষা-তত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। শব্দটি অন্য বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহার করিলে, ইহার পারিভাষিকতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু বাংলা ছন্দের আলোচনায় শব্দটি তাহার পারিভাষিক অর্থ লঙ্ঘন করিয়াছে। এই শ্রেণীর ছন্দে পর্বের প্রথমে যে ঝোঁক পড়ে ছন্দের প্রয়োজনেই তাহার উৎপত্তি। বাংলার উচ্চারণ-গত শ্বাসাঘাতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমরা ইহাকে ছন্দাঘাত বা পর্বাঘাত বলিতে চাহি। এই পর্বাঘাত ও শ্বাসাঘাত এক নহে। কারণ বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত অপেক্ষা এই পর্বাঘাত অনেক বেশী প্রবল। দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় সাধারণতঃ শ্বাসাঘাত পড়ে 'শব্দের' প্রথম অক্ষরে, কিন্তু পর্বাঘাত পড়ে 'পর্বের' প্রথম অক্ষরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্বের প্রথম অক্ষর ও শব্দের প্রথম অক্ষর এক হয় বলিয়া এই দুই প্রকার 'আঘাত'ও এক সঙ্গে পড়িয়া থাকে, এবং সেই জন্যই ইহাদের অভিন্ন বলিয়া ভ্রম করা হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, পর্বাঘাত ও স্বরাঘাত অনেক ক্ষেত্রে একই অক্ষরের উপর পড়ে না। যেমন,

| / |
ঝরছে রে মৌ | -চাকের মধু।

| |
গন্ধ পাওয়া | যায় হাওয়ায় (সত্যেন্দ্র নাথ)

(খাড়ারেখা = পর্বাঘাত ; বাঁকা রেখা = স্বরাঘাত)

এখানে 'ঝরছে রে'—এই অংশের প্রথমে পর্বাঘাত ও শ্বাসাঘাত দুই-ই পড়িতেছে। কিন্তু 'মৌচাক'-এর বেলায় তাহা হইতেছে না।

বাংলা উচ্চারণে প্রথম অক্ষর মৌ'-য়ের উপর শ্বাসাঘাত পড়িবে। কিন্তু এখানে ছন্দের প্রয়োজনে পর্বাঘাত পড়িতেছে 'চা'য়ের উপর। পঙ্‌ক্তিটির স্বরাঘাত-প্রধান আবৃত্তি এইরূপ শুনাইবে ঃ

/ঝরছেরে | /মৌচাকের | /মধু
/গন্ধ পাওয়া যায় | /হাওয়ায়

ইহাতে গদ্য-ছন্দের বা ইংরেজী ট্রোকী-ড্যাক্‌টিলের গতির আমেজ আসে, কিন্তু ছড়ার ছন্দের সুর-বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। ছড়ার ছন্দের ঢং বজায় রাখিতে হইলে এই ছন্দকে কয়েকটি প্রবল পর্বাঘাতের সাহায্যে পড়িতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রধান হওয়া তো দূরের কথা, এই ছন্দে স্বরাঘাতকে অজ্ঞাতবাস করিতে হয়।

পর্বাঘাত ও তাল—দেশজ ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে স্বরাঘাত অপ্রধান, পর্বাঘাতই সেখানে প্রধান। এই পর্বাঘাত বাংলা উচ্চারণ-গত শ্বাসাঘাত অপেক্ষা অনেক অধিক বল-সম্পন্ন। ঢোল, মাদল প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রে তাল বা তালি বলিতে যে প্রবল আঘাত বুঝায়, এই পর্বাঘাতের সহিত তাহার মিল আছে। দুইটিই সমান প্রবল এবং দুইটিই পর্বের প্রথমে পড়িয়া ছন্দকে তরঙ্গায়িত করে। ইহাদের শক্তি ও কার্য একই প্রকার। ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব।

দেশজ ছন্দ ও লোক-সঙ্গীত—দেশজ ছন্দ লোক-সঙ্গীত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাদ্য-ছন্দের 'সম' ও তালের ঝোঁক এবং এই ছন্দের পর্বাঘাত যে অনেকটা এক, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাদ্য-ছন্দের অনুকরণ করিয়াই এই কাব্য-ছন্দের উদ্ভব হইয়াছিল। পর্বাঘাত ও তালের সাদৃশ্য ছাড়া আরও একটি কারণে এই অনুমান সার্থক বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে 'খেমটা' নামে একটি তাল আছে।

ঢোল বা মাদলে এই তাল বেশী বোজান হয়। এই বাদ্য-ছন্দের সহিত এক শ্রেণীর ছড়ার ছন্দ হুবহু মিলিয়া যায়। নীচে খেমটা তালের কয়েকটি বোল ও কয়েক পংক্তি ছড়ার ছন্দ মিশাইয়া উদ্ধৃত করা হইল ঃ

+ | + |
ধাক্ ধিনা ধিন্ | নাক্ ধিনা ধিন্ | ধাক্ ধিনা ধিন্ | নাগ্ ধিনা ধিন্

| | | |
(১) আয় আয় সই | জল আনিগে | জল আনিগে | চল

(২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান
ধগে দেন্ কেন্ | নগে দেন্ কেন্ | ধগে দেন্ কেন্ | নগে দেন্ কেন্

(৩) তাক্ ধিনা ধিন্ । নাক্ ধিনা ধিন্ । ফড়িং বাবুর | বিয়ে
টিকটিকিতে | বাজনা বাজায় | খেংরা কাঠি । দিয়ে

(৪) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে
দৈবে হোতেম | দশম রত্ন | নবরত্নের মালে
ধাধিনা নাতিনা | ধাধিনা নাতিনা | ধাধিনা নাতিনা

(৫) আকাশ জুড়ে | চল নেমেছে | সূর্যি ডুবে | গেছে
গিজতা গিজোড় | গিজোড় গিজোড় | গিজতা গিজোড় | গাং

খেমটা ছন্দ ও উদ্ধৃত ছড়ার ছন্দ যে কার্যতঃ এক, তাহা উপরের দৃষ্টান্তগুলি পরীক্ষা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। খেমটা তাল অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ ধ্রুপদ-খেয়ালের আসরে তাহার স্থান নাই। দেশী সঙ্গীত বা লোক-সঙ্গীতেই তাহার প্রচলন বেশী। লোক-সঙ্গীত হইতেই নিম্ন শ্রেণীর মার্গ-সঙ্গীতে এই তালটি গৃহীত হইয়াছে। বাংলা কাব্যও এই ছন্দটির জন্য লোক-সঙ্গীতের নিকট ঋণী।

বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাঁওতাল, মুণ্ডারি প্রভৃতি কোল-ভাষী আদিবাসীদের বাস। ইহাদের মধ্যে 'খেমটা' নামে এক প্রকার গান খুব বেশী প্রচলিত। 'মুণ্ডা-দুরঙ' নামে কোল গানের সঙ্কলনে 'খেমটা' শ্রেণীর অনেকগুলি গীত সংগৃহীত দেখা যায়।

এই সকল আদিবাসীদের গানে দুইটি তাল প্রধান, খেমটা ও কাহারবা। সাঁওতালী গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহাদের গান সুর-প্রধান, কথা বেশী নাই। মাদলে যে ছন্দ বাজে, তাহা অনুকরণ করাই যেন ইহাদের গানের উদ্দেশ্য। এইরূপ বাদ্য-ছন্দে বাংলা শব্দ ভরিয়া দিয়াই দেশজ ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আট, নয় শত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে কোল-ভাষী আদিবাসিগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করিত। তাহাদের গান হইতেই এই তাল-ধর্মী ছন্দটি বাংলায় গৃহীত হইয়াছিল। ইহা শিষ্ট সাহিত্যে প্রচলন করার কৃতিত্ব কাহার প্রাপ্য, তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। বিজয় গুপ্তের নামে প্রচলিত 'মনসামঙ্গলে' দেশজ ছন্দে রচিত অনেকগুলি কবিতা পাওয়া যায়। লোচন দাসও (১৬শ শতক) এই ছন্দে কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। সেই পয়ার-ত্রিপদীর যুগে লোচনের নূতন ধরণের রচনাকে 'ধামালি' বলা হইত। এই নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে ছন্দটি অকুলীন। লোচনের ধামালির নমুনা :

মধুপুরে | রূপ নগরে | রসের নদী | বয়,
কূল বহিয়া | ঢেউ আসিয়া | লাগিল গোরা | গায়

বর্ণমাত্রিক দেশজ ছন্দ—অধিকাংশ ছন্দোবিৎ বলেন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-জাতীয় ছড়ার ছন্দ চার মাত্রার পর্বে গঠিত। এই মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না। খেমটা ছন্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। খেমটা ছয় মাত্রার তাল। এই শ্রেণীর দেশজ ছন্দও যে ছয় মাত্রার পর্বে গঠিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সঙ্গীতের পরিভাষা অনুসারে ইহা 'দুনী' চালের ছন্দ। অর্থাৎ সঙ্গীতের স্বাভাবিক লয়ে যাহা এক মাত্রা, এই পদ্য-ছন্দে তাহা দুই মাত্রার সমান। বাদ্য-ছন্দে 'ধাগ্ ধিনা ধিন্' তিন মাত্রা,

কিন্তু এই পদ্য-ছন্দে 'আয় আয় সই'-পর্বটি হইবে ছয় মাত্রা। আবৃত্তি করিবার সময় ঐ পর্বের যৌগিক অক্ষর তিনটি উচ্চারণ করিতে সমান সময় লাগিতেছে। সুতরাং কোন হিসাবেই ইহাকে চার মাত্রার পর্ব বলা চলে না।

ইহা যে সংস্কৃত গোষ্ঠীর বহির্ভূত ছন্দ, তাহা এই ছন্দের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতে ধরা পড়ে। সংস্কৃত-মূল সমস্ত ছন্দেই ধ্বনির তৎসম উচ্চারণ-রীতি কিছু পরিমাণে পালিত হয়। কিন্তু এই ছন্দ সেদিক দিয়া সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ। অক্ষরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে যে-সকল বিধি সংস্কৃত, অপভ্রংশ বা বাংলা ছন্দে প্রচলিত, তাহার সবগুলিই এই ছন্দে লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। ইহাতে সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন দ্বারা যে ভাবেই হউক, পর্বের নির্দিষ্ট মাত্রা-সংখ্যা পূরণ করিতে হয়। মাত্রা-সম্প্রসারণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। লঘু-স্বরান্ত অক্ষরকেও প্রয়োজন হইলে সুরের সাহায্যে সম্প্রসারিত করিয়া দীর্ঘ বা সময় বিশেষে প্লুত করিতেও বাধা নাই। নীচের দৃষ্টান্ত গুলিতে হাইফেন-চিহ্ন দ্বারা মাত্রা সম্প্রসারণ দেখান হইল :

(১) মন তুমি কৃষি | কাজ জান না·
এমন) মানব জমীন | রইলো পতিত |
আবাদ করলে | ফলতো সোনা- (রামপ্রসাদ)

(২) মা- কেঁদে কয় | ম-ঞ্জু-লী মোর | ঐতো কচি- | মেয়ে-
ওরি স-ঙ্গে- | বিয়ে- দেবে- | বয়-সে ওর | চেয়ে-
পাঁচ গুণো সে- | বড়ো- (রবীন্দ্রনাথ)

(৩) কুকুর গুলো- | শুঁকছে ধুলো- |
ধুকছে কেহ- | ক্লান্ত দেহ- (সত্যেন্দ্রনাথ)

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে যৌগিক অক্ষর সব স্থানেই সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ছয় মাত্রা পূরণের জন্য মৌলিক স্বরধ্বনিও

সম্প্রসারিত করিতে হয়। নীচে শুধু মৌলিক অক্ষরের সম্প্রসারণ ও যৌগিক অক্ষরের সঙ্কোচন দেখান হইল :

(১) আমি- সতী- | লীলা-বতী-

সাত ভায়ের বোন | ভাগ্যবতী

(২) তাহা- হলে- | সেই বাণিজ্যের | করব মহা- | -জনী

(৩) কোন্ দেশের গৌ | -রবের কথায় | বেড়ে- ওঠে- |

মোদের বুক

'সাত ভায়ের বোন', 'সেই বাণিজ্যের', 'কোন দেশের গৌ'—এই তিনটি পর্বে মাত্রা-সঙ্কোচন পাওয়া যাইতেছে।

চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ—এ পর্যন্ত ছান্দসিকগণ ছড়ার ছন্দের একটি শ্রেণীর কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশজ ছন্দ দুই প্রকার—খেমটা ঢঙের ষণ্মাত্রিক ছন্দ ও কাহারবা ঢঙের চার মাত্রার ছন্দ। ষণ্মাত্রিক ছন্দের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন আমরা কাহারবা ঢঙের দেশজ ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। খেমটার ন্যায় কাহারবা তালও লোক-সঙ্গীত হইতে গৃহীত। কাহারবা ছন্দ অনুসরণ করিয়াই যে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশজ ছন্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দুই ছন্দ মিলাইয়া পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। কাহারবা বোল ও এই ছন্দ :

\+ |
ধাগ্ নাক্ নাগ্ ধিন্ | তাগ্ নাক্ নাগ্ ধিন্

(১) আগাডুম | বাগাডুম | ঘোড়াডুম | সা-জে-

(২) কুড়্বা- | কুড়্বা- | কুড়্বা- | লি-ক্ষে-

(৩) ইকড়ি- | মিকড়ি- | চা-অম্ | চিকড়ি-

(৪) মারবো- | চা-বুক | চড়বো- | ঘো-ড়া-

চার মাত্রার পরে একটি প্রবল পর্বাঘাতের সাহায্যে এই ছন্দ সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত। সমস্ত ছড়ার ছন্দই যে এক নহে, ইহাদের গঠনে যে পার্থক্য আছে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব :

থই আর | দই খাও | বই রাখ | তুলে
কই মাছ | ভাজা খেতে | শৈল গেছে ভুলে

এখানে 'থই' = ২ মাত্রা, 'আর' = ২ মাত্রা। এই ভাবে প্রতি পব শেষ পর্বটি (অপূর্ণ) চার মাত্রার করিয়া পড়িলে, ইহাকে চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ বলিতে হইবে। কিন্তু প্রচলিত ছড়ার ছন্দের সুরে পড়িতে হইলে ইহার এক একটি পর্ব কি পরিমাণ সুর-সম্প্রসারণ দ্বারা ৬ মাত্রা দীর্ঘ করিতে হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তখন পড়িতে হইবে :

থই- আ-র | দই- খাও- | বই- রাখো- | তুলে-
কই- মা-ছ | ভাজা- খেতে- ¦ শইলো গেছে- | ভুলে-

সুতরাং 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' জাতীয় ছড়ার ছন্দ যে ষণ্মাত্রিক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বাংলা কাব্যে দেশজ ছন্দ—দুই শ্রেণীর দেশজ ছন্দের সহিত দুইটি তালের সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কথা বলা হইল। লোচন দাস এই দুই ছন্দের মধ্যে ষণ্মাত্রিক ছন্দ-ভঙ্গীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার ধামালি ছন্দে ইহাকেই শিষ্ট রূপ দান করেন। এই শ্রেণীর দেশজ ছন্দ পরে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রসার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা, পলাতকা, বলাকা, প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থের অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা এই ছন্দে রচিত। এখন আর ইহাকে 'ছড়ার ছন্দ' বলা যায় না। কারণ গ্রাম্য রচনায় বা ছেলে-ভুলানো বা ছেলে-খেলার ছড়ায় ইহা এখন আর সীমাবদ্ধ নাই। সংস্কৃত-মূল ছন্দ বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন। সূক্ষ্ম, কোমল ও গভীর ভাব প্রকাশ করিতে

হইলে বাঙালী কবি সংস্কৃত-মূল ছন্দই অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ সার্থক রচনার দ্বারা এই গ্রাম্য ছন্দের শক্তি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে এই ছন্দ অনেকখানি মার্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনের সহজ সরল অনুভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'শেষ খেয়া'র গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পর্যন্ত নানা স্তরের চিন্তা-ধারা তিনি এই ছন্দের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ বাংলা সাহিত্যে এতটা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। প্রধানতঃ ছড়া জাতীয় কবিতাতেই এই ছন্দ এখনও সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য আধুনিক কবিদের রচনায় চার মাত্রার এক প্রকার ছন্দ পাওয়া যায়। ইহাকে চার মাত্রার শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ (= ধ্বনি-প্রধান ছন্দ, মাত্রা ছন্দ) বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই ছন্দের উপর চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের প্রভাব পড়িয়াছে। এই সকল আধুনিক ছন্দ যদি প্রবল পর্বাঘাত সহযোগে চার মাত্রার পর্বে কাটিয়া কাটিয়া পড়া যায়, তাহা হইলে চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের সহিত ইহার কোন পার্থক্য থাকে না। যেমন,

(১) ঝর্না- | ঝর্না- | সুন্দরী | ঝর্না- |
(২) বাসাখানি | গায়ে লাগা | আর্মানী | গির্জার
(৩) ছিপখানি | তিন দাঁড় | তিন জন | মাল্লা
চৌপর | দিন ভোর | দ্যায় দূর | পাল্লা
(৪) লঙ্ঘি এ | সিন্ধুরে | প্রলয়ের | নৃত্যে
ওগো কার | তরী ধায় | নির্ভীক | চিত্তে
(৫) আগাডুম | বাগাডুম | ঘোড়াডুম | সা-জে-

আমরা এখন বিভিন্ন কবির রচনা হইতে দেশজ ছন্দের নমুনা উদ্ধৃত করিব। সামান্য একটি গ্রাম্য-ছন্দ কি ভাবে আধুনিক যুগে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, দৃষ্টান্তগুলি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। বুঝা যাইবে, এই ছন্দ-পদ্ধতিকে এখন আর উপেক্ষা করা যায় না। ইহা রূপ-বৈচিত্র্যে এবং বিচিত্র ভাব প্রকাশের বাহক রূপে যে-কোন অভিজাত ছন্দ-পদ্ধতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ঃ

(১) নিতাই গুণ- | মণি- মো-র | নিতাই গুণ- | মণি
আনিয়া- প্রে- | মে-র বন্যা | ভাসাইলে অ- | -বনী
প্রেমের বন্যা | লইয়া নিতাই | আইলা গৌড় | দেশে

(লোচন দাস)

(২) তারে- দেখি- | মনে- সুখী- | এলায় মাথার | কেশ।
রসিক নাগর | রসের সাগর | ব্রাহ্মণে-র | বেশ।
গলে- পাটা- | ভালে- ফোঁটা- | কোশা- কুশী- | করে।
ছোট- কাছা- | মোটা- বোঁচা | কটি- আঁটি- | পরে॥

(শেখর)

(৩) আমায় দেও মা | তবিল দারী-- ।
আমি) নিমক হারাম | নই শঙ্করী ॥
পদ) রত্ন ভাণ্ডার | সবাই লুটে- |
ইহা- আমি- | সইতে নারি-
ভাঁড়ার জিম্মা | যার কাছে মা- |
সে যে- ভোলা- | ত্রিপু-রারি- ॥

(রামপ্রসাদ)

(৪) কোন হাটে তুই | বিকো-তে চাস্ |

ওরে- আমার | গান

কোন্‌খানে তোর | স্থান ?

(রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা)

(৫) আমি- এলেম | ভাঙ্‌ল তোমার | ঘুম

শূন্যে শূন্যে | ফু্‌টল আলোর | আনন্দ কু- | -সুম

আমায় তুমি- | ফুলে- ফুলে-

ফুটিয়ে তুলে-

দুলিয়ে নিলে- | নানা- রূপের | দোলে।

আমায় তুমি-| তারায় তারায় | ছড়িয়ে দিয়ে- | কুড়িয়ে নিলে- | কোলে

আমায় তুমি -| মরণ মাঝে-| লুকিয়ে ফেলে

ফিরে- ফিরে- | নূতন করে- | পেলে।

(রবীন্দ্রনাথ, বলাকা)

(৬) শরৎ কালের | পূর্ণ শশী- | বড়ই মধুর | বটে,

তারায় যখন | ঘিরে থাকে- | নীল আকাশের | পটে ;

দেখতে মধুর | শৈবালেতে- | ঘেরা- শত- | দলে

একটি যখন | ফুটে থাকে | সুনীল স্বচ্ছ | জলে ;

নাইক কিন্তু | বিশ্বে কিছু- | এমন মনো- | লোভা

শ্যামল বনের- | মাঝে যেমন | আমার বাছার | শোভা।

(দ্বিজেন্দ্রলাল, ঘুমন্ত শিশু)

(৭) হল্লা ক'রে- | ছুটীর পরে- | ওই যে যারা- | যাচ্ছে পথে—

হালকা হাসি- | হাসছে কেবল | ভাসছে যেন- | আলগা স্রোতে,

কেউবা শিষ্ট | কেউবা চপল | কেউবা উগ্র | কেউবা মিঠে | ;

ওই আমাদের | ছেলে-রা সব | ভাবনা যা- সে | ওদের পিঠে।

(সত্যেন্দ্রনাথ, ছেলের দল)

(৮) সব চেয়ে যে- | ছোট্ট পীঁড়ি- | খানি
 সেইখানি আর | কেউ রাখে না- | পেতে
ছোট্ট থালায় | হয় নাক ভাত | বাড়া
 জল ভরে না- | ছোট্ট গেলা-সেতে।
বাড়ীর মধ্যে | সব চেয়ে যে- | ছোট
 খাবার বেলায় | কেউ ডাকে না- | তাকে।
সব চেয়ে যে- | শেষে- এসে- | ছিল
 তারি- খাওয়া | ঘুচে-ছে সব | আগে।
 (সত্যেন্দ্রনাথ, ছিন্ন মুকুল)

(৯) বাঁড়ুজ্যেদের | বাড়ীর পাশে- | বোসেদের ওই | আটচালা-য়
পাঠিয়ে দিলে- | বাবা- আমায | মেরে- ধোরে- | পাঠশালা-য়।
হাতে- খড়ি- | নয় সে আমার, | পোড়লো হাতে- | দড়ি- গো- !
সকাল বিকেল | ঘানি- টানা- | দিয়ে- ঘরের | কড়ি- গো-
 (কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, নামকাটা সেপাই)

(১০) আসছে এবার | অনা-গত- | প্রলয় নেশার | নৃত্য পাগল
সিন্ধু পারের | সিংহ দ্বারে- | ধমক হেনে- | ভাঙল আগল !
 মৃত্যু গহন | অন্ধ কূপে-
 মহা- কালের | চণ্ড রূপে-
 ধূম্র ধূপে-
বজ্র শিখার | মশাল জ্বেলে- | আসছে ভয়ঙ্ | -কর
 ওরে ঐ) হাসছে ভয়ঙ্ | -কর !
 তোরা সব) জয়ধ্বনি- | কর !
 (নজরুল ইসলাম, প্রলয়োল্লাস)

(১১) পাটের ক্ষেতের | ভিতর দিয়ে- | ঘাটের ডিঙ্গা- | বাই
তবু- আমার | হাটের সাথে- | কোন- বাঁধন | নাই
 (যতীন্দ্রমোহন বাগচী, খেয়াডিঙি)

(১২) মাঝি) ভিড়া-য়োনা- | চলুক তরী- | নদীর মাঝে |
তরী) এ- ঘাটেতে- | বাঁধবো নাকো- | আজকে সাঁঝে, |

(কুমুদরঞ্জন মল্লিক, স্মৃতির বাণী)

(১৩) এবার তবে- | ঝড়
এবার তবে- | বিদ্যুতে-র | তীক্ষ্নখে
পাষাণ কালো- | আকাশ যা-ক | ছিঁড়ে
এবার তবে- | দীপ্ত দারুণ | তরুণ চোখে-
আশার নীলম | -শাল।

(বুদ্ধদেব বসু, পূর্বরাগ)

বাংলার বাহিরে দেশের ছন্দ—এই দুই শ্রেণীর ছন্দের প্রচলন শুধু বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষ করিয়া ওড়িয়া সাহিত্যে এই শ্রেণীর ছন্দের কথা পরে আলোচিত হইবে। কোল গোষ্ঠীর লোক-সাহিত্যেও এই দুইটি ছন্দ-শৈলীর প্রচলন দেখা যায়। 'মুণ্ডা দুরঙ' নামে গীত-সংগ্রহ হইতে একটি চৌমাত্রিক দেশী ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি:

হতুবন | বোলোগম | দিশুমন | বো-লে-
হতু হতু | গো-ম | অয়র বে | ড়া-ইঙ।
হতুবন | বোলোগম | দিশুমন | বো-লে
দিশুম দি | -শুম গোম | মুতুঃ বে | ড়া-ইঙ।

(গীত সং—৫৪৪)

পশ্চিমে হোলী উৎসবের কিছুকাল পূর্ব হইতেই বালক ও যুবকেরা বহ্ন্যুৎসবের জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনে। সেই

সময় তাহারা সুর করিয়া একটি ছাড়া আবৃত্তি করে। ঐ ছড়াটিও দেশজ চৌমাত্রিক ছন্দ। যথা—

হোলকী- | মাইয়া- | দে-ব | -কী-

লড়কন্ | জী-য়ে- | লা-খব- | -রিষ

ইত্যাদি

দেশজ ছন্দের বৈশিষ্ট্য—দেশজ ছন্দের যে-সকল বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে এখানে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল :

(১) বাদ্য যন্ত্রের তাল অনুসরণ করিয়া দেশজ ছন্দের উদ্ভব। সেজন্য ইহার প্রতি পর্বে প্রথমে একটি তালি বা পর্বাঘাত থাকে। এই পর্বাঘাত ও শ্বাসাঘাত পৃথক্ বস্তু। ইহারা কখনও একই অক্ষরে পড়ে, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ অক্ষরের উপর পড়িয়া থাকে। এই ছন্দে পর্বাঘাতই প্রধান। কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় স্বরাঘাত উপেক্ষিত হয়।

(২) দেশজ ছন্দ দুই প্রকার—ষণ্‌মাত্রিক ও চৌমাত্রিক। ছয় মাত্রা চালের দেশজ ছন্দই বংলা কাব্যে অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। ভারতে ও ভারতের বাহিরে অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর লোক-সাহিত্যে দেশজ ছন্দের প্রচলন আছে।

(৩) অক্ষরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে যে সকল বিধি সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দে প্রচলিত তাহার সবগুলিই এই ছন্দে লঙ্ঘিত হয়। অক্ষরের সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ দ্বারা পর্বের মাত্রা-সংখ্যা পূরণ করা হইয়া থাকে। মাত্রা-সম্প্রসারণই অধিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে লঘু-স্বরান্ত অক্ষরকেও সুরের সাহায্যে সম্প্রসারিত করিয়া দীর্ঘ বা প্লুত করা হয়।

(৪) এই ছন্দ লোক-সঙ্গীত হইতে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল।

সংস্কৃত-মূল ছন্দ

শ্রেণী-বিভাগ—সংস্কৃত গোষ্ঠীর ছন্দ (অর্থাৎ, বৈদিক, বৃত্ত, জাতি ও অপভ্রংশ ছন্দ) হইতে গৃহীত বা উৎপন্ন বাংলা ছন্দকে সংস্কৃত-মূল ছন্দ বলিব। অধিকাংশ বাংলা ছন্দই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা দুই প্রকার—তৎসম ও প্রাকৃতজ। বাংলায় বৈদিক ও বৃত্তছন্দের রূপ হুবহু অনুকরণ করিলে তাহা হইবে তৎসম ছন্দ। প্রাকৃত ছন্দ অর্থাৎ মাত্রা-ছন্দ, বিশেষ করিয়া অপভ্রংশ যুগের মাত্রাছন্দ অনুসরণ করিয়া যে সকল ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের নাম প্রাকৃতজ ছন্দ। আর এক প্রকার সংস্কৃত-মূল ছন্দ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায়। প্রাকৃত ছন্দের গঠন এবং বৃত্তছন্দের আক্ষরিকতা মিশাইয়া এই ছন্দ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। পরে এই ছন্দ বাংলায় খুব বেশী প্রসার লাভ করে। এই মিশ্র ছন্দটিই বাংলার নিজস্ব ছন্দ। মাগধী অপভ্রংশ অঞ্চলে এই ছন্দ-পদ্ধতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা ইহার নাম দিয়াছি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ।

তৎসম ছন্দ

তৎসম ছন্দ—তৎসম শব্দের ন্যায় তৎসম ছন্দও বাংলা-সাহিত্যে সংস্কৃত হইতে সোজাসুজি গৃহীত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের পথে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগ অতিক্রম করিয়া ইহা বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বাঙালী কবি বৃত্ত-ছন্দের অনুকরণে এই সকল ছন্দ রচনা করিয়া আমাদের ছন্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তবে এই সকল ছন্দ বাংলা ছন্দ। ইহাদের সংস্কৃত ছন্দ বলা যায় না, কারণ সংস্কৃত ছন্দ বা বৃত্তছন্দের সহিত এই ছন্দের পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, বৃত্তছন্দ পংক্তি-নির্ভর, কিন্তু বাংলায় তৎসম ছন্দ অন্যান্য বাংলা ছন্দের ন্যায় পর্ব-নির্ভর। এইখানেই বৃত্তছন্দের সহিত তৎসম ছন্দের প্রধান পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ,

বৃত্তছন্দে মিল ব্যবহার হয় না, কিন্তু তৎসম ছন্দ সমিল হইতে পারে। বৃত্তছন্দের সহিত ইহার সাদৃশ্যও আছে। এই ছন্দে বৃত্তছন্দের প্যাটার্ণ হুবহু অনুকরণ করা হয়। সেজন্য বৃত্তছন্দের ন্যায় তৎসম ছন্দও অক্ষর-ছন্দ। এই ছন্দে অক্ষর-সংখ্যায় মিল থাকে। বৃত্তছন্দের যে যে স্থানে যতি পড়িবার কথা ইহাতেও সেই সকল স্থানেই যতি পড়িয়া পংক্তিটিকে পর্ব-বিভক্ত করিবে। অন্য কোন ভাবে যতি স্থাপন করিতে গেলে বৃত্তছন্দের গতি ও গঠন নষ্ট হইয়া যাইবে।

বাংলায় তৎসম ছন্দ দুই প্রকার ঃ শুদ্ধ তৎসম ও নব্য তৎসম।

শুদ্ধ-তৎসম ছন্দ—সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতি অনুসারে লঘু-গুরু অক্ষর প্রয়োগ করিয়া বাংলা তৎসম ছন্দ রচনা করিলে তাহা হইবে শুদ্ধ-তৎসম ছন্দ। বৃত্ত ছন্দের গঠন ও স্বরধ্বনির তৎসম উচ্চারণ এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য। যেমন ভারতচন্দ্রের

> লটা পট্ জটাজ্ | ট সংঘট্ট গ ঙ্গা।
> ছলচ্ছল্ টলট্ট্ | কলকল্ তরঙ্গা॥
> ফণাফণ ফণাফণ | ফণিফন্ন গাজে।
> দিনেশ প্রতাপে | নিশানাথ সাজে॥

ইহা একটি ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দের দৃষ্টান্ত। একটি লঘু অক্ষরের পর দুইটি গুরু অক্ষর,—এই ক্রম অনুসারে বারো অক্ষর ব্যবহার করিয়া এবং ৬ অক্ষরের পরে যতি স্থাপন করিয়া এই তৎসম ছন্দটি রচিত হইয়াছে। এই ছন্দে আ, ঈ, ঊ, এ, ও, দীর্ঘ। ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরও সম্প্রসারিত। বৃত্তছন্দের কোন নিয়মই এখানে লঙ্ঘিত হয় নাই। সুতরাং ইহা শুদ্ধ-তৎসম ছন্দ।

নব্য তৎসম ছন্দ—বাংলা উচ্চারণ-রীতি অনুসারে লঘু-গুরু অক্ষর প্রয়োগ করিয়া বাংলা ভাষায় বৃত্ত ছন্দ রচিত হইলে তাহা হইবে নব্য তৎসম ছন্দ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত

অক্ষরের তৎসম প্রয়োগ বাংলায় স্বাভাবিক, কিন্তু আ, ঈ, ঊ, এ, ও— এই কয়টি দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর বাংলায় স্বভাবতঃই হ্রস্ব। ইহাদের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ বাংলা ছন্দে স্বাভাবিক শুনায় না। সেজন্য বাংলা ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে বৃত্তছন্দ অনুকরণ করিবার সময় গুরু অক্ষরের স্থলে শুধু ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরই ব্যবহার করিয়া পরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহারা আ, ঈ প্রভৃতি দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর হ্রস্ব রূপে ব্যবহার করায় তাঁহাদের তৎসম ছন্দ কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক হয় নাই ; যেমন,

বৃত্তছন্দে মন্দাক্রান্তা—

— — — — • • • • • • —
শা পে না স্তং, গমিত মহিমা,
— • — — • — —
বর্ষ-ভোগ্যেন ভর্তুঃ।

সত্যেন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তা—

· · — — — • • • • • —
পিঙ্গল্ বিহ্বল্! ব্যথিত নভতল্!
— • — — • — —
কই গো কই মেঘ্ উদয় হও।

—১৭ অক্ষর

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃতে পঞ্চচামর ছন্দ ১৬ অক্ষরে গঠিত। ইহার ১, ৩, প্রভৃতি বিযোড় অক্ষর লঘু ও ২, ৪, প্রভৃতি যোড় অক্ষর গুরু, এবং ৪, ৮ ও ১২ অক্ষরের পরে বিরতি। যেমন,

•—•— •— •— •—• — • —•—
প্রমাণিকা, প দ দ্বয়ং, বদন্তি পং, চ চামরং।

সত্যেন্দ্রনাথের পঞ্চচামর ছন্দ—

•— •— •— •— •— •—
মহৎ ভয়ের | মুরৎ সাগর | বরুণ তোমার
•— •—
তমঃ শ্যামল ; —১৬ অক্ষর

বাংলা সাহিত্যে তৎসম ছন্দের ভবিষ্যৎ—তৎসম ছন্দ বাংলায় উপেক্ষিত। এই ছন্দের বিরাট সম্ভাবনার প্রতি বাঙালী কবি মনোযোগী হইবেন, ইহাই আমাদের কামনা। বৃত্তছন্দ বিশ্বসাহিত্যে তুলনাহীন। ইহার ঝঙ্কার, শ্রুতি-মাধুর্য, ও গতি-বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃত্তছন্দের এই সকল গুণ, অন্ততঃ ইহার অনেকখানি যে বাংলা ছন্দে সঞ্চারিত করা সম্ভব, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। দুঃখের বিষয়, বাঙালীর কবি-প্রতিভা এতদিনেও এই শক্তিশালী ছন্দ-ধারা আপন করিয়া লইতে পারিল না। এই ছন্দ এখনও বাংলায় হাস্য-রসাত্মক কবিতায় অথবা পরীক্ষা-মূলক সতর্ক রচনায় সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে প্রাকৃত ছন্দ চূড়ান্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। জয়দেবের ছন্দ ও ব্রজবুলি ছন্দ যে বাংলায় এভাবে আত্মসাৎ করিয়া লওয়া যায়, একথা গত শতকে কেহ কল্পনাই করিতে পারিতেন না। প্রতিভাশালী কবির আবাল্য সাধনাই ইহা সম্ভব করিয়াছে। এখন আর এক জন প্রতিভাশালী কবি বৃত্তছন্দের শক্তি ও সামর্থ্য বাংলা ছন্দের ধমনীতে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিলে বাংলা সাহিত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইবে।

সংস্কৃত ছন্দ কি ভাবে বাংলায় স্বাভাবিক করিয়া তোলা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় যে-সকল অপভ্রংশ ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে পদাবলী-কাবগণ তাহা ব্রজবুলি ভাষায় অনুকরণ করিয়া সার্থক সৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়দেব কর্তৃক অনুসৃত সংস্কৃত স্বর-ধ্বনির উচ্চারণ যে প্রাদেশিক, এমন কি ব্রজবুলির মত কৃত্রিম ভাষাতেও চলিতে পারে না, তাহা সে যুগের কবিগণও কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কানেও এই সত্য

ধরা পড়িয়াছিল। এবং তিনিই প্রাকৃতজ ছন্দে স্বরধ্বনির মাত্রা-মূল্য কি হইবে, সে সম্বন্ধে একটি বাংলা পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেখানেও দেখি আ, ঈ, ঊ, এ, ও—এই কয়টি দীর্ঘ মৌলিক স্বর-ধ্বনি সাধারণতঃ হ্রস্ববৎ ব্যবহার করাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৎসম ছন্দ রচনার সময় একথা ভুলিলে চলিবে না।

লালমোহন বিদ্যানিধি 'সংস্কৃতানুসারে নূতন ছন্দঃ' আখ্যা দিয়া এক শ্রেণীর তৎসম ছন্দের কথা বলিয়াছেন। তিনি 'রাবণবধ' কাব্য হইতে এই শ্রেণীর ছন্দের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তগুলি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণীর ছন্দে যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিই কেবল দীর্ঘ। ইহাতে দীর্ঘ মৌলিক স্বর বর্জন অথবা এক মাত্রায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেমন, চন্দ্রবর্ত্ম ছন্দের নমুনা ঃ

পূর্ব পুণ্য মম উৎকট ভুবনে।
প্রাপ্ত ভৃত্য তব দুর্লভ চরণে॥

সত্যেন্দ্রনাথও এই ছন্দ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নব্য তৎসম ভঙ্গীর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই সাফল্যে আশা হইতেছে, শুদ্ধ প্রাকৃত ছন্দের ন্যায় এই শ্রেণীর তৎসম ছন্দও এক সময় বাংলায় স্বাভাবিক ছন্দ-রীতিতে পরিণত হইবে।

শুদ্ধ তৎসম ছন্দের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় অনেক কবি এই ছন্দে হাস্য-রসাত্মক কবিতা বা গান রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। সেকালের অনেক উদ্ভট কবিতায় হাস্য-রস সৃষ্টির জন্য বৃত্তছন্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন,

শো-নেন ন্যায়রত্ন দা-দা-, আমি বড় ঠেকেছি
আপনি হন গ্রাম্য ক র্তা ·
দশ টা-কা- কর্জ করবো, কত করে দেব সুদ,
কন দেখি স ত্য বা র্তা।

অপর এক ব্রাহ্মণের খেদোক্তি : এটিও স্রগ্ধরা বৃত্ত :

শ্রুত্বা-গ্রামা ন্তরে-হং, ভাল বটে শিরিণী,
সত্যনারা-য়ণস্য ;
গত্বা-তত্রা-তিহর্ষা- দাটখানি বাতাসা-
পাইলা-মা-বশে-ষে।
রাত্রৌ-তী-ব্রান্ধকা-রে-, চোখে কিছু দেখি না,
যা-গুত্তা-খাই কপা-লে-,
হভুক্ত্বা-খেদাম্বিতো-হহং ফিরে আসি বাড়ীতে,
বৌ-বলে-রে- কিলা-রে।

এই জাতীয় উদ্ভট ছন্দের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। শুদ্ধ-ভঙ্গীর তৎসম ছন্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত করিবার জন্য দীর্ঘ কাল ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হইয়াছে। এই ছন্দ-রীতি বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত কোন বিশিষ্ট রস-ধারা প্রবর্তন করিতে পারে নাই। ইহার পরিবর্তে নব্য পদ্ধতিতে তৎসম ছন্দ রচনা করিলে সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রাকৃতজ ছন্দ

প্রাকৃত ও অপভ্রংশের নিকট বাংলার ঋণ—বাংলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। অপভ্রংশের স্তন্য-ধারা পান করিয়াই তাহার শৈশব অতিবাহিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবার যোগ্যতা তখনও তাহার হয় নাই। সেজন্য অপভ্রংশই ছিল তাহার প্রথম আদর্শ। অপভ্রংশের অঙ্গনেই তাহার তখনকার কার্য-কলাপ সীমাবদ্ধ থাকিত।

এই শৈশব যুগে অপভ্রংশ হইতেই রাধার পরিকল্পনা বাংলায় গৃহীত হয়। এই সময় বাঙালী অপভ্রংশ হইতেই সহজ-সাধনা অর্থাৎ দেহের মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান-সাধনা শিক্ষা করে। সংস্কৃতে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য আছে, কিন্তু 'লিরিক' ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্ম-ভাবময় কবিতার কথা নাই। অপভ্রংশে এই শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়। এই অপভ্রংশ ধারাই চর্যাগীত ও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এক বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে। লহনা, খুল্লনা, ফুল্লরাকে সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যাইবে না। এগুলি অপভ্রংশ শব্দ। খুব সম্ভব মনসাও তাই। পালি ও অর্ধ-মাগধীতে 'মনঃ' হইতে উৎপন্ন 'মনস' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। বুন্দেলখণ্ড ও রাজস্থানে এখনও মনস্কামনা-সিদ্ধয়িত্রী দেবী রূপে মনসার পূজা প্রচলিত আছে। এই সকল অপভ্রংশ-নামা চরিত্রের সহিত সম্পৃক্ত কাহিনীগুলি অপভ্রংশ সাহিত্য হইতেই বাংলায় গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের উল্লেখ নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে মঙ্গল-গীতের কথা পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই অনালঙ্কারিক ও অপৌরাণিক কাহিনী-বর্ণন প্রণালীও অপভ্রংশ সংস্কৃতি হইতেই জয়দেব চয়ন করিয়া লইয়াছিলেন, এবং এই লৌকিক ধারাই বাংলার মঙ্গল গানে পুষ্টি লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যের উপর অপভ্রংশের প্রভাবের কথা সংক্ষেপে বলা হইল। বাংলা ভাষা ও ছন্দের উপর প্রাকৃত-অপভ্রংশের প্রভাব আরও বেশী। প্রাকৃত যুগে ভারতীয় আর্য-ভাষা (তাহার ধ্বনি, অভিধান এবং ব্যাকরণ) এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। আর্য-ভাষার

এই নবরূপ প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত ভাষার শেষ স্তরকে অপভ্রংশ বলা হয়। মাগধী অঞ্চলের অপভ্রংশ ভাষাই বাংলার জননী। সেজন্য সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার সহিত বাংলা ভাষার সাদৃশ্য বেশী। বাংলা ভাষার উপর প্রাকৃত-অপভ্রংশের প্রভাবের কথা আমরা এখানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব না। আমরা শুধু স্বরধ্বনির উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

সংস্কৃতে 'এ' এবং 'ও' দীর্ঘ স্বর। কিন্তু দ্রাবিড় ও কোল ভাষায়, এবং কোন কোন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় 'এ' এবং 'ও'র হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় উচ্চারণই পাওয়া যায়। পতঞ্জলির 'এ' এবং 'ও' হ্রস্ব উচ্চারণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন মৈথিল ভাষাতেও আ, এ, এবং ও র হ্রস্ব উচ্চারণ পাওয়া যায়। অপভ্রংশ কবিতায় শুধু আ, এ, ও, নহে, সমস্ত দীর্ঘ ধ্বনিরই হ্রস্ব এবং দীর্ঘ প্রয়োগ সুলভ। অপভ্রংশ ছন্দ-শাস্ত্রেও সংস্কৃত দীর্ঘ ধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অপভ্রংশ যুগের কথ্য উচ্চারণেই দীর্ঘ ধ্বনির তৎসম উচ্চারণের প্রতিদ্বন্দ্বী হ্রস্ব উচ্চারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অপভ্রংশ ছন্দ এই ধ্বনি-পরিবর্তনেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। চলিত বাংলাতেও আ, ঈ, ঊ, এ, ও, ঐ, ঔ—এই কয়টি দীর্ঘ ধ্বনির হ্রস্ব এবং দীর্ঘ উভয় উচ্চারণই পাওয়া যায়। যেমন, রামা, রাম; বেশী, বেশ; দোলা দোল; তৈলা, তৈল্; গৌরা, গৌর—এই কয়টি শব্দ-যুগলের প্রথমটিতে আদি স্বরধ্বনি হ্রস্ব, এবং দ্বিতীয়টিতে ঐ একই ধ্বনি দীর্ঘ। চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলেও অনেক সময় বাংলা স্বরধ্বনির মাত্রা সম্প্রসারণ করা হয়। যেমন চাঁপা, চাঁ-পা।

দীর্ঘ ধ্বনির হ্রস্ব রূপ ব্যতীত অপভ্রংশ যুগে আরও অনেক নূতন নূতন স্বরধ্বনির উদ্ভব হইয়াছিল। এগুলিও বাংলায় এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। নূতন নূতন ধ্বনি প্রচলিত

হইলেও ইহাদের জন্য নূতন লিপি-চিহ্ন প্রবর্তিত হয় নাই। তাই অ, আ, এ, ও, প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারাই ইহাদের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় উচ্চারণই এবং অন্যান্য নূতন ধ্বনিও লিপিবদ্ধ করা হয়।

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার উপর অপভ্রংশ প্রভাবের কথা বলা হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বাংলা ছন্দের উপর অপভ্রংশ ছন্দের প্রভাব মোটেই অস্বাভাবিক ও আকস্মিক নহে। বাংলা ভাষা তখনও একটি অপুষ্ট উপভাষা মাত্র ছিল। একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষার শক্তি-সামর্থ্য তাহাতে তখনও সঞ্চারিত হয় নাই। সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইবার যোগ্যতা তখনও অর্জন করিতে না পারায় অপভ্রংশের অনুকরণ করিয়াই বাংলা ভাষা সে সময় সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল। সেজন্য এই সময় অপভ্রংশ ছন্দকেই বাঙালী তাহার কাব্য-সাধনার প্রথম বাহন রূপে গ্রহণ করিয়া চর্যাপদ রচনা করে।

প্রাকৃতজ ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ—প্রাকৃত যুগেই মাত্রাছন্দের প্রচলন হয়, সেজন্য মাত্রাছন্দকে প্রাকৃত-ছন্দও বলা যাইতে পারে। অপভ্রংশ যুগে এই ছন্দের নূতন নূতন প্যাটার্ণ উদ্ভাবিত হয়। এই যুগেই মাত্রাছন্দ বিশেষ জন-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। চর্যার কবিগণ বাংলা কবিতা রচনায় এই ছন্দ-রীতি গ্রহণ করিয়া বাংলা কাব্য-ছন্দের প্রথম স্তর-সম্পাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, অপভ্রংশের আদর্শে রচিত হইলেও চর্যার ছন্দ বাংলা মাত্রা-ছন্দ, কারণ চর্যার ছন্দ অপভ্রংশ ছন্দের ন্যায় পংক্তি-নির্ভর নহে, ইহাতে পর্ব-বিভাগ বেশ স্পষ্ট। মাত্রাছন্দ প্রাকৃত যুগে উৎপন্ন হইয়া বাংলার নূতন রূপ ও গতি-বেগ লাভ করিল। সেজন্য আমরা এই ছন্দের নাম দিয়াছি প্রাকৃতজ ছন্দ। এই ছন্দ দুই প্রকার—শুদ্ধ-প্রাকৃত ও ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ।

অপভ্রংশ ছন্দের আদর্শ অনুসারে রচিত বাংলা ছন্দের নাম শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ। এই ছন্দ পর্ব-গঠিত এবং ইহাতে ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত

অক্ষর দ্বিমাত্রিক। বাংলা তৎসম ছন্দেও তাই। কিন্তু তৎসম ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে প্রধান পার্থক্য হইল, তৎসম ছন্দে বৃত্তছন্দের প্যাটার্ণ অনুকৃত হয়, কিন্তু শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের গঠন বৃত্তছন্দ-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, তৎসম ছন্দ অক্ষর-গোণা ছন্দ। মাত্রা-সংখ্যায় সামঞ্জস্য থাকিলেও অক্ষরের সংখ্যা-গত মিলই সেখানে বড় কথা। অপর পক্ষে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে অক্ষর-গত সামঞ্জস্য নাই, শুধু মাত্রা-সমতাই ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা খাঁটি মাত্রাছন্দ। মাত্রাছন্দ বা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ নামেও ইহা পরিচিত।

শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের স্তর-ভেদ—এই ছন্দে দুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরের ছন্দ অপভ্রংশের প্যাটার্ণ অনুকরণ করিয়া রচিত, এবং ইহাতে অনেক স্থলে দীর্ঘ মৌলিক স্বরের তৎসম উচ্চারণ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের ছন্দের ছন্দোবন্ধটি প্রাকৃত অনুযায়ী হউক অথবা বাঙালী কবির উদ্ভাবিতই হউক, ইহাতে ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরই কেবল দীর্ঘ, কিন্তু দীর্ঘ মৌলিক স্বর লঘু।

প্রথম স্তরের ছন্দ:

১৬ মাত্রার 'পাদাকুলক' অনুকরণে রচিত—

o o – o o – o – – – –
(১) আলিএঁ কালিএঁ | বাট রুন্ধেলা।
– o o – – o o – o o –
তা দেখি কাহ্নু | বিমনা ভইলা॥ (চর্যাপদ)

o o – o o o o – o o – –
(২) চির চন্দন উরে | হার ন দেলা।
– o o o o o o – o o – –
সে অব নদী গিরি | আঁতর ভেলা॥
o ● o o o o o o o o o o o o o –
পিয়াক গরবে হম | কাহক ন গণলা।
– o o o o ● o – o o o o –
সে পিয়া বিনা মোহে | কে কি ন কহলা॥ (বিদ্যাপতি)

− o − ১ o o − o o o o o o
(৩) নীল সিন্ধু-জল | ধৌত চ র ণ-তল,

o o o o − o o − o o − o o
অনিল বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল

− o o − o o − o o − o o
অম্বর-চুম্বিত | -ভাল হিমাচল,

− o ৻ − o o − o −
শুভ্র-তুষার কি | -রীটিনা।

− o o o o − o o o
ঐ ভুব ন মনো- | মোহিনী। (রবীন্দ্রনাথ)

২৮ মাত্রার জয়দেবী ছন্দ—

এই ছন্দের কোন নির্দিষ্ট নাম দেওয়া কঠিন। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে ইহাকে দ্বিপদী ছন্দ বলা হইয়াছে। হিন্দীতে এই ছন্দ দুবৈয়া নামে অভিহিত। প্রাচীন হিন্দী ভজনে এই ছন্দ ঠুমরী ছন্দ বা ভৈরবা ছন্দ নামেও পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির মৈথিল পদে এবং বাংলা ব্রজবুলি সাহিত্যে ইহার প্রচলন বেশী। জয়দেব তাঁহার অমর কাব্যে এই ছন্দকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। সেজন্য আমরা ইহাকে জয়দেবী ছন্দ বলিব। জয়দেবের কাব্যে ইহা ২৮ মাত্রার ছন্দ, ১৬ মাত্রার পরে যতি। কিন্তু ব্রজবুলিতে ও বাংলায় ইহার পর্ব-গঠন ৮+৮+১২=২৮ মাত্রা। দৃষ্টান্ত ঃ

− o o − o o − o o − o o
(১) চন্দন-চর্চিত নীল কলেবর

− o o o o o o − −
পীতব-ন বনমালী।

− o o − o o − o o − o o
কেলি চলন্মণি কুণ্ডল মণ্ডিত

− o o − o o − −
-গণ্ড-যুগ-স্মিতশালী ॥ (জয়দেব)

– ○ ○○○ – – ○ ○ –○○
(২) আজু রজনী হম | ভাগে গমাওলু।

–○○ ○○○○ –○
পেখলু পিয়ামুখ চন্দা।

–○○ –○○ ○○○ ○○ –○○
জীবন যৌবন | সফল করি মানলু।

○○ ○○ ○○ ○○––
দশ দিস ভেল নিরদন্দা॥

(বিদ্যাপতি)

–○○ ○○○ ○○○○ – ○ ○
(৩) নীরদ নয়নে | নীরঘন সিঞ্চনে |

○○○ ○○○ ○○–○
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।

–○ ○○–○ – ○ – ○ –○○
স্বেদ-মকরন্দ | বিন্দু বিন্দু চূয়ত।

○ ○○○ –○ ○–○
বিকশিত ভাব-কদম্ব।

(গোবিন্দ দাস)

●●○●●● ●● –●● ●● –
(৪) জন-গণ-মন-অধি | -নায়ক জয় হে |

– ●●–● ● – –
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

– ● –● – – ● ●––
(পন্) জাব সিন্ধু গুজ্ | -রাট মরাঠা |

– ●● – ● ● –●
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।

– ● ●–●● ●●– ––
বিন্ধ্য হিমাচল | যমুনা গঙ্গা |

– ●● ●●● ●–●
উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ।

(রবীন্দ্রনাথ)

চতুর্থ দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তির আরম্ভে ('পন্জাব') দুই মাত্রা অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। অপভ্রংশ ছন্দে এক প্রকার ৩০ মাত্রার ছন্দও পাওয়া যায়, প্রাকৃত পৈঙ্গলের মতে (১.১১৪) এই ছন্দের নাম "চউপইয়া"।

ছয় মাত্রার চলন—

রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি'-গানটির সহিত একটি অপভ্রংশ ছন্দের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তবে উভয় ছন্দে পার্থক্যও রহিয়াছে। অপভ্রংশ ছন্দটির নাম 'হীর' ছন্দ (প্রাকৃত পৈঙ্গল, ১.১৯৯-২০১)। দৃষ্টান্ত :

ধূলি ধবল, হক্ক সবল, পক্খি পবল, পত্তি এ।
কর্ণ চলই, কুম্ম ললই, ভূম্মি ভরই, কিত্তি এ।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ছন্দ সুলভ। যেমন,

(১) পঢ়ত কীর | অমিয়া গীর | ঐছন বচন | পাঁতিয়া
কোটি কাম | শ্যাম ধাম | নবীন-নীরদ- | কাঁতিয়া

(মাধব)

(২) হরি বৈমুখী | হামারি অঙ্গ | মদনানলে | দহনা

(বিদ্যাপতি)

বিদ্যাপতির কবিতা হইতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে শেষ পর্বটি ৪ মাত্রার। রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি'-গানটি অসম পংক্তিক ছন্দে রচিত হইলেও ইহার মূল গঠন উপরি-উদ্ধৃত ছন্দোবন্ধগুলির অনুরূপ। তুলনীয় :

দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্দ্রিত তব | ভেরী
আসিল যত | বীরবৃন্দ | আসন তব | ঘেরী ;

বাংলায় ইহা ৬ মাত্রার পর্ব-গঠিত শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ।

অপভ্রংশ ছন্দ হইতে কি ভাবে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে ৮ ও ৬ মাত্রার পর্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইলাম। অপভ্রংশে এমন অনেক ছন্দও পাওয়া যায়, যেখানে ৫ ও ৭ মাত্রার চলনের আভাস আছে। জয়দেব এই সকল ছন্দের আদর্শে কয়েকটি গীত রচনা করিয়াছিলেন, এবং

দ্বিতীয় স্তরে সম্ভবতঃ জয়দেবের ছন্দের অনুকরণ করিয়াই বাঙালী কবি ৫ ও ৭ মাত্রার পর্বে ছন্দ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

পাঁচ মাত্রার চলন—

(১) বদসি যদি, কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি, কৌমুদী.

হরতি দর, তিমিরমতি, ঘোরম্।

(জয়দেব)

(২) তুঙ্গ মণি | মন্দিরে | ঘন বিজুরি | সঞ্চরে

মেঘ-রুচি | বসন পরি | -ধানা।

সাত মাত্রার চলন—

(১) কিং করিষ্যতি, কিং বদিষ্যতি,

সা চিরং বিরহেন।

(জয়দেব)

(২) নন্দ-নন্দন | নীকে নাগর | নবীন ঘন রস | -মেহ।

নীল উৎপল | নবীন নীরদ | নিন্দি নিরুপম | দেহ।

(রাধামোহন)

(৩) দারু দারুণ | দয়িত ভূষণ | দলত দোলত হীয়

(গোবিন্দ দাস)

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দে চার মাত্রার গণই ছিল প্রধান। পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার গণ পরবর্তী সৃষ্টি এবং ইহাদের প্রয়োগও অল্প। চার মাত্রার দুইটি গণ যুক্ত করিয়াই বাংলায় ৮ মাত্রার পর্ব উৎপন্ন হয়। ৮ মাত্রার পর্বে রচিত শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই ছন্দে ৮ মাত্রার পর্বই সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়। চর্যার ষোড়শ-মাত্রিক ছন্দে বা দীর্ঘ ছন্দে প্রথম ও নবম মাত্রার উপর প্রবল যতি-পতন

হয় বলিয়া চর্যার ছন্দ সাধারণতঃ ৮ মাত্রার পর্বেই গঠিত[১]। একটু লক্ষ্য করিলেই অধিকাংশ পংক্তিতে চার মাত্রার পরে অর্ধ যতি পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই অর্ধ যতি দ্বারা পর্ব গঠন করা সঙ্গত নহে।

নগর বা- | হিরে ডোম্বি | তোহোরি | কুড়িয়া

বা

কমল কু | -লিশ ঘাণ্ট | করহুঁ বি | -আলী

—এই ভাবে চৌমাত্রিক পর্ব-বিভাগ করিয়া পড়িলে ইহাকে বাংলা ছন্দ বলিয়া মনে হয় না। চর্যার এই শ্রেণীর ছন্দ হইতেই পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং চর্যার যুগেই যে চৌমাত্রিক বিরতির পরিবর্তে ৮ মাত্রার পর্ব প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেজন্য আমাদের মতে ঐ দুই পংক্তির পর্ব-বিভাগ হইবে:

নগর বাহিরে ডোম্বি | তোহোরি কুড়িয়া

এবং

কমল কুলিশ ঘাণ্ট | করহুঁ বিআলী

প্রকৃত পক্ষে চার মাত্রার পর্ব বাংলা ছন্দে সুলভ নহে।

দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ

দ্বিতীয় স্তরের ছন্দ—পূর্ববর্তী স্তরে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী দীর্ঘ অক্ষরগুলিকে দুই মাত্রায় উচ্চারণ করার চেষ্টা দেখা যায়, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও সুলভ। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে শুধু ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরই, অর্থাৎ 'রাম্' এবং 'গৌ'—এই দুই জাতীয় অক্ষরই সম্প্রসারিত হয়; দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর (অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ, এ এবং ও)

---

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, O. D. B. L. পৃঃ ২৬১।

এই ছন্দে লঘু। এই দুই স্তরের ছন্দে ইহাই প্রধান পার্থক্য। পর্ব-গঠনের দিক্ দিয়া এই দুই স্তরের ছন্দে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পূর্ব-স্তরের ন্যায় এই স্তরেও ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ মাত্রার পর্ব ছন্দের উপাদান। প্রথম স্তরে ৬ মাত্রার পর্ব অধিক পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে ৬ মাত্রার পর্বই সর্বাধিক প্রচলিত। আধুনিক শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের শতকরা ৭৫-টিই বোধ হয় ৬ মাত্রার পর্বে রচিত। দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে চরণ-গঠনে ও স্তবক-বিন্যাসে অনেক নূতনত্ব দেখা যায়। চরণের পর্ব-সংখ্যা সব সময় সমান থাকে না; অনেক সময় অসম-পর্বিক চরণও পাওয়া যায়; এবং চরণ-বন্ধে ও স্তবকে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। পর্বের গঠন অনুসারে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান আধুনিক শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের উদাহরণ:

পাঁচ মাত্রার পর্ব—

(১) ভদ্র মোরা | শান্ত বড় | পোষ-মানা এ | প্রাণ
বোতাম-আঁটা | জামার নীচে | শান্তিতে শয়ান
দেখা হ'লেই | মিষ্ট অতি | মুখের ভাব | শিষ্ট কান্তি
অলস দেহে | ক্লিষ্ট গতি | গৃহের প্রতি | টান

(রবীন্দ্রনাথ)

[পর্ব-সমাবেশ—৫+ +৫+২; ৫+৫+৫+২; ৫+৫+৫+৫;
৫+৫+৫+২]

(২) মকর-চূড় | মুকুট খানি | কবরী তব | ঘিরে
পরায়ে দিনু | শিরে।
জ্বালায়ে বাতি | মাতিল সখী | দল
তোমার দেহে | রতন সাজ | করিল ঝল | মল।

(রবীন্দ্রনাথ)

[৫+৫+৫+২; ৫+২; ৫+৫+২; ৫+৫+৫+২]

(৩) নন্দপুর | -চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার
বহে না চল | মন্দানিল | লুটিয়া ফুল | গন্ধ ভার
জ্বলে না গৃহে | সন্ধ্যা দীপ | ফুটে না বনে | কুন্দ নীপ
ছুটে না কল- | কণ্ঠ-সুধা | পাপিয়া পিক | চন্দনার

(কালিদাস রায়)

[৫+৫+৫+৫ ; ৫+৫+৫+৫ ; ৫+৫ ৫+৫ ; ৫+৫+৫+৫]

(৪) ক্লান্ত দেহে | ফিরিনু আমি | দীর্ঘ পথ | ধরি,
শান্ত মনে | বসিনু এসে | ঘরের বাতায়নে,—
ঘুমায়ে পড়ি | -লাম।

(সজনীকান্ত দাস)

[৫+৫+৫+২ ; ৫+৫+৫+২ ; ৫+১]

ছয় মাত্রার পর্ব—

(১) বসন্ত নাহি | এ ধরায় আর | আগের মতো
জ্যোৎস্না যামিনী | যৌবন হারা | জীবন হত।

[৬+৬+৬]

(২) তোমাতে হেরিব | আমার দেবতা | হেরিব আমার | হরি
তোমার আলোকে | জাগিয়া রহিব | অনন্ত বিভা | -বরী।

[৬+৬+৬+২]

(৩) পথ বেঁধে দিলো | বন্ধন হীন | গ্রন্থি
আমরা দুজন | চলতি হাওয়ার | পন্থী।

(রবীন্দ্রনাথ)

[৬+৬+৩]

(৪) নম নম হিমা | -লয়
গিরিরাজ তুমি | মানচিত্রের | মসীর চিহ্ন | নয়!
বর্ষা মেঘের | মত গম্ভীর
দিগ্‌ বারণের | বিপুল শরীর
অবাধ বাতাস | বাধ্য তোমার | তোমারে সে করে | ভয়।

[৬+২ ; ৬+৬+৬+২ ; ৬+৬ ; ৬+৬ ; ৬+৬+৬+২]

(৫) (আহা) ঠুকরিয়ে মধু | কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে | বুলবুলি
টুলটুলে তাজা | ফলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়ে | ঘুলঘুলি !
(সত্যেন্দ্রনাথ)

[৬+৪ ; ৬+৪ ; ৬+৬ ; ৬+৪]

(৬) যেদিন সুনীল | জলধি হইতে | উঠিল জননী | ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে | সে কি কলরবে | সে কি মা ভক্তি | সে কি মা হর্ষ
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

[৬+৬+৬+৬]

(৭) বল বল বল | সবে
শত বীণা বেণু | রবে
ভারত আবার | জগৎ সভায় | শ্রেষ্ঠ আসন | লবে
(অতুলপ্রসাদ সেন)

[৬+২ ; ৬+২ ; ৬+৬+৬+২]

(৮) তৃপ্ত তোমার | আত্মার তৃষা | অমৃত শান্তি | নীরে
বিরাম লভিছ | লোকান্তরের | অলকানন্দা | তীরে।
(করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ)

[৬+৬+৬+২]

(৯) সৃষ্টির সুখে | মহাখুসি যারা | তারা নর নহে | জড়
যারা চিরদিন | কেঁদে কাটাইল | তারাই শ্রেষ্ঠ | -তর
মিথ্যা প্রকৃতি | মিছে আনন্দ | মিথ্যা রঙিন | সুখ
সত্য সত্য | সহস্র গুণ | সত্য জীবের | দুখ।
(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দুঃখবাদী)

[৬+৬+৬+২]

(১০) আমার নয়ন। -পুতলিতে হের | তোমার রূপের | ছায়া
দর্পণ ফেলে | দাও!
থির কটাক্ষে | আঁখি মেলি সখি | চাও।
(মোহিতলাল, রূপদর্পণ)

[৬+৬+৬+২ ; ৬+২ ; ৬+৬+২]

(১১) শ্যামলী বরষা | সাঁঝের আঙিনা | পরে
এলায়ে দিয়েছে | শ্রান্ত শিথিল | কায়া ;
ছাড়া পেয়ে আজ | লুকোচুরি খেলা | করে
গগনে গগনে | পলাতক আলো | -ছায়া
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শাশ্বতী)

[৬+৬+২]

(১২) আমি কবি যত | কামারের আর | কাঁসারির আর |
ছুতোরের মুটে | মজুরের I
আমি কবি যত | ইতরের I
আমি কবি ভাই | কর্মের আর | ঘর্মের I
বিলাস বিবশ | মর্মের যত | স্বপ্নের তরে | ভাই I
সময় যে হায় | নাই
(প্রেমেন্দ্র মিত্র, আমি কবি)

[৬+৬+৬+৬+৪ ; ৬+৪ ; ৬+৬+৩ ; ৬+৬+৬+২ ; ৬+২]

(১৩) সবি বুঝলুম | ইচ্ছে হ'লে যে | বাংলাও পারে | বলতে
তাও বুঝলুম | মহৎ যত্নে | একসেন্ট গুলো | সাজানো,
ব্যর্থ কি হবে | তাই ব'লে, বলো !
নিখুঁত বাংলা | ফোটে ফিরঙ্গ | -রঙ্গে
ইংরিজি সুরে | তির্যক গতি | -ভঙ্গে
(বুদ্ধদেব বসু, ম্যাল্-এ)

[৬+৬+৬+৩ ; ৬+৬+৬+৩ ; ৬+৬ ; ৬+৬+৩ ; ৬+৬+৩]

(১৪) হৃদয় আমার | খেয়ার যাত্রী | বৈতরণীর | পার
কাণ্ডারী হীন | বালুকা বেলায় | দৃষ্টি ঘুরিছে | দূরে
হৃদয় আমার | ছাপিয়ে উঠেছে | বাতাসের হাহা | -কারে।
(বিষ্ণু দে, ক্রেসিডা)

[৬+৬+৬+২ ; ৬+৬+৬+২ ; ৬+৬+৬+২]

(১৫) অস্ত্র মেলেনি | এতদিন তাই | ভেঁজেছি তান
অভ্যাস ছিল | তীর ধনুকের | ছেলেবেলায়
(সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রস্তাব)

[৬+৬+৫]

সাত মাত্রার পর্ব—

এই ছন্দ গোবিন্দদাসের বিশেষ প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথও এই ছন্দে বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

(১) হৃদয় আজি মোর | কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা | করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত | মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মম | হাসিছে গলাগলি।

[৭+৭]

(২) খাঁচার পাখী ছিল | সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল | বনে
একদা কি করিয়া | মিলন হ'ল দোঁহে |
কি ছিল বিধাতার | মনে
(রবীন্দ্রনাথ)

[৭+৭+৭+২]

(৩) একদা হ'ল দুটি | বোনে
পুতুল নিয়ে কি কা- | রণে
ঝগড়া কাড়াকাড়ি,
তখন দিয়ে আড়ি,
হারিয়া কাঁদো কাঁদো
হয়ে সে আধো আধো
কহিল "ডিডি টুমি | টুই"।
(সত্যেন্দ্রনাথ, প্রথম গালি)

[৭+২ ; ৭+২ ; ৭ ; ৭ ; ৭ ; ৭ ; ৭+২]

(৪) শ্রান্ত অবিরত | যামিনী জাগরণে ;
অবশ কৃশ তনু | মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা | বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম | করুণা ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি | যাতনা তাপ ভুলি
বদন পানে চেয়ে | থাকি রে।
(রজনীকান্ত সেন, মাতৃবন্দনা)

[৭+৭ ; ৭+৭ ; ৭+৭ ; ৭+৭ ; ৭+৭ ; ৭+৩]

চার ও আট মাত্রার পর্ব—চার মাত্রার পর্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই ছন্দের সহিত চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের সাদৃশ্য আছে। এই ছন্দের একটি প্রধান অসুবিধা হইল, ঘন ঘন শ্বাসাঘাতের সাহায্যে ইহা আবৃত্তি করিতে হয়। যেমন,

/ঝিনেদার | /জমিদার | /কালাচাঁদ | /রায় রা

এই ভাবে প্রতি শব্দে শ্বাসাঘাত ফেলিয়া আবৃত্তি করিতে হইলে শ্বাসযন্ত্রের উপর ঘন ঘন আঘাত পড়ে। বাংলা উচ্চারণ এতখানি অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণ কিরূপ, সেকথা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

এখানে এইটুকু বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, ইংরেজীর মত ঘন ঘন শ্বাসাঘাতের দ্বারা কর্ম-ব্যস্ত দ্রুত পদক্ষেপে বাংলা উচ্চারণ চলিতে পারে না। এক একটি স্বরাঘাতের সাহায্যে দুই তিনটি শব্দকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধীর পদক্ষেপে চলাই তাহার স্বভাব। সেজন্য চৌমাত্রিক ছন্দের দ্রুত কদম বাংলা উচ্চারণের পক্ষে একটু বেশী অস্বাভাবিক। এবং এই কারণেই 'আগাডুম বাগাডুম' ছন্দ বাংলায় চলে নাই। অথচ চৌমাত্রিক দুইটি পর্ব যুক্ত করিয়া আবৃত্তি করিলে তাহা বাংলায় বেশ স্বাভাবিক শুনায়। যেমন,

ঠিক দুক্কুর বেলা | ঘুঘ্‌ঘুটি !
থই থই কালো মেঘ | ভ্রূকুটি !
ইন্দ্রের কোচম্যান্ | গলা হাঁকরায় !
ঐরাবতের পিঠে | বেত হাঁকড়ায় ! (সত্যেন্দ্রনাথ)

বাংলা সাহিত্যে চৌমাত্রিক ছন্দ এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে। ইহা ভাব-গাম্ভীর্যের গুরু-ভার সহিতে পারিবে কি না বুঝা যাইতেছে না। সেজন্য অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা রচনাতেই ইহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অষ্টমাত্রিক দীর্ঘ ছন্দের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। বিদ্যাপতির কবিতায় ও ব্রজবুলি সাহিত্যে দীর্ঘ ছন্দের বিশেষ প্রচলন ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই ছন্দে বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচিত হইয়াছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের,

দিন শেষ হ'য়ে এল | আঁধারিল ধরণী |
আর বেয়ে কাজ নাই | তরণী,
হাঁ গো এ কাদের দেশে | বিদেশী নামিনু এসে |
তাহারে শুধানু হেসে | যেমনি,
অমনি কথা না বলি | ভরা ঘট ছলছলি |
নতমুখে গেল চলি | তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর | তরণী॥

অথবা সত্যেন্দ্রনাথের

কোথা রে চাঁদের রাধা | কোথা সেই অনুরাধা
শ্রবণা শ্রবণ-মন | -হরণী ?
কোথা অতীতের সাথী | মুক্তা-হাসিনী স্বাতী,
স্বপন গাঙে কি বায় | তরণী ?

প্রাচীন সাহিত্যেও এই ছন্দের প্রচলন ছিল। ১৯শ শতকের ছান্দসিকগণ এই ছন্দের নাম দিয়াছিলেন "ললিত ত্রিপদী"।

ছন্দানন্দ—শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের প্রধান প্রধান পর্ব-গঠনগুলি দেখান হইল। এই সকল পর্বের সংখ্যা কমাইয়া, বাড়াইয়া এবং শেষ পর্বটি খণ্ডিত বা বর্ধিত করিয়া কত প্রকার চরণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। ছন্দের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। এই আনন্দ রসের 'উল্লাস' নহে। ইহা এক প্রকার বিশেষ ধরণের আনন্দ, ইহা 'ছন্দানন্দ'। শব্দের গতি-তরঙ্গে ইহার উৎপত্তি এবং মনের এক প্রকার পরম সন্তোষে ইহার পরিণতি। এই গতি-তরঙ্গ সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার একটির সহিত অন্যটির ভেদ বুঝিতে পারিলে পূর্ণ সন্তোষ লাভ করা যায়। অদীক্ষিতের পক্ষে এইরূপ বিশ্লেষণ সহজ নহে। সেইজন্যই ছন্দের গঠন ও প্রকৃতি শিক্ষা করা আবশ্যক হয়। কিন্তু ছন্দ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পাঠ করিয়াই ছন্দানন্দ উপলব্ধি করা যায় না। ইহার জন্য বিশেষ এক প্রকার মানসিক প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক। রূপকার-রচিত সুন্দর সুন্দর ছন্দাদর্শ বারম্বার অনুরাগের সহিত পাঠ করিলে, তবেই ছন্দ-উপভোগের শক্তি উৎপন্ন হয়। শিক্ষার্থীকে এই সুযোগ দিবার জন্য আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর ছন্দের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত কতকটা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি। এবং পাঠকগণ যাহাতে সহজেই মনে রাখিতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন কবির যে-সকল রচনা অধিক প্রচলিত, সেইগুইলি আমরা

সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উদাহরণগুলির নীচে পর্ব-সমাবেশের ইঙ্গিত দেওয়া আছে। উহার সহিত মিলাইয়া মনোযোগের সহিত উদাহরণগুলি পাঠ করা এবং একটির সহিত অন্যটির ভেদ বা সাদৃশ্য কোথায় তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই ভাবে অভ্যাস করিলে ছন্দের সহিত প্রকৃত পরিচয় হইবে, এবং পাঠক এই শ্রেণীর ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিজেরাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পূর্বেই কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইতেছে।

শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য—(১) এই ছন্দের পর্ব-বিভাগ দেশজ ছন্দের ন্যায় অতটা স্পষ্ট না হইলেও, বেশ স্পষ্ট। পর্বে ঝোঁক বা 'সম্' কোথায় পড়িতেছে সহজেই বুঝা যায়। পর্বের শ্বাসাঘাতটিও প্রবল থাকে।

(২) এই ছন্দে সাধারণতঃ ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের সম্প্রসারণ বা তৎসম উচ্চারণ করা হয়, এবং তাহার ফলে পংক্তিতে যুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি শ্রুতি-মধুর ধ্বনি-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় কবিকে এই ধ্বনি-তরঙ্গের আকর্ষণে অতিরিক্ত পরিমাণ যৌগিক ধ্বনি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহাতে ছন্দের ঝঙ্কার এতটা প্রাধান্য লাভ করে যে কবিতার ভাব আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে।

(৩) এই ছন্দে পাঁচ বা সাত মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৪) দেশজ ছন্দের ন্যায় এই ছন্দেও যতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেজন্য ছেদ যতির সহগামী না হইলে, ছেদকে উপেক্ষা করিয়া যতি অনুসারেই পর্ব গঠন করিলে ভাল শুনায়। যেমন,

আত্মহারা, সদা | বিমুখী নিজ সুখে

ইহাকে

আত্মহারা | সদা বিমুখী নিজ সুখে

—এই ভাবে ছেদ-পর্বিক করিয়া আবৃত্তি করা চলে না। পয়ার-জাতীয় ছন্দে কিন্তু ছেদকে এই ভাবে বলি দিবার প্রয়োজন হয় না। যেমন,

জ্ঞান যেথা মুক্ত, | যেথা গৃহের প্রাচীর

না পড়িয়া পয়ারের ৮+৬-এর ছন্দোবন্ধ বজায় রাখার জন্য

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা | গৃহের প্রাচীর

—এই ভাবে পংক্তিটি পড়ার প্রয়োজন হয় না।

অবশ্য সমসাময়িক কবিতায় শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দোবন্ধকেও ছেদ-নিষ্ঠ করা যায় কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। একটি দৃষ্টান্ত :

গুরু) রবি ঠাকুরের দিব্য, আমিও কাব্য গাই

ছন্দ-শিখীরে সুরে নাচাই।

(অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, পূর্বরঙ্গ)

(৫) যতি-প্রাধান্যের জন্য এই ছন্দের গঠন কতকটা অনমনীয়। ইহা সহসা কোন অনিয়ম স্বীকার করিয়া লইতে চাহে না। ছেদকে উপেক্ষা করিতেও যেমন ইহার আপত্তি নাই, সেইরূপ শব্দকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া যতি স্থাপন করিতেও দ্বিধা নাই। যেমন,

পুতুল নিয়ে কি কা- | রণে

অথবা নজরুল ইসলামের

সপ্ত আকাশ | সপ্তস্বরা | হানে ঘন কর | তালি,

কাঁদিছে ধরায় | তাহারি প্রতি (দ্) | -ধ্বনি খালি সব | খালি

(ইন্দ্রপতন)

দেশজ ছন্দে যতি দ্বারা শব্দ-খণ্ডন আরও অধিক সুলভ। কিন্তু আধুনিক উৎকৃষ্ট পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দ-খণ্ডন সুলভ নহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পদ্যে যে-সকল অস্বাভাবিকতা ছন্দের প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দেই

তাহাদের অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন, কোন কোন স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ। অবশ্য শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে মাত্রা-সম্প্রসারণ নিয়ম মানিয়া চলে; কিন্তু দেশজ ছন্দে সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচনের কোন নিয়ম নাই। দেশজ ছন্দ একান্তই ছন্দ-প্রধান, সেখানে শব্দের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। ইহা ছাড়া, আরও দুইটি বিষয়ে দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেয়। একটি হইল, ছেদকে অমান্য করা ও অপরটি হইল শব্দ-খণ্ডন।

(৬) গাঠনিক অনমনীয়তার জন্য প্রবহমাণ ভঙ্গীতে বা অসম-পর্বিক ভঙ্গীতে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ রচনা করা কঠিন। কিন্তু কঠিন হইলেও, ইহা অসম্ভব নহে। অসম পর্ব ব্যবহার করিয়া এই শ্রেণীর ছন্দ রচনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যেমন,

গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুবা | ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সুর | সাতটি যেন পোষা | পাখী

[৭+৫+৭+২]

অথবা

ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন | প্রবাসী

[৭+৪+৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন প্রয়াণ'-কাব্যেও কয়েকটি অসম-পর্বিক শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ পাওয়া যায়। যেমন,

হেতায় | ঝরঝর | ঝরঝর | ঝরণা ঝরে,
পাদপ | মরমর | মরমর | শব্দ করে;
কি জানি | কোথা হ'তে | বায়ুপথে | আসিছে গীত;
বীণার | ঝঙ্কার | হয় আর | আচম্বিত।

অবশ্য কবিতাটি অন্য ভাবেও পড়া চলে:

(হেতায়) ঝরঝর | ঝরঝর | ঝরণা ঝরে,
পাদপ) মরমর | মরমর | শব্দ করে;

—এই ভাবে পংক্তির প্রথম তিন মাত্রা অনাঘাতের সাহায্যে দুর্বল করিয়া আবৃত্তি করিলে ইহাতে পর্ব-বৈষম্য থাকে না।

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ

ইহা অক্ষর-ছন্দ অথবা মাত্রা-ছন্দ?—পূর্বে ছান্দসিকগণ ইহাকে অক্ষরছন্দ বলিতেন। এই ছন্দকে এখন আর অক্ষরছন্দ কেন বলা যায় না, সেকথা আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহার অক্ষর-নির্ভরতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার পূর্বে তলাইয়া দেখা দরকার, কেন ইহাকে পূর্বে অক্ষরছন্দ বলা হইত। তাহা হইলে আমরা এই ছন্দের প্রকৃতি ভাল ভাবে বুঝিতে পারিব।

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের আদিকথা—প্রাকৃত যুগে মাত্রাছন্দের প্রথম প্রচলন হয়। কিন্তু সে সময় সংস্কৃত ছন্দ (বৃত্তছন্দ) ছিল দেশবাসীর আদর্শ। সেজন্য প্রাকৃত যুগের ছন্দে খুব বেশী সংস্কৃত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমতঃ, প্রাকৃত সাহিত্যে বৃত্তছন্দেরই প্রাধান্য। দ্বিতীয়তঃ, আর্যা, বৈতালীয় প্রভৃতি প্রাকৃত ছন্দ বা জাতিছন্দগুলি কিয়ৎ পরিমাণে বদ্ধাক্ষর করিয়া অনেক নূতন নূতন ছন্দোবন্ধ প্রাকৃত যুগে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। পরে অপভ্রংশ যুগে অবশ্য জাতি ছন্দের প্রচলন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে যুগেও মাত্রাছন্দ অভিজাত বৃত্তছন্দের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে নাই। প্রাকৃত পৈঙ্গলে বহু পুরাতন ও নূতন প্যাটার্ণের অক্ষরছন্দ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, কয়েকটি মাত্রাছন্দেও গুরু ও লঘু অক্ষরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যেমন রোলা ছন্দে ২৪ মাত্রা থাকার কথা। ইহাদের মধ্যে ১১টি গুরু ও ২টি লঘু অক্ষর দিয়া এই চতুর্বিংশতি মাত্রিক চরণ গঠিত হইলে উহার নাম হইবে 'কুন্দ', ১০টি গুরু+৪টি লঘু হইলে 'করতল', ৯টি গুরু+৬টি লঘু হইলে 'মেঘ'। এই ভাবে লঘু-গুরু অক্ষরের সংখ্যা অনুযায়ী ১২ প্রকার রোলা ছন্দের কথা বলা হইয়াছে।

রোলা ছন্দ মাত্রাছন্দ হইলেও অক্ষরের সংখ্যা অনুসারেও ইহার গঠন নির্ণয় করা যাইতে পারে, যেমন 'কুন্দ'—১৩ অক্ষর, 'করতল'—১৪ অক্ষর, 'মেঘ' —১৫ অক্ষর। সুতরাং ইহাকে এক প্রকার নূতন অক্ষর-ছন্দও বলা যায়। বৃত্তছন্দের ন্যায় ইহা বদ্ধাক্ষর নহে, অর্থাৎ পংক্তির কোন্ অক্ষর গুরু, এবং কোন্‌টি লঘু হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করা নাই। কিন্তু পংক্তিতে ব্যবহৃত অক্ষরের মোট সংখ্যা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে অক্ষর নির্ভর ছন্দও বলা চলে। প্রাকৃত যুগেই এই প্রকার অবদ্ধাক্ষর অক্ষরছন্দের সূত্রপাত হইয়াছিল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদিক ছন্দ ও বৃত্তছন্দ, ভারতের এই দুইটি অভিজাত ছন্দই অক্ষর-নির্ভর বলিয়া এই ছন্দ-পদ্ধতি পরবর্তী যুগেও ছন্দ-রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অপভ্রংশ যুগে বদ্ধাক্ষর বৃত্তছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তাক্ষর অক্ষরছন্দের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। ইহাতে বৃত্তছন্দের মতো লঘু-গুরু অক্ষরের স্থান নির্দিষ্ট না করিয়া শুধু লঘু-গুরু অক্ষরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা থাকিত।

অপভ্রংশ যুগ পর্যন্ত অক্ষরছন্দের ক্রমবিকাশ দেখান হইল। ৯ম-১০ম শতকে অপভ্রংশ ভাষার অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক উপভাষাগুলি এত অধিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছিল যে, তখন আর তাহাদের অপভ্রংশ বলা চলিত না। এই ভাবে বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী, প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষার সৃষ্টি হয়। সে সময় বাংলা দেশ বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনাধীন ছিল। বৌদ্ধগণ সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ অপেক্ষা লৌকিক ভাষা ও ছন্দের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। পালি সাহিত্যে গাথা ছন্দের প্রচলন বেশী। বাংলা ভাষার আদি যুগে বৌদ্ধ আচার্যগণ যখন বাংলা ভাষায় চর্যাপদ রচনা করেন, সে সময় তাঁহারাও অপভ্রংশ মাত্রাছন্দই অবলম্বন করিয়াছিলেন, অক্ষরছন্দের কথা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই।

তারপর, সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলায় হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সংস্কৃতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় সংস্কৃত ছন্দের প্রতি বাঙালী কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। জয়দেবের কাব্যে সন্ধি যুগেরই ধারা-সঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যে অপভ্রংশের গীত-পদ্ধতি অবলম্বিত হইল, কিন্তু কাব্যের ভাষা হইল সংস্কৃত। তাহা ছাড়া, কাহিনীর অংশ-বিশেষ সংস্কৃত ছন্দে রচিত হইলেও যখনই আবেগের আতিশয্য প্রকাশ করা প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই কবি অপভ্রংশ ছন্দে 'গীত' রচনা করিয়াছেন। আবার, এই সকল 'গীত' অপভ্রংশ ছন্দে রচিত হইলেও অপভ্রংশের শিথিল উচ্চারণ তিনি অনুসরণ করেন নাই।

জয়দেবের পর ত্রয়োদশ শতকে বাংলা দেশ তুর্কী রাষ্ট্রশক্তির করায়ত্ত হইল। এই সময় প্রায় দুই শত বৎসর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নীরব। খুব সম্ভব, সে যুগের বাংলা ভাষা এতই অপুষ্ট ছিল যে, ঐ ভাষায় রচিত সাহিত্য কালের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। এই যুগকে গঠন-যুগ বলা যাইতে পারে। তখন অলক্ষ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর দেশবাসিগণের সংস্কৃতি মিশ্রিত হইয়া মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছিল। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ বা পয়ার-জাতীয় ছন্দ এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাঙালী কবি কাব্য-রচনা করিতে বসিয়া দেখিলেন, বাংলায় মাত্রাছন্দ আছে, কিন্তু অক্ষরছন্দ নাই। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে অক্ষরছন্দই প্রধান। সেই অক্ষরছন্দই বাংলায় নাই। এই অভাব পূরণের জন্য তাঁহারা সচেষ্ট হইবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। পূর্বেও অভিজাত সংস্কৃত ছন্দের প্রভাবে মাত্রাছন্দ হইতে নানা প্রকার মাত্রাক্ষর মিশ্র-ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, রোলা ছন্দের আলোচনায় তাহা দেখান হইয়াছে। এই যুগেও বাঙালী কবি মাত্রাছন্দের গঠনের সহিত অক্ষর-পদ্ধতির সংমিশ্রণ করিয়া নূতন ধরণের ছন্দ সৃষ্টি করিলেন।

অক্ষর-সাম্য সত্ত্বেও প্রাকৃত-পৈঙ্গলে রোলা ছন্দকে যে-কারণে মাত্রাছন্দ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, সেই কারণে আমরাও ইহাকে মাত্রাছন্দই বলিতে চাহি। প্রাকৃতজ গোষ্ঠীর ছন্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা ইহার নাম দিয়াছি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ।

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের উৎপত্তি—প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, অপভ্রংশ ছন্দে আবশ্যক হইলে দুই তিনটি ধ্বনি-খণ্ড ত্বরিত উচ্চারণে এক মাত্রার করিয়া পড়া চলিত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে যাহাকে 'ত্বরিত উচ্চারণ' বলা হইয়াছে, আমরা তাহাকে বলি 'মাত্রা-সঙ্কোচন'। চর্যার ছন্দে এই মাত্রা-সঙ্কোচন খুব সুলভ। যেমন,

(১) নি র ন্ত র গঅ ন ন্ত | তুষে ঘোলই

(২) কমল কুলিশ ঘাণ্ট | করহ বিআলী

(৩) চেন্ডণ পায়ের গীত | বিরলে বুঝয়ে

(৪) করই অনুদিনং | তৈলোএ পমাই

নিরন্তর, গঅনন্ত, ঘাণ্ট, প্রভৃতি শব্দে যে মাত্রা-সঙ্কোচন পাওয়া যাইতেছে, উহা পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দিয়াছিলেন 'পয়ারের শোষণ-শক্তি'। অন্য ছন্দে যুক্ত-বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অথবা শব্দ-মধ্য ঐ-, ঔ-যুক্ত যৌগিক ধ্বনি দীর্ঘ। পয়ার-জাতীয় ছন্দেই শুধু এই শ্রেণীর ব্যঞ্জনান্ত ও স্বরান্ত যৌগিক ধ্বনি মর্যাদা ভ্রষ্ট। এই জাতীয় ছন্দে ইহাকে এক মাত্রার কাল-পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সেজন্য এই শ্রেণীর ছন্দে এক একটি পংক্তিতে অনেকগুলি যুক্ত-বর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:

দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য পূর্ণ | দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত

বাংলার পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দ-মধ্য যৌগিক অক্ষরের যে-সঙ্কোচন পাওয়া যায়, তাহা বাংলা দেশে একটি আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। নিছক ছন্দের প্রয়োজনেই এরূপ 'ত্বরিত উচ্চারণ' ছন্দ-শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। শুধু বাংলা দেশেই নহে, আসামে ও উড়িষ্যাতেও পঞ্চদশ শতক হইতে পয়ার-ত্রিপদী জাতীয় ছন্দের প্রচলন পাওয়া যায়। ঐ সকল ছন্দেও শব্দ-মধ্য যৌগিক অক্ষরের লঘু উচ্চারণ স্বীকৃত। সুতরাং এই ব্যাপারের মূলে কোন গভীর তত্ত্ব নিহিত থাকাই সম্ভব। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পালি ও প্রাকৃতে যুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হইত। যথা, সংস্কৃত 'জীর্ণ', পালি-প্রাকৃতে 'জিণ্ণ', সংস্কৃত 'সূত্র', পালি-প্রাকৃতে 'সুত্ত'। সংস্কৃত, 'ওষ্ঠ', পালি-প্রাকৃতে হ্রস্ব 'ও' দ্বারা লিখিত 'ওট্‌ঠ' (গাইগার, পৃঃ ৬৩)। সংস্কৃত 'ঐ', 'ঔ' পালিতে 'এ', 'ও', 'ই' প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ অপভ্রংশ যুগে দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরগুলিও কবিতায় মাঝে মাঝে হ্রস্ববৎ ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, পালি যুগেই জনসাধারণের উচ্চারণে দীর্ঘ অক্ষর দুর্বল হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ অক্ষরের এই অ-তৎসম উচ্চারণ মাগধী অঞ্চলে বিশেষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। চর্যায় ও দোহাকোষে দীর্ঘ অক্ষরের দুর্বল প্রয়োগ অত্যন্ত সুলভ। এই দুর্বল উচ্চারণের ফলেই শব্দের যুক্ত-ব্যঞ্জনগুলি বাংলায় একক ব্যঞ্জনে পরিণত হইতে থাকে। সব ক্ষেত্রেই compensatory lengthening হইত, তাহা নহে। যেমন, 'সম্মুখ' বাংলায় 'সমুখ'—'সামুখ' নহে। সেইরূপ সূত্র = সুত্ত = সুতা, সুতো ; পুত্র = পুত্ত = পুতা ; শূন্য = সুন্ন = শুন ; উচ্চ = উচা ; নিষ্ঠুর = নিঠুর ; মিথ্যা = মিচ্ছা = মিছা ; বন্ধু = বঁধু ; পুস্তক = পোত্থয় = পুথি ; ইত্যাদি।

এই ভাবে উচ্চারণে হ্রস্ব-প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে আসিয়া দেখা গেল, মাগধী-অঞ্চলের উচ্চারণে সমস্ত অক্ষরই প্রায় লঘু। এই সময় প্রাদেশিক ভাষায় যাঁহারা কাব্য-রচনা করিতেন,

তাঁহারা ছিলেন নিরক্ষর বা অল্প-শিক্ষিত। স্বভাব-কবিদের প্রেরণা-বলেই তাঁহারা পদ্য রচনা করিতেন। ক্লাসিক ছন্দের সূক্ষ্ম নিয়মাবলী তাঁহাদের জানিবার কথা নহে। ছন্দের অনুরোধে কবিতার সর্বত্র কৃত্রিম উচ্চারণ-রীতি অনুসরণ করিবার মত শব্দ সাধনাও তাঁহাদের ছিল না। এই সকল স্বভাব কবির রচনাতেই শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ ভাঙ্গিয়া এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি হয়। তাহাই আমাদের পয়ার-জাতীয় ছন্দ। শব্দান্ত অদৃশ্য অ-কারের লোপের ফলে আধুনিক যুগে যে সকল হলন্ত অক্ষর উৎপন্ন হয়, ঐগুলি বাদ দিলে আর সব অক্ষরই প্রায় এই ছন্দে লঘু। লঘু অক্ষরের সংখ্যাধিক্য চর্যাব ছন্দেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যথা,

••○ ••• •○ ••○ •– –
কমল কুলিশ ঘান্ট | করহ বিআলী

বা

••• ••• •• ••– –••
চেন্তণ পায়ের গন্ত | বিরলে বুঝয়ে

—এই দুই পংক্তি ষোড়শ-মাত্রিক, কিন্তু এখানে ১৪টি অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহার ১২টি অক্ষরই লঘু এবং ২টি অক্ষর মাত্র গুরু। এই সকল পংক্তি সর্ব-লঘু করিয়া পড়িলে ইহারা

কংসের কারণে হএ | সৃষ্টির বিনাশে

বা

কাননে কুসুম কলি | সকলি ফুটিল

—এই শ্রেণীর পয়ার-পংক্তির সহিত হুবহু মিলিয়া যাইবে। চর্যার আর একটি পংক্তি :

••• ••• •• ••• ••• ••
ভুসুক ভণই কট | রাউতু ভণই কট |

•• – –• •– –
সঅলা এহ সহাবা।

ইহা ২০টি লঘু অক্ষর ও মাত্র ৪টি গুরু অক্ষর দ্বারা গঠিত ২৮ মাত্রার পংক্তি। ইহার সহিত বাংলা দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। যথা,

অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া

আলোচনা-সংক্ষেপ—উপরের আলোচনায় যে-সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে সূত্রাকারে এই :

(১) পূর্বে বাংলায় অক্ষরছন্দ ছিল না; বাংলা কাব্য প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রাছন্দের উত্তরাধিকারী।

(২) অক্ষরছন্দের অভাব পূরণের জন্য নূতন ভাবে পয়ার-জাতীয় ছন্দ সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

(৩) নব-আর্য যুগে উচ্চারণের হ্রস্ব-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়; দীর্ঘ অক্ষরের লঘু উচ্চারণ এবং শব্দ-মধ্য ব্যঞ্জন ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ করা হইতে থাকে।

(৪) ইহার ফলে চর্যার বহু পংক্তিতে দুই একটি দীর্ঘ অক্ষর ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত অক্ষর হ্রস্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) এইরূপ লঘু-প্রধান পংক্তির আদর্শেই আদি যুগের বাঙালী কবি সর্ব-লঘু অক্ষর ব্যবহার করিয়া এক প্রকার নূতন অক্ষর-ছন্দ প্রবর্তন করেন। ইহাই বাংলার পয়ার-জাতীয় ছন্দ। আমরা ইহার নাম দিয়াছি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ।

মধ্য যুগের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ—মধ্য যুগের কবিগণ এই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দকে অক্ষরছন্দ বলিয়া মনে করিতেন। সেজন্য ইহার প্রতি অক্ষর এক মাত্রায় উচ্চারণ করিয়া এই ছন্দের অক্ষর-নির্ভরতা রক্ষার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই উদ্দেশ্যে কখনও তাঁহাদের সঙ্কোচন-

নীতি অবলম্বন করিতে হইত, কখনও বা তাঁহারা স্বর-সংযোজন বা স্বরাগমের সাহায্যে অক্ষর ও মাত্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। মধ্য যুগের কবিদের রচনা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এই কথাটা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে:

(১) অকারণে আগ রাধা | নিন্দসি (নিন্দইস্)[১] কৃষ্ণ কালা।

(২) তোহার ডাগে হৈলে কংসা | -সুরের বিনাশে।

(৩) ভাইওর বলে ভাইএর ধনে | নাতি ভাই বাঁটা।

(৪) যদির তরে তোমার বাপে | করিল (কইরল)[১] কন্যাদান।

(৫) কৃ ষ্ণে র ন ন্দ ন বী র রুষিল | যেহেন প্র চ ণ্ড।

(৬) কেহ্ন মনে পার হরিব | ছোট নাত্র জানি

(৭) বাঁশীর শবদে মোর | আউলাইলো রান্ধন।

(৮) গোসাঞি সেঁ অরি কান্ধাঞি | ঝাট বাহ নাএ

প্রকৃত উচ্চারণ অনুযায়ী 'কৃষ্ণে-নন্দ-ন্বীর্ক্‌সিল'—এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইলে ঐ অংশে ৮টি মাত্রা, ৮টি অক্ষর ও ৮টি বর্ণই পাওয়া যাইবে।

আবার পংক্তিতে অক্ষর-সংখ্যা কম পড়িলে তাঁহারা স্বর-সংযোজন (বিপ্রকর্ষ) করিয়া অক্ষরের সংখ্যা পূরণ করিতেন। যেমন,

( ) 'করপুর' সম দধি | দুধের পসার।

---

[১] শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, O. D. B. L. পৃঃ ২৬৭।

(২) ভণেঁাহো 'মৃগধী' রাধা | না চিহ্ন আ স্কারে।

(৩) তোর পাজ দেখি | রাত্তা 'উতপল' |

লাজে লুকাইল জলে।

(৪) 'বেকত' অমৃত তোর | মধুর বচন।

(৫) তেন গুণী 'ঈষত' হাসিআঁ তাতিখণে।

(৬) 'ঈষত' ভাসির | তরঙ্গ হিল্লোলে |

মদন 'মূরছা' পায়ে।

(৭) 'শরত' সময়ে হের | বাঁশীর 'শবদে'।

(৮) 'যাবত' পবনে ঢেউ | নাহি বা ন্ধে পানী |

মঙ্গলচণ্ডীর গানগুলিতে অনেকস্থলে অক্ষর-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য 'শ্রীমন্ত' স্থলে 'শ্রীঅমন্ত' এবং 'শ্রীপতি' স্থলে 'শ্রীঅপতি' পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মধ্যযুগে বাঙালী কবিগণ ছন্দের প্রয়োজনে নূতন নূতন ভগ্ন-তৎসম শব্দ সৃষ্টি করিতেন। এই সকল বিকৃত শব্দের প্রাচুর্য দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, মধ্যযুগের কবিগণও ছন্দ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁহাদের ছন্দ-চেতনা সত্ত্বেও যে তাঁহাদের কাব্যে এত বেশী ছন্দ-শৈথিল্য পাওয়া যায়, সেজন্য সম্ভবতঃ লিপিকরগণই প্রধানতঃ দায়ী।

আধুনিক ভগ্ন-প্রাকৃত ছন্দ কি অক্ষরছন্দ?—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আদি যুগে হ্রস্ব ও হ্রস্বীকৃত অক্ষরের উপাদানে এই নূতন অক্ষরছন্দ গঠিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের কবিগণ এই ছন্দের আক্ষরিকতা

রক্ষা করিবার জন্য কখনও স্বর-সঙ্কোচন করিয়া কখনও বা স্বর-সংযোজন করিয়া অক্ষরের সংখ্যা সমান রাখিতেন। কিন্তু আধুনিক যুগে বাংলা উচ্চারণের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এই ছন্দকে অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দকে এখন অক্ষরছন্দ বলা যায় কি না বিবেচ্য।

বাঙালীর উচ্চারণে আদ্য শ্বাসাঘাত প্রতিষ্ঠা লাভ করায় আদি ও মধ্য যুগেই শব্দের অক্ষর-সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু প্রাক্-বাংলা যুগের অনাদ্য শ্বাসাঘাত বাঙালীর নিকট তখনও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। সেজন্য "কাশীরামঅ দাস্অ কহে" বা "পরাণে বধিব তোক্অ জানায়া গোয়াল্অ", বা "কোণ্অ সুখে কংস তোরঅ মুখে উঠে হাস্অ"— এই জাতীয় শব্দান্ত অ-কারের উচ্চারণ তখনও বাঙালীর কর্ণ-পীড়া উৎপাদন করিত না। এমন কি তোর্, কোন্, এই সকল ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের শেষে স্বর সংযোজন করিয়া ব্যঞ্জন-খণ্ডকে এক মাত্রার পূর্ণ অক্ষরে পরিণত করা হইত। "শরত সময় বেলা"ও তাহাদের নিকট অস্বাভাবিক শুনাইত না।

কিন্তু এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দান্ত ব্যঞ্জনাশ্রয়ী অদৃশ্য '-অ' উচ্চারিত হয় না। ফলে শব্দে অক্ষরের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। যেমন 'কা-শী-রা-ম্অ' = ৪ অক্ষর, কিন্তু 'কা-শী-রাম্' = ৩ অক্ষর। এই সকল ক্ষেত্রে অক্ষরের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও মাত্রা-সংখ্যা ঠিকই থাকে, কারণ শব্দান্ত '-অ' অনুচ্চারিত হইলেও স্বর-সম্প্রসারণ দ্বারা বা একটি সৃতি-স্বর (vowel glide) আমদানী করিয়া মাত্রা-সংখ্যা ঠিক রাখা হইতেছে। যথা, 'কাশীরাম্অ দাঅস্ কহে'। এখানে মাত্রা-সংখ্যা ৮, যদিও 'রাম' ও 'দাস' এক-এক অক্ষরে পর্যবসিত হওয়ায় ঐ অংশের অক্ষর-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬। সেজন্য মধ্যযুগে, যখন শব্দান্ত '-অ' উচ্চারিত হইত ও পয়ার-জাতীয় ছন্দ-পংক্তিতে অক্ষর- ও মাত্রা-সংখ্যায় সমতা থাকিত, সে সময় পয়ার '-অ' জাতীয় ছন্দকে অক্ষরছন্দ বলা চলিত। কিন্তু এখন

পয়ার-জাতীয় ছন্দে অক্ষরে ও মাত্রায় সংখ্যা-সমতা রক্ষিত হইতে পারে না। সেজন্য পয়ার-জাতীয় ছন্দকে এখন আর অক্ষরছন্দ বলা চলে না। উড়িয়া ভাষায় এখনও শব্দান্ত '-অ' উচ্চারিত হয়। সেজন্য উড়িষ্যার পয়ার-জাতীয় ছন্দ এখনও আক্ষরিক ছন্দ। যেমন, নীচের পংক্তি দুইটি ১৪টি লঘু অক্ষর দ্বারা গঠিত ১৪ মাত্রার পয়ার-জাতীয় ছন্দ:

রামায়ণ্অ পুণ্যকথা অম্রৃত সমান্অ।
ফকির্অ মোহন্অ বোলে পঢ়ি হুয়া ধন্য॥

ফকিরমোহন সেনাপতির উড়িয়া 'রামায়ণ' ১৮৯৫ সালে রচিত।

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য—প্রাকৃত যুগের মাত্রাছন্দ আদি বাংলা যুগে আসিয়া দ্বিধা-বিভক্ত হয়। ইহার এক ধারা পুরাতন মাত্রাছন্দের আদর্শ অনুসরণ করিতে থাকে। সেজন্য আমরা তাহার নাম দিয়াছি শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ। এই ছন্দের উচ্চারণ অনেকটা তৎসম-ধর্মী। এই যুগে প্রাকৃত ছন্দের মূল ধারা হইতে এক নূতন ধারা উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে মধ্য বাংলার প্রধান ছন্দ-প্রবাহে পরিণত হয়। ইহাই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ। এই ছন্দের গতি খুব সহজ ও স্বাভাবিক। ইহাকে বাংলার নিজস্ব ছন্দ বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহা বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই জন্যই বাংলা উচ্চারণে কোন মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিলে তাহা এই ছন্দকেও প্রভাবিত করে। বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণের সহিত এই ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আমরা এবার আলোচনা করিব। আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলা উচ্চারণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাক—(১) শব্দ-গত উচ্চারণ, (২) বাক্য-গত উচ্চারণ।

আমাদের শব্দ-গত উচ্চারণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল আদি শ্বাসাঘাত। এই শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যে আমরা শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনির (অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের) দ্রুত উচ্চারণ করি। এই মাত্রা-

সঙ্কোচন বা দীর্ঘ ধ্বনির হ্রস্বী-করণ বাংলা উচ্চারণের একটি বৈশিষ্ট্য। ইহাকেই পয়ার-জাতীয় ছন্দের 'শোষণ-শক্তি' বলা হইয়াছে। যেমন,

পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে | পতনে উত্থানে ॥

এই পংক্তিতে 'পুণ্য' শব্দের (দুঃখে, উত্থানে—এই দুইটি শব্দেরও) সঙ্কোচন-মূলক খাঁটি বাংলা উচ্চারণ করা হইতেছে। সেজন্য ইহা খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের একটি পংক্তি। কিন্তু,

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও

বা

পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য

—এই দুই পংক্তিতে 'পুণ্য' শব্দের সম্প্রসারিত বা, তৎসম উচ্চারণ করা হয়। সুতরাং পংক্তি দুইটি শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে রচিত।

শব্দ-মধ্য যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর সম্বন্ধেও এই একই কথা :

এঁকি 'কৌতুক' নিত্য নূতন

ওগো 'কৌতুক'-ময়ী

—এখানে 'কৌতুকের' 'কৌ' সম্প্রসারিত। কিন্তু,

হাসিয়া ভাসায়ে দিল লীলাচ্ছন্দে,

'কৌতুকে' ধরণী বেঁধে নিল বুকে,

এখানে 'কৌ' দ্রুত উচ্চারিত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দেও মাঝে মাঝে শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনির সম্প্রসারিত প্রয়োগ পাওয়া যায়। মধ্য যুগের কাব্যে ইহা সুলভ, এবং আধুনিক বাংলা কাব্যে এইরূপ প্রয়োগ একেবারেই নাই, একথা বলা চলে না। এই তৎসম-উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণের পক্ষে স্বাভাবিক না হইলেও, বাংলা কবিতায় ইহা স্বাভাবিক, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাই এই সকল স্থলে বাংলা উচ্চারণের ব্যতিক্রম হয়, এই পর্যন্ত, কিন্তু ছন্দ-পতন হয় না। রবীন্দ্র-নাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে যৌগিক ধ্বনির সঙ্কোচন ও

ও সম্প্রসারণ, এই উভয় রীতিই পাওয়া যায়। এইরূপ মিশ্র-প্রয়োগ সত্ত্বেও কবিতাটি রূপে রসে অনবদ্য। আবার শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দেও যৌগিক ধ্বনির মাত্রা-সঙ্কোচন পাওয়া যায়। পূর্বে মধ্যযুগের সাহিত্য হইতে যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যেও এইরূপ রীতি-মিশ্রণ পাওয়া যাইবে। এইরূপ রীতি-মিশ্রণ সে-যুগের কবিগণ দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না। যে-সকল কবিতায় শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই আমরা শুদ্ধ-প্রাকৃতের শ্রেণী-ভুক্ত করিয়াছি। আবার, যেখানে শব্দ মধ্য যৌগিক ধ্বনির সঙ্কোচনের দিকেই ঝোঁক বেশী, সেই সকল কবিতার ছন্দ ভঙ্গ-প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক বিদগ্ধ সমাজে এই রীতি-মিশ্রণ সমর্থন পায় নাই। এবং এইরূপ মিশ্র-ছন্দ অপেক্ষা অমিশ্র ছন্দই যে উৎকৃষ্ট ও শ্রুতি-মধুর সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। মধ্য যুগের অনেক কবিতায় শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনিকে সমান প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। অথবা যৌগিক ধ্বনির সঙ্কোচন-মূলক উচ্চারণ সত্ত্বেও ছন্দে যতি-প্রাধান্য পাওয়া যায়। ঐ শ্রেণীর ছন্দকে 'মিশ্র-প্রাকৃত ছন্দ' বলিতে হইবে।

বাংলা উচ্চারণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মাত্রা-সঙ্কোচন। ইহা বাংলা ছন্দকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। বাংলা চলিত উচ্চারণের আর একটি বৈশিষ্ট্য অক্ষর-সঙ্কোচন। দুই অক্ষরের শব্দ হইলে এক অক্ষরে এবং শব্দে দুইয়ের অধিক অক্ষর থাকিলে অক্ষর-সংখ্যা হ্রাস করিয়া ক্রমে দুই অক্ষরে শব্দটি উচ্চারণ করার চেষ্টা—ইহা বাংলার শব্দ-গত উচ্চারণের একটি প্রধান কথা। ইহার ফলে অনেক সময় শব্দের শেষ দিক হইতে অক্ষরের আশ্রয়-স্বরটি লুপ্ত করিয়া অক্ষর-সংখ্যা কমানো হয়। শব্দান্ত অ-কারের লোপই এখন প্রধানতঃ চোখে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, অন্ত্য অ-কার লুপ্ত

হইয়া যে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর উৎপন্ন হয়, বাংলা উচ্চারণে তাহা দীর্ঘ। যেমন, তল্, তাল্, তিল্, তুল্, তেল্, তৈল্, তৌল্। ইহাদের সঙ্কোচন-মূলক উচ্চারণ বাংলায় অস্বাভাবিক। সেজন্য ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, অ-কারের লোপ-জনিত শব্দান্ত (কোন-কোন সময় শব্দ-মধ্য) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর এই ছন্দে সাধারণতঃ সম্প্রসারিত। দৃষ্টান্ত অতি সুলভ। একটি উদাহরণ,

•- •- - ‿ • •• -
এখ ন শীতের দি ন শা ন্ত নদী নদ,
○ - ‿ - •• • - • -
অনেক যা ত্রীর মেলা, পথের বিপদ্
•• -
কিছু নাই ;

এই প্রসঙ্গে শব্দান্ত স্বাভাবিক যৌগিক অক্ষর সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক ; যেমন মহৎ, জগৎ, মহান, পাই, নাই, ইত্যাদি। ইহারাও বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ। সেজন্য আধুনিক বাংলা কবিতায় এবং আধুনিক ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে, এই শ্রেণীর অক্ষর সাধারণতঃ সম্প্রসারিত। দৃষ্টান্ত,

(১) সে বি চি ত্র সে বৃহৎ
•○ - • • ‿ •• ‿ •• -
খেলাঘর হ'তে মি শ্রিত ম র্মরবৎ
• • • • - ○○
শুনিবারে পাই যেন ;
• - ‿ - ‿○ ‿ •○○ ‿• ‿ •○•
(২) ব'ণীর বি দ্যুৎ- দী প্ত চ ক্ষোবাণ বি দ্ধ বা ল্মীকিরে

এখন বাংলা বাক্য-গত উচ্চারণ কি ভাবে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক। চলিত বাংলার বাক্য-গত উচ্চারণে প্রতি শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ে না। তখন একটি

বাক্যকে কয়েকটি অর্থ-বোধক অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং এইরূপ প্রত্যেক অংশে একটি করিয়া শ্বাসাঘাত ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট শব্দ স্বকীয় শ্বাসাঘাত দ্বারা উচ্চারিত হয়। যেমন,

সব সময় মনে রাখবে, পরের উপকার করা, পরম ধর্ম

এইরূপ বাক্য-গত উচ্চারণ ভঙ্গ প্রাকৃত ছন্দেও অনুসরণ করা হয়। ইহার ফলে এই ছন্দে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ, ইংরেজী কবিতায় প্রতিটি প্রধান শব্দ শ্বাসাঘাতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয় বলিয়া ইংরেজী ছন্দের চরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পবে (foot) বিভক্ত। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে একটি প্রধান শ্বাসাঘাত একটি গোটা বাক্যাংশকে আয়ত্তে রাখিতে পারে। সেজন্য ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের পর্ব সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। আট ও দশ মাত্রার পর্বই এই ছন্দের পক্ষে উপযুক্ত। শক্তিশালী কবিদের যে-সকল রচনায় ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ চূড়ান্ত উৎকর্ষ ও রমণীয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাদের সবগুলিই প্রায় আট বা দশ মাত্রার পর্বে রচিত। বাংলা গদ্য বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে অধিকাংশ ছেদ-পর্ব ১০ মাত্রায় গঠিত। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীর বাক্য-গত উচ্চারণের ন্যায় এই ছন্দও ছেদ-অনুসারী। দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে ছেদ ও যতির মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে কবিতার প্যাটার্ণ যতিকেই অনুসরণ করে। কিন্তু এই ছন্দে পংক্তির অর্থ-বিভাগ ও যতি-বিভাগ এক হইলেই ভাল শুনায়। ছেদ ও যতিতে বিরোধ উপস্থিত হইলে পাঠক যাহাতে ছেদকেই প্রাধান্য দিয়া পর্ব-বিভাগ করিতে পারেন, সেদিকে কবির দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ছেদ-অনুসারী বলিয়া ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দই যতির বন্ধন অপসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে অমিত্র ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ ও গদ্য-ছন্দে পরিণত হইয়াছে।

বাংলা উচ্চারণের দ্বি-মাত্রিক প্রয়াসের কথা ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন। এই দ্বিমাত্রিকতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বাংলা উচ্চারণের যুগ্ম-মাত্রিক চলন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, দুইয়ের অধিক অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দ গুলিকে আমরা দুই মাত্রার এক একটি গুচ্ছে বিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করি। বিযোড় মাত্রার গুচ্ছ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের পক্ষে অনুপযুক্ত। সেই জন্য আমরা লিখি 'দ্বি-মাত্রিকতা', কিন্তু শব্দটিকে উচ্চারণ করি 'দ্বিমা ত্রিক তা-'। ''আমাদেরো'—এই শব্দটিকে 'আ মাদেরো', অথবা 'আমাদে রো'—এই ভাবে বিযোড় গুচ্ছে উচ্চারণ করিলে ভাল শুনায় না। আমরা বলি 'আমা দেরো'। সেইরূপ 'সম ভি- ব্যাহা রে,' 'গাৎগো বিন্দো', 'গীতঅ গোাবন্ দো-', 'অন বর ত-' 'একলা,' 'একা কী-', 'কাঙ্গা-লী', 'কাঙাল্ পনা', 'বাচাল্', 'বাচা লতা', ইত্যাদি। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ বাংলা উচ্চারণের অনুগামী বলিয়া ইহাতে যুগ্ম-মাত্রিক পর্বই ব্যবহৃত হয়। বিযোড়-মাত্রিক পর্ব এই ছন্দে স্বাভাবিক শুনায় না। সেজন্য মধুসূদনের

বীরবাহু | চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, | কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিনী |

—এই পংক্তিতে বিযোড় মাত্রায় যতি-পতন হওয়ায় 'অকালে' যতি-পতন হইয়াছে, বলা হয়। মধুসূদনের 'মেঘদূত' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতাতে এক স্থলে সাত মাত্রায় ছেদ পড়ায় ছন্দের সাবলীলতা নষ্ট হইয়াছে। তুলনীয় :

তব পদ তলে সে, কা পড়ে কি হে মনে ?

লালমোহন বিদ্যানিধি অক্ষরছন্দে পঞ্চাক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বের কথা বলিয়াছেন। যেমন,

পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি, নাম 'পংক্তি'। দৃষ্টান্ত :

(১) ধর বচন | কর রচন
(২) যত কৌরব | হত গৌরব

সপ্তাক্ষরা বৃত্তি ; নাম 'মধুমতী'। দৃষ্টান্ত :

তৃতীয়ে যতি রবে | তুরীয়ে নাহি হবে ।
সপ্তটি বর্ণ পদে | এ মধুমতী ভাবে ॥

পয়ারে সপ্তাক্ষর গণের কথাও তিনি বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত :

কান্দে রাণী মেনকা | চক্ষুর জলে ভাসে ।
নখে নখ বাজায়ে | নারদ মুনি হাসে ॥

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের মাত্রা-সঙ্কোচন এই দৃষ্টান্তগুলিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভঙ্গ-প্রাকৃতের সহজ স্বাভাবিক যুগ্ম-মাত্রিক গতি এই সকল ছন্দে নাই। পংক্তিগুলি যতি-প্রধান, সেজন্য পর্ব-বিভাগ সুস্পষ্ট, তালের 'সম' খুঁজিতে হয় না। এই গঠন-কাঠিন্য বা 'পগু-পগু'-ভাব ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দেই সুলভ। সুতরাং উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে শুদ্ধ- ও ভঙ্গ-প্রাকৃত পদ্ধতির সংমিশ্রণ হইয়াছে, বলা চলে। আমাদের মতে পংক্তিগুলি মিশ্র-প্রাকৃত ছন্দে রচিত। শুদ্ধ-প্রাকৃতের 'যতি-প্রাধান্য' ও ভঙ্গ-প্রাকৃতের 'মাত্রা-সঙ্কোচন' মিশাইয়া পংক্তিগুলি রচিত হইয়াছে।

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ ও সাধু ভাষা—ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ চলিত উচ্চারণ অনুসরণ করিলেও ইহাতে চলিত ভাষার ব্যবহার নাই। দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে চলিত ভাষার প্রয়োগ স্বাভাবিক। সে দিক্ দিয়া ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ প্রাচীনতা-গন্ধী। ইহা সাধু ভাষার ছন্দ। কিন্তু এই ছন্দের গঠনের সহিত কথ্য ভাষার কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। দেশজ ছন্দ প্রাচীন বাংলাতেও কথ্য-ভাষার ছন্দ। এখনও এই ছন্দে কথ্য-ভাষার প্রচলন খুব বেশী। পয়ার-জাতীয় ছন্দ প্রাচীন কাল হইতেই সাহিত্যের ছন্দ। তাই সাহিত্যের ভাষাই ইহাতে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সেদিন পর্যন্ত এক মাত্র সাধু ভাষাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া মর্যাদা পাইত। এই ছন্দেও তাই সাধু ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতায় এবং

অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও রামনিধি গুপ্ত ও অন্যান্য কবিদের গানে বহু স্থলে পয়ার জাতীয় ছন্দে অল্প-বিস্তর কথ্য ভাষার প্রয়োগ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের কাব্যেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং আগা-গোড়া কথ্য ভাষায় ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ রচিত হইলে তাহার উৎকর্ষের হানি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইহাকে কি বর্ণছন্দ বলা চলে?—ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে অক্ষর-গত সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। তোর্, মোর্—এই জাতীয় ব্যঞ্জনান্ত শব্দ এক অক্ষর, কিন্তু দুই মাত্রা, এবং ইহারা দুইটি বর্ণে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে সেজন্য এই ছন্দে বর্ণ-সংখ্যা ও মাত্রা-সংখ্যায় প্রায় ক্ষেত্রেই সমত পাওয়া যাইবে। এই জন্যই প্রাচীন কালে হরফ (=বর্ণ) গুণিয়া এই ছন্দের গঠন নির্ণয় করা হইত। বর্ণ ও অক্ষর সংস্কৃতে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে বাংলাতেও ইহাদের একার্থক মনে করা হইত, এবং এই শ্রেণীর ছন্দ অক্ষর-ছন্দ বা বর্ণ-ছন্দ নামে অভিহিত হইত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে এবং হিন্দী ছন্দ-শাস্ত্রেও অক্ষর-ছন্দ অর্থে বর্ণ-ছন্দ নামটির প্রচলন পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন বাংলায় অক্ষর (syllable) ও বর্ণ (letter) বিভিন্ন পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতে চাই। এই সকল কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

এখন, এই ছন্দে মোটের উপর বর্ণ-সাম্য অর্থাৎ হরফগুলির সংখ্যার সমতা থাকে বলিয়া ইহাকে বর্ণ-ছন্দ বলা যায় কিনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বর্ণ ধ্বনির বহিরঙ্গ রূপ। ভাষা-ভেদে এবং রুচি-ভেদে ইহার পরিবর্তন হইতে পারে। সেজন্য হরফ গুণিয়া ছন্দের গঠন নির্ণয় করিতে যাওয়া, আমাদের মতে, নিরাপদ নহে।

'আজো' আছে বৃন্দাবন মানবের মনে

—ইহার প্রথম অংশ 'আজও (অর্থাৎ আজ্‌ও) আছে'—এই ভাবে

লিখিলে হরফের হিসাবে গরমিল হইয়া যাইবে, কিন্তু ছন্দ-পতন হইবে না। সেইরূপ,

'আমারও' হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব।
(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

হরফ গুণিয়া দেখিলে এই উদাহরণের প্রথম অংশে ৮-এর পরিবর্তে ৯টি হরফ পাওয়া যাইবে। 'আমারো' লিখিলে অবশ্য বর্ণ-সংখ্যা সমান থাকিত। আরও বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, হরফ গুণিয়া এই ছন্দের গঠন নির্ণয় করিলে হিসাবে প্রায়ই গরমিল হইবার সম্ভাবনা। তবে মোটের উপর এই ছন্দে বর্ণ-সাম্য পাওয়া যায়, একথা সত্য।

আলোচনা-সংক্ষেপ—ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে-সকল কথা আলোচনা করা হইল, তাহা সংক্ষেপে এই :

(১) এই ছন্দ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসরণ করে।

(২) এই ছন্দ গদ্য-ধর্মী : সেজন্য পদ্যের অস্বাভাবিকতা ইহাতে যত অল্প থাকে, এই ছন্দের উৎকর্ষ তত বেশী বৃদ্ধি পায়।

(৩) এই ছন্দে স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত দিয়াই পর্বের ঝোঁক সৃষ্টি করা হয়। শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে পর্বের ঝোঁক বাংলার স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত অপেক্ষা প্রবল ; এবং দেশজ ছন্দে এই ঝোঁক এত প্রবল যে তাহাকে আর শ্বাসাঘাত বলা চলে না। আমরা তাহার নাম দিয়াছি পর্বাঘাত বা তাল। এই তিন রীতির ছন্দে ঝোঁকের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয় :

(ক) তরু নানা জাতি / লতা নানা ভাতি /
ফলে ফুলে বিকশিত।

(খ) যত পায় বেত // না পায় বেতন /
তবু না চেতন মানে // /

(গ) রাত পোহালো | ফরসা হোলো |
ফুটল কত ফুল। | |

(৪) এই ছন্দের পর্ব ছেদ-প্রধান ; সেজন্য ইহাতে প্রবহমাণতা সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ছেদ-প্রাধান্যের জন্য অসম-পর্ব এই ছন্দে খুব স্বাভাবিক। দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের গঠন-কাঠিন্য না থাকায় এই ছন্দ হইতেই অমিত্র ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ ও গদ্য-ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

(৫) এই ছন্দে শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনির সঙ্কোচন হইতে দেখা যায়।

(৬) 'অ' বা অন্য স্বরধ্বনির লোপ-জনিত শব্দান্ত (কোন কোন সময় শব্দ-মধ্য) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর এই ছন্দে সাধারণতঃ সম্প্রসারিত।

(৭) শব্দান্ত স্বাভাবিক যৌগিক অক্ষরও এই ছন্দে প্রায়শঃ সম্প্রসারিত।

(৮) এই ছন্দের পর্ব সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ৬, ৮ ও ১০ মাত্রার পর্ব এই ছন্দের প্রধান উপাদান।

(৯) বিযোড় মাত্রার পর্ব এই ছন্দের পক্ষে অনুপযুক্ত।

(১০) ইহাকে সাধু ভাষার ছন্দ বলা হয়, কারণ ইহাতে সাধু ভাষাই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১১) এই ছন্দে মোটের উপর বর্ণ বা হরফের সংখ্যার সহিত মাত্রা-সংখ্যার মিল পাওয়া যায়।

(১২) সঙ্গীতের পরিভাষায় দেশজ ছন্দ দ্রুত চালের, শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ মধ্য চালের এবং ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ ঢিমা চালের ছন্দ।

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের গঠন—শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ যতি-প্রধান, সেজন্য যতি-বিভক্ত পর্বের ভিত্তিতেই ঐ ছন্দের গঠন বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে শুদ্ধ-প্রাকৃতের পর্ব-বৈচিত্র্য নাই। তাহা ছাড়া, অসম পর্বিকতা এই ছন্দে এতই সুলভ যে পর্বের ভিত্তিতে এই ছন্দের গঠন বিশ্লেষণ করিয়া কোন লাভও নাই। সেজন্য পংক্তির গঠন বিশ্লেষণ করিয়া এই ছন্দের গঠন-বৈচিত্র্য দেখান হইবে। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ সাধারণতঃ দ্বিপদী (বা দ্বিপর্বিক), ত্রিপদী ও চৌপদী চরণে রচিত হয়।

দ্বিপদী বা দ্বি-পর্বিক চরণের বিভিন্ন ছন্দ—

(ক) পয়ার ছন্দ—৮+৬=১৪ মাত্রা

পয়ার বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ছন্দ। ইহার উৎপত্তির কথা আমরা পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। পাদাকুলক ছন্দ হইতে পয়ার ('পদাকার') উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই প্রচলিত মত। পিঙ্গল-ছন্দ-সূত্রে এবং প্রাকৃত পৈঙ্গলে পাদাকুলককে অবদ্ধাক্ষর মাত্রাছন্দ বলা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দী কবি ভিখারী দাসের 'ছন্দোর্ণব-পিঙ্গলে' দেখিতে পাই

একৈ তুক সোরহ কলনি, পায়কুলক গুরু অন্ত।

অর্থাৎ, একটি মাত্র মিল (চরণ-শেষে), ষোল কলা (মাত্রা), এবং অন্তে গুরু অক্ষর—ইহাই পাদাকুলকের লক্ষণ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, অপভ্রংশ যুগের এই অবদ্ধাক্ষর ছন্দটি নব-আর্য যুগে অন্ত-গুরু লঘু-প্রধান ছন্দে পরিণত হইয়াছিল। জয়দেবের কাব্যে এই জাতীয় ষোড়শ লঘু মাত্রিক পংক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন,

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।

ইহার সহিত তুলনীয় হিন্দী পাদাকুলক(বা চৌপাঈ)

নৃপহি বচন প্রিয় | নহি প্রিয় প্রাণা। (তুলসীদাস)

এবং বাংলা পয়ার—

অন্নপূর্ণা উত্তরিল | গাঙ্গনীর তীরে।

প্রাকৃত পৈঙ্গলে আরও কয়েক প্রকার ষোড়শ-মাত্রিক অপভ্রংশ ছন্দ পাওয়া যায়। যেমন, পজ্ঝটিকা—ইহা মধ্যগুরু; অলিল্লহ—ইহা অন্তলঘু। সে যাহা হউক, অন্তগুরু লঘু-প্রধান পাদাকুলক ছন্দ হইতেই পয়ার উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত :

(১) গোকুল নগর মাঝে | বসো চিরকাল।
আন্ধা ভাল করি জানে | সকল গোয়াল ॥
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

(২) রাজ-আভরণ পরে | সুগ্রীব সকল।
রামের ভূষণ জটা | পরণে বাকল ॥
অপূর্ব খাটেতে শয্যা | সুগ্রীব শয়ন।
ভূলাতে রামের শয্যা | শোকে অচেতন ॥
(কৃত্তিবাস)

(৩) হেথায় সুমেরু-শৈল | ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে | হ'য়ে সুসজ্জিত,
চলিলা কৈলাস ধামে | নিয়তি আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা | উমা, উমাপতি।
(হেমচন্দ্র)

(৪) মরিতে চাহিনা আমি | সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই |
এই সূর্য করে | এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে | যেন স্থান পাই।
(রবীন্দ্রনাথ)

পয়ারের গঠন অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দও রচিত হইতে পারে। যেমন,

// //
আমাদের ছোট নদী | চলে বাঁকে বাঁকে। ৮+৬=১৪
বৈশাখ মাসে তার | হাঁটু-জল থাকে ॥

পয়ার ছন্দ দুই পংক্তির যুগ্মক দ্বারা গঠিত। অনেক সময় পয়ার ছন্দে যুগ্মকের বন্ধন থাকে না, এবং ৮+৬-এর যতি-বিভাগের পরিবর্তে ছেদ অনুসারে অসম মাত্রিক পর্ব গঠন করা হয়। এই শ্রেণীর ছন্দে এক পংক্তির শেষ অংশ ও পরবর্তী পংক্তির প্রথম অংশ যুক্ত করিয়া এক একটি পর্ব গঠন করিতে দেখা যায়। ইহা প্রবহমাণ পয়ার। এই ছন্দ দুই প্রকার, অমিল প্রবহমাণ ও সমিল প্রবহমাণ। মধুসূদনই প্রথম প্রবহমাণ পয়ার রচনা করেন। তাঁহার অমিত্র বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রকৃত পক্ষে অমিল প্রবহমাণ পয়ার। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবহমাণ পয়ারকে মিলের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমিল প্রবহমাণ পয়ার সৃষ্টি করেন।

অমিল প্রবহমাণ পয়ার :

বিস্ময় মানিয়া হনু | ভাবে মনে মনে |
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি | উত্তরিনু যবে
লঙ্কাপুরে | ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে |,
প্রচণ্ড | খর্পরখণ্ডা | হাতে মুণ্ডমালা" |

সমিল প্রবহমাণ পয়ার :

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, | লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ; | প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে |
ভদ্রবেশী বর্বরতা | উঠিয়াছে জাগি |
পঙ্ক-শয্যা হ'তে |

পয়ার পংক্তিতে দুইটি বা তিনটি শব্দান্ত মিল ব্যবহার করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। পয়ার চরণে চার, আট ও বার মাত্রার

পরে মিল ব্যবহৃত হইলে তাহা হইবে 'মালঝাঁপ' ছন্দ। এবং শুধু চার ও আট মাত্রায় মিল ব্যবহার করিলে তাহাকে বলা হয় 'তরল পয়ার'।

দৃষ্টান্ত—

মালঝাঁপ ছন্দ :

ঢুকে তাল আঁখি লাল কি করাল মূর্তি।
মহাকায় ভবিপায় যেন পায় স্ফূর্তি॥
চলে যায় পদ ঘায় বসুধায় কম্প
প্রভু ধায় ঠায় ঠায় মেরে যায় লম্ফ (রঙ্গলাল)

মালঝাঁপকে পয়ার গোষ্ঠীর ছন্দ বলা হইবে কি না বিবেচ্য। চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্যের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

তরল পয়ার ছন্দ :

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম-পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
(কৃত্তিবাস)

(খ) দীর্ঘ পয়ার—৮ + ১০ = ১৮ মাত্রা

(১) ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি | প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ
জগৎ আপনা দিয়ে | খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
(রবীন্দ্রনাথ)

(২) সেই কথা জাগে মনে | তবু তায় পারি না ভুলিতে,
প্রেম সে চপল বটে | এ জীবন আরও যে চপল।
(মোহিতলাল)

(৩) সে গৌরব পুনর্বার | অন্তরের অনলে দহিয়া
রচিব ভারতবর্ষে | মানবের স্বপ্নের অমরা।
(হুমায়ুন কবীর)

দীর্ঘ পয়ার ৮ + ১০ = ১৮ মাত্রার চরণে গঠিত ছন্দ। পয়ার পংক্তির শেষ পর্বটি প্রথম পর্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু দীর্ঘ পয়ারের শেষ পর্বটি প্রথম পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ। সেজন্য পয়ার অপেক্ষা দীর্ঘ পয়ার অধিক গুরু-গম্ভীর। এই ছন্দ আবেগ-মূলক বর্ণনা ভঙ্গীর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। প্রবহমাণ দীর্ঘ পয়ার ছন্দও আধুনিক সাহিত্যে সুলভ। রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে"-কবিতাটি প্রবহমান দীর্ঘ পয়ার ছন্দের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

(গ) একাবলী

পূর্বে একাবলী নামে এক প্রকার ছন্দ বিশেষ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ছান্দসিকগণের মতে ইহা তিন প্রকার, ১১, ১২ ও ১৩ 'অক্ষরের'। কিন্তু এই সকল ছন্দে পর্বের ইউনিট যে অক্ষর নহে, মাত্রা—সেকথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এই তিন শ্রেণীর ছন্দের মধ্যে ১১ মাত্রার একাবলীই খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

১১ মাত্রার একাবলী ছন্দ পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জন-প্রিয় ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস হইতে রঙ্গলাল ও প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত সমস্ত কবিই প্রায় এই ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন।

১১ মাত্রার 'একাবলী' [৬ + ৫]

বড়োর পিরীতি | বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি | ক্ষণেকে চাঁদ॥ (ভারতচন্দ্র)

প্রমথ চৌধুরী এই পুরাতন একাবলী ছন্দে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছেন। তুলনীয়:

ভাল তোমা বাসি | যখন বলি
তোমায় দলি,
প্রেমের কলি,
মরমে আমার | সরমে ভয়ে
ফোটে না রক্ত | কমল হ'য়ে।

একাবলী ছন্দের প্রতি পর্বে যে-ঝোঁক পড়িতেছে, তাহা ভঙ্গ-প্রাকৃতের স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত অপেক্ষা প্রবল, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, যতি-বিভাগগুলি খুব স্পষ্ট ও চরণে নৃত্য ছন্দের আমেজ পাওয়া যাইতেছে। সেজন্য ইহাকে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ না বলিয়া শুদ্ধ-প্রাকৃত অথবা মিশ্র-প্রাকৃত ছন্দ বলাই অধিক যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়।

১২ মাত্রার 'একাবলী' [৬+৬]

(১) দিবানিশি পোড়া | পেটের লাগিয়া
কি না করিতেছি | ঘুরিয়া ঘুরিয়া ॥ (লালমোহন

(২) প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি।
অনাথ পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ নিনাদে (রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের শেষ পংক্তি ৬+৯=১৫ মাত্রার 'অতিচরণ'।

১৩ মাত্রার 'একাবলী' [৫+৭]

অয়ি সুবদনি | কেন রহ গরবে !
এনব যৌবন | কদিন বল রবে

একাদশ-মাত্রিক একাবলীকে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের গোষ্ঠী-ভুক্ত করিতে যে-সকল বাধার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, ঐ সকল বাধা ত্রয়োদশ-মাত্রিক একাবলী ছন্দ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

৮+৫=১৩ মাত্রার আর এক প্রকার দ্বিপদী ছন্দ বাংলায় পাওয়া যায়। গত শতকের ছান্দসিকগণ ইহাকে 'ত্রয়োদশ-অক্ষরা' চণ্ডী ছন্দের অনুসৃতি বলিয়া মনে করিতেন। দৃষ্টান্ত :

(১) কি গুণ কি হিত বল | মাদক পানে।
বুধগণ বহুবিধ | দোষই জানে॥
ক্ষয় হয় ধন তনু | জীবন তাহে।
স্বজন অপর জন | না মুখ চাহে॥

"

(২) গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি | নাহি ভরসা ;

এই ছন্দেও পর্ব-বিভাগ ও শ্বাসাঘাত যেরূপ স্পষ্ট তাহাতে ইহাকেও খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ বলা চলে না।

ত্রিপর্বিক চরণ—ত্রিপদী ছন্দে ছয় মাত্রার পর্ব প্রধান হইলে তাহাকে 'লঘু ত্রিপদী' এবং আট মাত্রার পর্ব প্রধান হইলে তাহাকে 'দীর্ঘ ত্রিপদী' বলা হয়।

লঘু ত্রিপদী—

ষণ্মাত্র-পর্বিক ত্রিপদী ছন্দ অপভ্রংশ হীর ছন্দ বা ঐ জাতীয় ষণ্মাত্র-যতিক কোন ছন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই ছন্দের বিশেষ প্রচলন ছিল ঃ

(১) ঘৃত দধি দুধে পসার সাজায়া
পিন্ধিলো পাটের সাড়ী।
থোম্পাত উপর গুঞ্জরে ভ্রমর
তাহাত কান্ডের ধাড়ী॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

(২) ভ্রমরা ভ্রমর তোরে জুড়ি কর
না গাও মধুর গীত।
তোর মধু বায় কামশরে তায়
চিত্ত হয় চমকিত॥

(মুকুন্দরাম)

(৩) আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা-তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥

(বংশীবদন)

(৪) ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

(চণ্ডীদাস)

(৫) কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরাগণের বাস॥

(ভারতচন্দ্র)

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে লঘু ত্রিপদী ছন্দ তাদৃশ সমাদর লাভ করে নাই। লক্ষ্য করিলে এই ছন্দে এক প্রকার গতি-চাঞ্চল্য পাওয়া যাইবে। এই গতি-চাঞ্চল্য ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের পক্ষে ব্যভিচারী। সেজন্য লঘু ত্রিপদী কোন দিনই খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে পরিণত হইতে পারে নাই। দীর্ঘ ত্রিপদী বা ঐ জাতীয় অন্যান্য দীর্ঘ ছন্দ অপভ্রংশ-মর্যাদা ভুলিয়া গিয়া বাংলা ছন্দের মধ্যেই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু লঘু ত্রিপদী তাহা পারে নাই। এই ছন্দে মাত্রা-সঙ্কোচন পদ্ধতি অনুকরণ করা হইয়াছে, ও শুদ্ধ প্রাকৃত-সুলভ প্রবল শ্বাসাঘাতের পরিবর্তে স্বাভাবিক শ্বাসাঘাতের সাহায্যে আবৃত্তি করিয়া ইহার গীতি-ধর্মিতা হ্রাস করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি এই ছন্দে ভঙ্গ-প্রাকৃতের স্বাভাবিকতা পুরাপুরি আনয়ন করা সম্ভব হয় নাই। শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের ন্যায় প্রবল শ্বাসাঘাতের সাহায্যেও এই ছন্দ আবৃত্তি করা যায়। যেমন,

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।

—এইভাবে আবৃত্তি করিলে বর্ণমাত্রিক শুদ্ধ-প্রাকৃতের সহিত ইহার সাধর্ম্য বুঝিতে পারা যায়। তুলনীয়—

ফুলের মতন চেহারা যেমন
নির্বোধ অতি ঘোর।

কিন্তু খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ এইরূপ প্রবল শ্বাসাঘাতের সাহায্যে পাঠ করিলে অস্বাভাবিক শুনাইবে :

এ কথা জানিতে তুমি | ভারত-ঈশ্বর শাজা- | -হান

কবিতাটি এই ভাবে আবৃত্তি করার কথা কল্পনা করা যায় না।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, লঘু ত্রিপদী বর্ণমাত্রিক ব্রজবুলি ছন্দের মাত্রা সম্প্রসারণ হারাইয়াছে, কিন্তু ভঙ্গ প্রাকৃতের মাত্রা-সঙ্কোচন গ্রহণ করিয়াও ইহা খাঁটি ভঙ্গ প্রাকৃতে পরিণত হইতে পারে নাই। লঘু ত্রিপদী শুদ্ধ প্রাকৃত ও ভঙ্গ-প্রাকৃতের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই ছন্দের পরিবর্তে বর্ণমাত্রিক 'শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের প্রচলন খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ—জয়দেব তাঁহার কাব্যে এক শ্রেণীর অষ্টাবিংশ মাত্রিক ছন্দ খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে। জয়দেবের পূর্বেও অপভ্রংশ সাহিত্যে এই ছন্দের প্রচলন ছিল। এই শ্রেণীর ছন্দ হইতেই ভঙ্গ-প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ছন্দের গঠনে নিম্নলিখিত স্তরগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :

জয়দেবী অপভ্রংশ ছন্দের দৃষ্টান্ত—[১৬ + ১২ = ২৮]

রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্‌॥

চর্যাপদে এই ছন্দ—

ভুসুক ভণই কট রাউতু ভণই কট
সঅলা এহ সভাবা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই ছন্দ—

সুণহ আইহন দাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ।
বাঁশী গুটি দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ
বাঁশী পাইলে সুখে ঘর জাইএ ॥

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে এই ছন্দ—

চরণে ধরিয়া হরে, কুমার মিনতি করে,
অপরাধ ক্ষম কৃপাময়।
কবিলাম লঘু পাপ, দিলা নিদারুণ শাপ,
ব্যাধ-কুলে জনম নিশ্চয় ॥

[৮+৮+১০=২৬]

ষোড়শ শতকের কবিদের রচনাতেই এই ছন্দের নিখুঁত রূপটি ধরা পড়িয়াছিল। এই দীর্ঘ ছন্দের সহিত বাঙালীর অন্তরের যোগ যে নিবিড় তাহা এই ছন্দের ক্রম-বর্ধমান প্রসার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক সাহিত্য হইতে এই ছন্দের কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা হইল :

(১) বোল না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;

(হেমচন্দ্র)

(২) বীরের নন্দিনী আমি বীরবর মম স্বামী
বীর-প্রসবিনী হব শেষ।
বাহুবলে পুত্রগণ করিবেক সুশাসন
বাড়িবেক পুণ্যের দেশ ॥

(রঙ্গলাল)

(৩) অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্ব চরাচর।
মোরে তুমি হে ভিখারী মার কাছ হ'তে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর॥ (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) আকাশ কালিমা মাখা কুয়াশায় দিক্ ঢাকা
চারিধারে কেবলি পর্বত ; (যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

বাংলা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে এইরূপ পর্ব-সমাবেশ অর্থাৎ ৮+৮+১০=২৬ মাত্রার চরণই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ পর্বটি খণ্ডিত করিয়া এক শ্রেণীর নূতন দীর্ঘ ত্রিপদী সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার পর্ব-সমাবেশ ৮+৮+৬=২২ মাত্রা। যেমন,

(১) জাগায়ে মাধবী বন চ'লে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন ;
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্য দিন॥
(রবীন্দ্রনাথ, অশেষ)

(২) হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি
পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে
মালয় সাগরে।
(জীবানন্দ দাশ, "বনলতা সেন")

অসম-পর্বিক ত্রিপদী—দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের মাত্রাদৈর্ঘ্য ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া রচিত কয়েক প্রকার অসম ছন্দ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত—

(১) স্বাধীনতা হীনতায় | কে বাঁচিতে চায় হে |
কে বাঁচিতে চায় (রঙ্গলাল)

৮

এই ছন্দের পর্ব-সমাবেশ ৮+৭+৬। উনিশ শতকের ছন্দ শাস্ত্রে ইহাকে 'বিশাখ পয়ার' বলা হইত।

(২) আমারে যে ডাক দেবে | এ জীবনে তারে বারম্বার |
ফিরেছি ডাকিয়া।

বা

ঈশানের পুঞ্জমেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে |
বাধাবন্ধ-হারা। (রবীন্দ্রনাথ)

[৮+১০+৬]

চতুষ্পদী ছন্দ—ভঙ্গ-প্রাকৃত চতুষ্পদী ছন্দও ষণ্‌মাত্রিক ও অষ্ট মাত্রিক পর্ব অনুসারে দুই প্রকার। ইহাদিগকে যথাক্রমে লঘু চতুষ্পদী ও দীর্ঘ চতুষ্পদী ছন্দ বলা যাইতে পারে।

ষণ্‌মাত্রিক চতুষ্পদী বা লঘু চৌপদী—

চির সুখী জন | ভ্রমে কি কখন | ব্যথিত বেদন |
বুঝিতে পারে |
(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

[৬+৬+৬+৫]

এই ছন্দ পূর্বে 'ললিত' নামে অভিহিত হইত।

অষ্টমাত্রিক চতুষ্পদী বা দীর্ঘ চৌপদী—

তিনটি অষ্টমাত্রিক পর্বের সহিত ৭, ৬ অথবা ৫ মাত্রার একটি পর্ব যুক্ত করিয়া তিন প্রকার দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ রচিত হইতে দেখা যায়। উদাহরণ,

(১) [৮+৮+৮+৭]

ভরদ্বাজ অবতংস | ভূপতি রায়ের বংশ |
সদা ভাবে হত কংস | ভুরসিটে বসতি (ভারতচন্দ্র)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে এই শ্রেণীর চতুষ্পদী ছন্দই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) [৮+৮+৮+৬

তুমি বৃষ ভানু সুতা | অশেষ চাতুরী যুতা।
তোমার ননদী পুতা | সব আমি জানি (ভারতচন্দ্র)

অথবা,

বাকী অর্ধ-ভগ্ন প্রাণ | আবার করিছে দান |
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই | পরশ পাথর

(৩) [৮+৮+৮+৫]

তরিবারে পরিণাম | হর জপে হরি নাম |
হরি ভজে পূর্ণ-কাম | কমলজ রে।

অথবা,

তল তল ছল ছল | কাঁদিবে গভীর জল |
ওই দুটি সুকোমল | চরণ ঘিরে। (রবীন্দ্রনাথ)

একপদী বা এক-পর্বিক চরণ—নিয়মিত ভাবে এক-পর্বিক চরণ দ্বারা রচিত কবিতা প্রাচীন বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায় না। দ্বিপদী, ত্রিপদীর ন্যায় ইহার বহুল প্রচলন নাই। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে এক-পদী চরণ দুই প্রকার—অষ্টমাত্রিক ও দশ মাত্রিক। উদাহরণ.

অষ্ট-মাত্রিক একপদী ছন্দ

(১) বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশী বাজাওঁ গানে॥
না কর তোঁ মন আনে।
(আক্ষে) অসুর-দলন কাহ্নে॥ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

(২) নন্দন কানন কোলে,
ঘুমায় স্বপন ভোলে,
ঘুমায় দেবতা সব!
কলিযুগ অভিনব! (বিহারীলাল)

বিহারীলালের 'সাধের আসন' ও 'সারদামঙ্গল' কাব্য দুইটি একপদী চরণে রচিত; তবে তিনি ইহার সহিত দ্বিপদী পংক্তিও ব্যবহার করিয়াছেন।

দশ-মাত্রিক একপদী বা 'দিগক্ষরা' ছন্দ—

(১) অতি বুঢী না দেখোঁ নয়নে।
জাইতে নারোঁ ত্বরিত গমনে॥
পথ হারাইলো বৃন্দাবনে।
তোহ্মাকে তেজিলোঁ তে কারণে॥ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

(২) আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে,
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল,
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে। (রবীন্দ্রনাথ)

মুক্তক ছন্দ

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের আলোচনা হইতে বুঝা গেল, এই ছন্দ ছেদ-প্রধান, সেজন্য প্যাটার্ণের বন্ধন শিথিল করিয়া প্রবহমাণ ও অসম-পর্বিক পংক্তি-নিচয় রচনা করা এই ছন্দ-গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি। প্রবহমাণ ছন্দে দুই পংক্তি মিলাইয়া ছেদ-মূলক অসম-পর্ব গঠন করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এই ছন্দে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ থাকে না। তথাপি চতুর্দশ ও অষ্টাদশ অক্ষরের পংক্তি-দৈর্ঘ্যের দ্বারা ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে পয়ার ও দীর্ঘ পয়ারের গঠন রক্ষা করা হয়। সেজন্য প্রবহমাণ ছন্দ যতির শাসন অমান্য করিলেও বাহ্যতঃ ইহাকে যতি-নির্ভর ছন্দ বলিয়াই মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ রচিত হইয়াছে। এই ছন্দ কোন কৃত্রিম প্যাটার্ণের অধীন নহে। ইহাতে যতিকে সম্পূর্ণ

উপেক্ষা করিয়া ছেদ অনুসারে পর্ব-গঠন করা হয় এবং এই অর্থ-বিভাগ অনুযায়ীই ছন্দ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ছন্দ যতির বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহাই মুক্তক ছন্দ। প্রতি পংক্তির শেষে এক একটি অর্থ-বিভাগ শেষ না হইলে মুক্তক ছন্দের স্বাভাবিকতা কিছু পরিমাণ ক্ষুণ্ণ হয়। যেমন,

এই মেঘ I
মুছিয়া ফেলিত তার | সোনার লিখন, I
তোমার চিকণ I
-চিকুরের ছায়াখানি | বিশ্ব হ'তে যদি মিলাইত I

'চিকণ চিকুর' এক পংক্তিতে ও একটি পর্বে ব্যবহার করিতে পারিলেই ভাল হইত।

এই ছন্দে পর্বের দৈর্ঘ্য সমান থাকে না। ১০, ৮, ৬, ৪ ও ২ মাত্রার পর্ব মিশ্রিত করিয়া এই ছন্দ গঠিত হয়। এবং ইহার বিভিন্ন চরণেও মাত্রা-সংখ্যা সমান থাকে না। ৮+১০=১৮ মাত্রার একটি দীর্ঘ পংক্তির ঠিক পরেই দুই বা চার মাত্রায় গঠিত একক পর্ব দ্বারাও একটি পংক্তি রচিত হইতে পারে। সুতরাং ইহা যে শুধু যতি-মুক্ত ছন্দ তাহা নহে, পর্বে মাত্রা-সাম্য এবং চরণে মাত্রা-সাম্য বা পর্ব-সাম্য—সম ছন্দের এই দুইটি বাঁধা-বাঁধি নিয়মও ইহাতে লঙ্ঘিত হয়। ইহাই প্রস্ফুট বাংলা ছন্দের শিথিলতম রূপ। বিশেষ সামঞ্জস্য সহ অসম পর্ব ও অসম পংক্তি ব্যবহার করা এবং ছেদ-বিরতি অনুসারে পর্ব ও পংক্তি গঠন করা, এই ছন্দের প্রধান লক্ষ্য। এই ভাবে রচিত হইলে মুক্তক ছন্দ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যেমন,

প্রিয় তারে রাখিল না | রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ I
রুধিল না সমুদ্র পর্বত। I
আজি তার রথ I

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে I
নক্ষত্রের গানে I
প্রভাতের সিংহ দ্বার পানে। I
তাই I
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, I
ভার-মুক্ত সে এখানে নাই। I

এই 'ভার-মুক্ত' ছন্দও বাংলা সাহিত্যে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে, সন্দেহ নাই।

মিল এই ছন্দের একটি প্রধান উপকরণ। এইখানেই গৈরিশ ছন্দের সহিত মুক্তকের প্রধান পার্থক্য। মিত্রাক্ষরতার গুণেই এই ছন্দে প্রস্ফুট ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন হয়। সেজন্য মিত্রাক্ষরের নিপুণ প্রয়োগের উপর এই ছন্দের উৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে। ইহাতে যুগ্মকের ন্যায় ক-ক, খ-খ, গ-গ—এই ভাবে মিত্রাক্ষর বিন্যাস করা যাইতে পারে, অথবা মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে নানা বৈচিত্র্যের আশ্রয় লওয়া চলে। অনেক সময় ভাবের ক্রমিক আরোহ দেখাইবার জন্য একই মিত্রাক্ষর পর পর অনেক-গুলি পংক্তিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

হে সুন্দর, I
তোমার বিচার ঘর I
পুষ্পবনে, I
পুণ্য-সমীরণে, I
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গ-গুঞ্জনে, I
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে, I
তরঙ্গ-চুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লব-বীজনে। I

'বলাকা'র আর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মিত্রাক্ষর-স্থাপনে পরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যেমন,

হে বিরাট নদী, I
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল I
অবিচ্ছিন্ন অবিরল I
চলে নিরবধি। I

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির মিল জলের প্রকৃতি এবং প্রথম ও চতুর্থ পংক্তির মিল নদীর একটানা গতির আভাস সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মুক্তক ছন্দে আরও নানা প্রকার মিত্রাক্ষর-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

এই ছন্দে যতি সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত হইলেও ইহাকে পদ্য-ছন্দের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কারণ নির্দিষ্ট গঠনের পর্ব বা পর্ব-বিন্যাস এই ছন্দে পাওয়া না গেলেও পদ্যের সুস্পষ্ট ছন্দ-স্পন্দ মুক্তকে পাওয়া যায়। অসম-পর্ব ও অসম পংক্তির সামঞ্জস্য, বিশেষ করিয়া মিত্রাক্ষরতা, এই প্রস্ফুট ছন্দ উৎপাদনে সহায়তা করে।

মুক্তক ও দেশজ ছন্দ—ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে যেরূপ উৎকৃষ্ট মুক্তক রচনা করা যায়, অন্য শ্রেণীর ছন্দে তাহা সম্ভব নহে। তাহার কারণ, শুদ্ধ-প্রাকৃত ও দেশজ ছন্দ যতি-নিষ্ঠ বলিয়া সমমাত্রিক পর্বই এই দুই ছন্দের প্রধান উপাদান। দেশজ ছন্দে তো পর্ব-বৈষম্য সৃষ্টি করাই সম্ভব নহে। সেজন্য দেশজ ছন্দে খাঁটি মুক্তক রচিত হইতে পারে না। ইহাতে পংক্তির বৈচিত্র্যই শুধু সৃষ্টি করা চলে, কিন্তু ভঙ্গ প্রাকৃতের ন্যায় পর্ব ও পংক্তির যুগপৎ বৈচিত্র্য ইহাতে পাওয়া যায় না। যেমন রবীন্দ্রনাথের,

যখন আমায় | হাত ধরে I
আদর করে I
ডাকলে তুমি | আপন পাশে, I
রাত্রি দিবস | ছিলেম ত্রাসে I
পাছে তোমার | আদর হ'তে | অসাবধানে I
কিছু হারাই I

(বলাকা, ২২)

[৬+৬ ; ৬ ; ৬+৬ ; ৬+৬ ; ৬+৬+৬ ; ৬]

বিদেশী মূল ছন্দ

বিদেশী ছন্দের মধ্যে শুধু ইংরেজী ছন্দই বাংলা সাহিত্যে চালাইবার উল্লেখ-যোগ্য চেষ্টা হইয়াছে। সেজন্য বাংলা কবিতায় ইংরেজী ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলা ছন্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। তাহা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে ইংরেজী ছন্দের নিকট বাংলা সাহিত্য ঋণী। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাক—(১) বাংলা ছন্দে ইংরেজী প্রভাব এবং (২) বাংলা ভাষায় ইংরেজী ছন্দ।

বাংলা ছন্দে ইংরেজী প্রভাব—সাত-আট শত বৎসর পূর্বে বাঙালী যখন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে উদ্যোগী হয়, সে সময় সংস্কৃত সাহিত্য ছিল দেশবাসীর আদর্শ স্থানীয়। সেজন্য বাংলা ছন্দের উপর সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব পড়িয়াছে, ইহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। গত শতকে ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগ দেখা দেয়। এই নবযুগের সাহিত্যে অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যে বাংলা ছন্দের উপর ইংরেজী ছন্দের প্রভাব পড়িবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। তবে এই প্রভাব কতকগুলি অপ্রধান বিষয়েই সীমাবদ্ধ। ইহা বাংলা ছন্দের মৌলিক প্রকৃতি পরিবর্তিত করিতে পারে নাই, বা বাংলায় কোন নূতন ছন্দ-ধারা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই।

বাংলা ছন্দে ইংরেজী প্রভাবের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মধুসূদনের অমিত্র ছন্দের কথা বলিতে হয়। ইংরেজী blank verse-এর অনুকরণে মধুসূদনই প্রথম অমিত্র ছন্দ রচনা করেন। এই অমিত্র ছন্দ হইতেই পরে গৈরিশ ছন্দ ও মুক্তক—বাংলার এই দুইটি বিশিষ্ট ছন্দ-ধারা উৎপন্ন হয়। সুতরাং অমিত্র ছন্দের জন্য আমরা ইংরেজী ছন্দের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

মধুসূদন ইংরেজী ছন্দ হইতে আর একটি মূল্যবান রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়া বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন ; ইহা সনেট (sonnet)। মধুসূদন সনেটের নাম দিয়াছিলেন 'চতুর্দশপদী' কবিতা। এখানে 'পদ'-শব্দটি পংক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সনেট চতুর্দশ চরণের কবিতা। ইহাতে নানা প্রকার মিত্রাক্ষর-স্থাপন ও স্তবক-বিন্যাস করা সম্ভব। মধুসূদন এবং পরবর্তী অনেক বাঙালী কবি সুন্দর সুন্দর সনেট লিখিয়াছেন। সনেট এখন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট কাব্য-রূপ।

আর একটি বিষয়ে বাংলা ছন্দ ইংরেজীর নিকট ঋণী। ইংরেজী কবিগণ মিলের প্রতি অধিক মনোযোগী। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আধুনিক বাঙালী কবিগণও এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। পূর্বে বাংলা ছন্দে চরণান্ত-মিত্রাক্ষর ব্যবহারের রীতি ছিল বটে। অপভ্রংশ যুগে এই রীতি প্রথম ছন্দোবন্ধে স্বীকৃতি লাভ করে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মিত্রাক্ষর প্রয়োগে খুব বেশী বৈচিত্র্য বা নৈপুণ্য পাওয়া যায় না। 'ক-ক'-ক্রম অনুযায়ী মিল ব্যবহার করা ছাড়া নূতন প্রকার মিত্রাক্ষর-বিন্যাস প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। এবং শব্দান্ত একটি মাত্র ব্যঞ্জনের অথবা শুধু শব্দান্ত স্বর-ধ্বনিটিরই পুনরাবর্তনকে মিল বলিয়া চালাইতেও তাঁহাদের কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু মিলও যে পদ্যের একটি প্রধান অঙ্গ, এবং মিলকে কেন্দ্র করিয়া যে ছন্দে নানা প্রকার কারু-কার্য করা সম্ভব, একথা মধুসূদন ও তাঁহার যুগের অন্যান্য ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী কবিই প্রথম উপলব্ধি করেন। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতায় এবং বিহারীলালের কাব্যে মিত্রাক্ষর-বিন্যাসের নানা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্রাক্ষরের সুষ্ঠু প্রয়োগে ও ইহাতে বৈচিত্র্য-সম্পাদনে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের নামও উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে বাঙালী কবিদের মধ্যে যে প্যাটার্ণ-বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়াছে, তাহার মূলেও আধুনিক ইংরেজী ছন্দের প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। Robert Bridges, প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবিগণ নিয়মিত ছন্দের বিরোধী। তাঁহাদের মতে প্যাটার্ণ ছন্দের একঘেয়েমী বা sing song-ভাব কবিতার ভাব-সংগতির অনুকূল নহে। সেজন্য একই কবিতায় তাঁহারা iambic পর্বের সহিত anapaest, এমন কি trochee-dactylও ব্যবহার করিয়া ভাবানুসারী তরঙ্গ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। প্রাচীন বাংলায় প্যাটার্ণ-ছন্দই প্রচলিত ছিল, এবং এই সকল প্যাটার্ণ-ছন্দের এক একটি নাম রাখা হইত; যেমন, পয়ার, ত্রিপদী, ললিত, প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে নিয়মিত ছন্দই অধিক রচনা করিয়া প্যাটার্ণ-ছন্দের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সের রচনায় শিথিল-বন্ধ ছন্দই প্রাধান্য লাভ করে। এই দিকেও তিনি উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অতি আধুনিক বাঙালী কবিগণও বিষম-ছন্দের প্রতি অধিক পক্ষপাত দেখাইয়া থাকেন।

ইংরেজী prose-verse এর অনুকরণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য-ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ছন্দ-ধারা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আধুনিক বাংলা কাব্য যে এরূপ ছন্দ-সমৃদ্ধ, সেজন্য আমরা মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের নিকটেই প্রধানতঃ ঋণী। কিন্তু ইংরেজী ছন্দও যে পরোক্ষ-ভাবে আধুনিক বাংলা ছন্দকে প্রভাবিত করিয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

বাংলা ভাষায় ইংরেজী ছন্দ—ইংরেজীর ন্যায় আদ্য শ্বাসাঘাতের সাহায্যেই বাংলা শব্দ উচ্চারণ করা হয়। সেজন্য ইংরেজী ছন্দ বাংলায় স্বাভাবিক শুনাইবে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজীতে প্রতিটি

প্রধান শব্দ শ্বাসাঘাতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয়। অপর পক্ষে, বাংলার বাক্য-গত উচ্চারণে একটি প্রধান শ্বাসাঘাতের দ্বারা তিন চারটি শব্দ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। এই মৌলিক পার্থক্যের জন্য ইংরেজী ছন্দ বাংলা ভাষায় বিশেষ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ইংরেজীতে এক একটি পর্ব বা foot দুই বা তিন অক্ষরে গঠিত। সুতরাং দুই-তিন অক্ষর পরেই ইংরেজী ছন্দে শ্বাসাঘাত পতিত হয়। কিন্তু বাংলায় এরূপ ঘন ঘন শ্বাসাঘাত সম্ভব নহে। ছোট ছোট পর্ব বাংলায় তেমন স্বাভাবিক শুনায় না বলিয়াই চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয় নাই, একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

সত্যেন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতায় ইংরেজী ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশ ছন্দই দেশজ রীতির নিয়ম অনুসারে বিশ্লেষণ করা চলে। তাঁহার কয়েকটি কবিতায় ইংরেজী ট্রোকী ছন্দের চলন খুব পরিস্ফুট। যেমন,

মেয়ে | বড়ো | লক্ষ্মী |
মেয়ে | চাঁদের | কোণা |
ভোরে | বেলায় | জাগ্‌বে |
জেগেই | জেগেই | থাক্‌বে |
সন্ধ্যা | হ'লেই | ঘুম |
শ্যাম্‌ সা | -য়রে | আর্শী- | হেরে |
কাঁদে | -মা'ার | ধুম |

অথবা,

ধুৎরে | ওগো | ধুৎরো |

নাম্ তো | -মারি | | ধুত্তর

থাস্ গে | -লাসের | ঝাড়টি |

যাচ্ছ | নিয়ে | কন্দ্‌র

—এই ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব-বিভাগ সহ আবৃত্তি করিলে তবেই এই ছন্দে ইংরেজী ট্রোকীর আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইহাদের দুইটি পর্ব যুক্ত করিয়া আবৃত্তি করিলে এই ছন্দে বর্ণমাত্রিক দেশজ ছন্দের গতি-ভঙ্গী সৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র-পর্বিক ছন্দ বলিয়া চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দই বাংলায় তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সে ক্ষেত্রে ইংরেজী ছন্দের অনুকরণে রচিত অধিকতর সংক্ষিপ্ত-পর্বিক ছন্দ বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এরূপ সম্ভাবনা অল্প।

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী ছন্দ—মধ্যযুগে বাংলা দেশে হিন্দুদের মধ্যেও আরবী-ফার্সী শিক্ষায় আগ্রহ ছিল। তথাপি মধ্যযুগের কবিগণ বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী ছন্দ অনুকরণের প্রতি যত্নবান ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ আরবী-ফার্সী-ছন্দের কোন রসোত্তীর্ণ ধারা বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের যুগ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি। তিনি 'সংস্কৃত, বাংলা, পারস্য ও হিন্দী ভাষা' মিশ্রিত করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ফার্সী ছন্দ অনুকরণের চেষ্টা করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তুলনীয়ঃ

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বারদ্‌কে গোয়দ্ কবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর বো রোয়কে।

ইত্যাদি

রামগতি ন্যায়রত্ন পয়ার ফার্সী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রস্তাব করিযাছেন। কিন্তু এই মত সমর্থন-যোগ্য নহে। পয়ার-জাতীয় ছন্দ কি ভাবে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি।

সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় ফার্সী-ছন্দের অনুকরণ পাওয়া যায়। তাঁহার 'কবর-ই-নূরজাহান্' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। পরে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ আলোচনা কালে আমরা দেখাইব যে, ফার্সী ছন্দের রীতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বে বিভক্ত করিয়া পাঠ করিলে কবিতাটি অস্বাভাবিক শুনায়। ফার্সী ছন্দের কথা মনে করাইয়া না দিলে সকলেই কবিতাটি দেশজ ছন্দে রচিত বলিয়া মনে করিবেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়া বাংলায় ইংরেজী ও ফার্সী ছন্দের অনুকরণ সম্ভব হয় না।

অস্ফুট ছন্দ

আমরা এ পর্যন্ত প্রস্ফুট ছন্দের কথা আলোচনা করিলাম। কিন্তু আরও দুই প্রকার ছন্দ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। যে সকল গুণ থাকিলে প্রস্ফুট ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন হয়, সেগুলি এই ছন্দে নাই। তথাপি ইহাদের গঠনে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেজন্য এই শ্রেণীর রচনা পাঠ করিয়া আমরা রূপ-গত আনন্দ লাভ করি। সেজন্য ইহাদের 'পদ্য' নামে অভিহিত না করিলেও এই শ্রেণীর রচনা ছন্দ-হীন বিশৃঙ্খল বাক্য-গঠনও নহে। ইহাকেই আমরা অস্ফুট ছন্দ বলিয়াছি। বাংলা সাহিত্যে গৈরিশ ছন্দ ও গদ্য ছন্দ অস্ফুট ছন্দ-স্পন্দের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

গৈরিশ ছন্দ—কাল-ক্রমের বিচারে গৈরিশ ছন্দ মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দের মধ্যবর্তী। সেজন্য গৈরিশ ছন্দের

বীজ অমিত্র ছন্দে এবং মুক্তকের বীজ গৈরিশ ছন্দে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। অমিত্র ছন্দে পর্বগুলি অসমান হইলেও ইহাতে পংক্তির পরিমাপ নির্দিষ্ট। দুইটি চতুর্দশ-মাত্রিক চরণের মধ্যে অসম-পর্বগুলিকে বিচরণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু গৈরিশ ছন্দে পর্বের ন্যায় পংক্তির মাপও অনির্দিষ্ট। অমিত্র ছন্দ যে-ভাবে ছেদ-বিভাগ অনুযায়ী পড়া হয়, সে-ভাবে লেখা হয় না। অমিত্র ছন্দকেই ছেদ-বিভাগ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিলে গৈরিশ ছন্দের গঠন পাওয়া যাইবে। মুক্তকও গৈরিশ ছন্দের ন্যায় অসম-পর্বিক ও অসম-পংক্তিক। কিন্তু মুক্তকে মিল ব্যবহার করা হয়, এবং ইহার অসম পর্বগুলি অনেক বেশী সামঞ্জস্য-পূর্ণ। এই দুইটি গুণের অভাবেই গৈরিশ ছন্দ গদ্য-ছন্দের পর্যায়-ভুক্ত।

পয়ার জাতীয় ছন্দ হইতেই গৈরিশ ছন্দের উৎপত্তি। সেজন্য ভঙ্গ-প্রাকৃতের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই ছন্দে পাওয়া যায়। এই ছন্দ ছেদ-নির্ভর। ইহাতে অক্ষরের স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতি অনুসৃত হয়। ইহার চলন সংযত ও গম্ভীর, এবং বিযোড় মাত্রার পর্ব এই ছন্দের পক্ষে অনুপযুক্ত। এই ছন্দ বিষম ও চরণ-বন্ধ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকৃত পক্ষে এই ছন্দের প্রথম লেখক। তাঁহার হুতোম প্যাঁচার নক্সার (১৮৬১) উৎসর্গ-পত্রে এই ছন্দের আদি-রূপ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন—

হে সজ্জন,
স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্য রঙ্গের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে।

[৪ ; ১০ ; ৮ ; ৮+৬]

গিরিশচন্দ্র তাঁহার রাবণবধ ও পরবর্তী অন্যান্য পৌরাণিক নাটকে এই ছন্দ-ভঙ্গী বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুকরণ করেন। এই ছন্দের উৎকর্ষের

ও প্রতিষ্ঠার সমগ্র গৌরব তিনি একা দাবী করিতে পারেন। সেজন্য তাঁহার নাম অনুসারে এই ছন্দের নামকরণ সঙ্গত হইয়াছে। গিরিশ-চন্দ্রের পরবর্তী নাট্যকারগণের মধ্যে অনেকে এই ছন্দ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের রচনা হইতে এই ছন্দের কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

(১) ওঠ, ওঠ, | জীবন-সঙ্গিনী I
ওঠ সন্ন্যাসিনী। I
মায়া মোহ কর পরিহার, I
জাগাইয়া পূর্ব স্মৃতি | করহ স্মরণ, I
কতবার করিয়াছি | জনম গ্রহণ। I
জন্ম-মৃত্যু | ঘুচেছে এবার I
একাকার | একাধার | নির্বাণ আগারে I
জন্ম-মৃত্যু ফুরাইল! I
কেন খেদ কর আর? I

(বুদ্ধদেব চরিত)

(২) অপমান | পূর্ণ-মাত্রা হবে প্রতিশোধ I
আরেরে অবোধ, | আরেরে ভাঙড় I
শূল লয়ে কর ভারি ভুরি! I
ভাব | সংসারের ভার তব? I
সে দম্ভ ঘুচিবে, I
সৃষ্টি রবে | সংহার বিহনে I (দক্ষ যজ্ঞ)

এই ছন্দ-ভঙ্গী পৌরাণিক নাটকের ভক্তিভাব ও আবেগময়তার উপযুক্ত বাহন। সাধু ভাষার সহযোগে এই ছন্দ অপূর্ব নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। পৌরাণিক নাটকের পরিবেশ অবাস্তব ও অতিলৌকিক চরিত্রে ও ক্রিয়ায় পরিপূর্ণ। সেজন্য পুরাতন গন্ধী ভাষায় রচিত এই উদাত্ত ছন্দ-ভঙ্গীই পৌরাণিক নাটকে এতখানি সাফল্য

লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে চরিত্রের মর্যাদা অনুসারে তিন শ্রেণীর ভাষা ব্যবহৃত হইত উচ্চ সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতেন। গানে ও স্ত্রীলোকগণের সংলাপে মহারাষ্ট্রী- ও শৌরসেনী-প্রাকৃত ব্যবহৃত হইত। এবং ধীবর প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা মাগধী প্রাকৃত ব্যবহার করিত। গিরিশচন্দ্রও এই আদর্শ অনুসারে তাঁহার নাটকে তিন শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। নিম্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত চরিত্রের কথোপকথনে তিনি অতিরিক্ত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিতেন। অন্য কোন বাঙালী নাট্যকারের রচনায় এত প্রখর গ্রাম্য ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র মধ্যম শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপে স্বাভাবিক গদ্য-ভঙ্গী ব্যবহার করিতেন। এবং নায়ক, প্রতিনায়ক, নায়িকা প্রভৃতি বিশিষ্ট চরিত্রের সংলাপে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহৃত হইত।

আখ্যান-মূলক কাব্যে বা নাটকে ভাব যখন ঘনীভূত হইয়া উঠে, অথবা শ্রোতা বা পাঠকের মনে যখন গভীর রেখাপাত করা প্রয়োজন হয়, এই সকল ক্ষেত্রে লেখকগণ চলিত রীতি পরিবর্তন করিয়া সাময়িক ভাবে অন্য রীতি অবলম্বন করেন। এই সকল ক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাঙালী কবিগণ পয়ার-বন্ধ ত্যাগ করিয়া গীতি-ধর্মী ত্রিপদী বা একাবলী ছন্দ ব্যবহার করিতেন। শেক্‌স্‌পিয়র এরূপ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও গম্ভীর iambic pentameter-এর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। গিরিশচন্দ্রও এই উদ্দেশ্যেই গৈরিশ ছন্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

অতিমুক্তক ছন্দ—আধুনিক বাংলা কবিতায় গৈরিশ ছন্দের ন্যায় আর এক প্রকার যুগ্ম-মাত্রিক, অমিল, বিষম ছন্দ পাওয়া যায়। আমরা ইহাকে গৈরিশ ছন্দ বলিতে পারি না, কারণ গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত এক প্রকার নাটকীয় ছন্দকেই গৈরিশ ছন্দ বলা হয়। আমাদের আলোচ্য ছন্দের ভাষা ও ভঙ্গী গৈরিশ ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহার ছন্দ-রূপও গৈরিশ ছন্দ অপেক্ষা অধিক মার্জিত। ইহা গীতি-কাব্যের

উপযুক্ত ছন্দ-ভঙ্গী। গৈরিশের সহিত এই ছন্দের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা মুক্তকের সগোত্র। সেজন্য আমরা এই ছন্দের নাম দিয়াছি অমিল মুক্তক বা অতি-মুক্তক ছন্দ। তবে ইহা অস্ফুট ছন্দ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ নিয়ন্ত্রিত পর্ব-সমাবেশ এবং মিত্রাক্ষরতার জন্য মুক্তক ছন্দে প্রস্ফুট ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই ছন্দের পর্ব-বন্ধ শিথিল এবং ইহাতে মিল ব্যবহৃত হয় না। এই ছন্দ-ধারা এখনও অধিক প্রচলন লাভ না করায় ইহার গতি ও প্রকৃতিতে এখনও কিছু পরিমাণ অস্পষ্টতা রহিয়াছে। এই ছন্দের নমুনা—

বরং প্রেমের ভাণ করিও না | —সেই হবে ভালো ; I
দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো। I
তবু মুগ্ধ হবো। I
নাই বা চিনিলে মোরে। | আমি যদি ভালবেসে থাকি, I
সে-কথা তোমার কানে | নানা সুরে জপিতে চাহি না ; I
আমার সে ভালোবাসা— | তুমি তারে পারিবে না
কখনও বুঝিতে I

(বুদ্ধদেব বসু)

গদ্যছন্দ

ছন্দ কি ভাবে সঙ্গীতের নিয়ম-কাঠিন্য অমান্য করিয়া গদ্যাভিসারী হইয়াছে, তাহাই আমরা দেশজ ছন্দ হইতে গৈরিশ ও অতিমুক্তক প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম। গৈরিশ ও অতিমুক্তক ছন্দের যুগ্ম-মাত্রিক চলনে প্রস্ফুট ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। গদ্যছন্দে এই পদ্যসুলভ অস্বাভাবিকতাটুকুও বর্জিত হইল। গদ্যছন্দকে ছন্দের

সর্ব-নিম্ন স্তর বলা যাইতে পারে, আবার সর্বোচ্চ স্তরও বলা যাইতে পারে, কারণ গদ্যছন্দের সূক্ষ্ম ছন্দ-স্পন্দ যেরূপ সর্ব সাধারণের ছন্দ-পিপাসা দূর করিতে পারে না, সেইরূপ গদ্যে ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন করাও 'কবি-যশঃ-প্রার্থী' সকলের পক্ষেই সম্ভব নহে।

'পদ'-বিন্যস্ত ভাষাকে 'পদ্য' বলে। সেইরূপ 'গদ্য' শব্দের মূল অর্থ কথ্য ভাষা বা সাধারণ কথা-বার্তার ভাষা। আধুনিক যুগেই গদ্যে ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন করার চেষ্টা চলিতেছে, পূর্বে ইহার গদ্যাতিরিক্ত অন্য কোন মার্জিত রূপ ছিল না,—একথা ঠিক নহে। প্রাচীন গ্রীসে সিসেরো প্রভৃতি বড় বড় বাগ্মী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতাদের মনে অপূর্ব আলোড়ন উপস্থিত হইত। এই জাতীয় মর্মস্পর্শী ভাষণেও যে গদ্যের মার্জিত, সংহত রূপ বর্তমান থাকিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রেও গদ্য-রীতির দোষ-গুণ আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং কথ্য-ভাষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ইহাও যে পদ্যের ন্যায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষকে চমৎকৃত করিতে পারে, একথা প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত।

বাংলা সাহিত্যে মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বে গদ্যের প্রচলন হয়। এই সময়ের মধ্যেই বাঙালী লেখকগণ গদ্য-ভঙ্গীতে সাহিত্য রচনা করিয়া ইহার মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। গত শতকের লেখকগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং বিংশ শতকের লেখকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর নিকট বাংলা গদ্য-রীতি বিশেষ ভাবে ঋণী। সাহিত্যিক বাক্য রচনা করা এক প্রকার শিল্প-কর্ম; ব্যাকরণে এই শিল্প-রচনার সূত্র পাওয়া যাইবে না—একথা উৎকৃষ্ট গদ্য-লেখকগণের রচনা পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

বাংলা সাহিত্যে নানা প্রকার গদ্য প্রচলিত। ইহাদিগকে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) উৎকৃষ্ট গদ্য বা ব্যাকরণ-শুদ্ধ গদ্য, (২) আবেগময় গদ্য এবং (৩) গদ্য-ছন্দ। ইহাদের মধ্যে শেষের দুই স্তরের রচনাই কাব্য-ধর্মী। আমরা এখানে এই দুই প্রকার গদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আবেগময় গদ্য ও গদ্যছন্দের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। আবেগময় গদ্যে স্রোত আছে, কিন্তু তরঙ্গ নাই। কিন্তু গদ্যছন্দ যেন তরঙ্গায়িত নদী স্রোত। আবেগময় গদ্যের একটানা স্রোতে পড়িয়া বাক্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ভাবোদ্বেলতা। এখানে শব্দ সুনির্বাচিত এবং বাক্যাংশ সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আবেগ দুই কূল ছাপাইয়া বন্যাস্রোতে ভাসিয়া চলে। যেমন রবীন্দ্রনাথের—

"বাংলা যার মাতৃভাষা, সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হ'য়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি; —তোমার অভ্রভেদী শিখর-চূড়া বেষ্টন ক'রে, পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে-শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে-পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগাশঙ্কার উদ্বেল ধারা বাঙালী চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে ব'য়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ-ধ্বনি।"

অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের—

"এসো ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকারে কাল স্রোতে ঝাঁপ দিই! এসো আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে ভয় কি! ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে। চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা

সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

এই শ্রেণীর রচনাকে নিছক গদ্য বলা চলেনা, কারণ ইহাতে গতি আছে, এই গতি দৈনন্দিন প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া পাঠককে রসের আনন্দ লোকে উপনীত করিতে পারে। এই গতিই ছন্দের প্রাণ, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রস্ফুট ছন্দে এই গতি তরঙ্গ-ভঙ্গের রেখা-বৈচিত্র্যে বিশেষ বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বলা হয় ছন্দের প্যাটার্ণ। অস্ফুট ছন্দের নির্দিষ্ট রূপ না থাকিলেও, গদ্যছন্দে ও গৈরিশ ছন্দে রূপ-বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। এইখানে আবেগময় গদ্য ও গদ্য-ছন্দের প্রধান পার্থক্য। তাহা ছাড়া, গদ্য ছন্দে বাক্যের সামগ্রিক আবেদন অপেক্ষা প্রতিটি শব্দের ও বাক্যাংশের সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। এবং আবেগময় গদ্যের উদ্বেলতার পরিবর্তে ইহার লক্ষ্য ভাব-সংহতি। পয়ার-ত্রিপদী হইতে গৈরিশ পর্যন্ত সমস্ত ছন্দেই ভঙ্গ-প্রাকৃতের স্বাভাবিকতা সত্ত্বেও কিছুটা 'পদ্য-পদ্য' ভাব পাওয়া যায়। প্রাচীন-গন্ধী ভাষায় এবং syntax বা শব্দের ক্রম-ভঙ্গে (যেমন,—হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ 'তুমি') এই অস্বাভাবিকতা পরিস্ফুট, এবং পদ্যে ইহা স্বীকৃত। কিন্তু গদ্যছন্দে এই সকল অস্বাভাবিকতা থাকে না, বা অল্প থাকে। গদ্যছন্দের নমুনা—

(১) এখানে নামল সন্ধ্যা।
সূর্যদেব,
কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্র পারে, তোমার প্রভাত হ'ল?
অন্ধকারে, এখানে কেঁপে উঠ্‌ছে, রজনীগন্ধা,
বাসর ঘরের দ্বারের কাছে, অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো;
কোন্‌খানে ফুটল, ভোর বেলাকার কনক চাঁপা? (রবীন্দ্রনাথ)

(২) ছুটি হ'লে পরে
সুরু হোত আমার মাষ্টারী
উদ্ভিদ্ মহলে।
ফলসা চালতা ছিল, ছিল সানবাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহৃত জন্মেছিল, কী করে ফুলের এক চারা
বাড়ীর গা-ঘেঁষে।
সেটাই আমার ছাত্র ছিল। (রবীন্দ্রনাথ)

(৩) নামল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা,
পিলু-বারোয়ার সন্ধ্যা।
একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগর হৃদয়ের গোধূলি লগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এল
তোমার পোষ্ট কার্ড,
আর এল তোমার ট্রেণের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক। (বিষ্ণু দে)

গদ্যছন্দ শব্দটি ইংরেজী pose verse-এর অনুবাদ। এই ছন্দ রবীন্দ্রনাথের লিপিকাতেই প্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং এ যুগের কবিগণের মধ্যে অনেকেই গদ্যছন্দের উৎকর্ষ-সাধনে মনোযোগী হন।

— — —

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ইতিহাস

আদি যুগ

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা—বাংলা ছন্দের আদি যুগ বা গঠন কাল ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ, শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ এবং দেশজ ছন্দ—বাংলা ছন্দের এই তিনটি ধারা উৎপন্ন হয়। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের আভাস পাওয়া যায় এই যুগের প্রথম দিকে রচিত চর্যা-গীতিকায়। এই যুগেই শেষ দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দও এই যুগেই অপভ্রংশ সাহিত্য হইতে বাংলায় গৃহীত হয়। জয়দেবের কাব্যে ইহার আদি রূপ পাওয়া যাইবে। এবং বিদ্যাপতির মৈথিল ও অবহট্‌ঠ কাব্যে প্রথম স্তরের শুদ্ধ প্রাকৃত ছন্দ আংশিক পরিণতি লাভ করে। এই যুগে দেশজ ছন্দেরও সূচনা দেখা দিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে সে যুগে প্রবাদ ও ছড়ার বাহিরে অভিজাত সাহিত্য-রচনায় এই ছন্দ ব্যবহৃত হইত কি না বলা কঠিন।

চর্যা-গীতিকার ছন্দ

ছন্দের ইতিহাসে চর্যাছন্দ—চর্যাগীতের আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার আলোচনা-গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। আমরা এই গীতগুলিতে হাজার বছরের পুরাতন বাংলা ভাষার নিদর্শন পাই। ইহাতে সে যুগের বাঙালীর

ধর্ম-জীবনের যে আলেখ্য পাওয়া যায়, তাহার মূল্যও কম নহে। এইভাবে চর্যাপদগুলি হইতে পুরাতন ইতিহাসের নানাপ্রকার জীর্ণ-সূত্র উদ্ধার করা হইতেছে। আমরা এখানে ভারতীয় ছন্দের ইতিহাসে চর্যাছন্দের স্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। চর্যাগীতের ভাষা যেরূপ অপভ্রংশ ও বাংলার মধ্যবর্তী সেতু রচনা করিয়াছে, চর্যার ছন্দেও সেইরূপ অপভ্রংশ ও বাংলা ছন্দের মধ্যবর্তী স্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। একদিকে অপভ্রংশ ছন্দের সহিত এবং অপর দিকে বাংলা ছন্দের সহিত চর্যাছন্দের যোগসূত্র বর্তমান।

চর্যাপদাবলীর ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে অপভ্রংশ ছন্দের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যাইবে :

(১) অপভ্রংশ ছন্দের ন্যায় চর্যার ছন্দও মাত্রাছন্দ।

(২) চর্যার ছন্দও সমিল

(৩) চর্যার ছন্দেও অক্ষরের অ-তৎসম প্রয়োগ সুলভ।

(৪) পূর্বাঞ্চলের অপভ্রংশ ধারা অনুযায়ী চর্যার ছন্দেও মাত্রাসম (অর্থাৎ সমপর্বিক ও সম-পংক্তিক) ছন্দের প্রাধান্য।

(৫) 'পাদাকুলক' অপভ্রংশ যুগের নিজস্ব ছন্দ। চর্যাতেও এই ছন্দের সংখ্যাই অধিক।

প্রথম দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি চর্যার ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

চর্যায় অক্ষরের মাত্রামূল্য—অক্ষরের মাত্রামূল্য সম্বন্ধে আমাদের এই যুগের নিয়ম অনুসারে চর্যা ও অপরাপর প্রাচীন বাংলা কাব্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে প্রচুর পরিমাণ ছন্দ-পতন পাওয়া যাইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তখনও বাংলা উচ্চারণের নিজস্ব রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। অন্ত্য-স্বরাঘাতের সহিত আদ্য-স্বরাঘাত এবং দীর্ঘ

উচ্চারণের সহিত হ্রস্ব উচ্চারণ তখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। বাংলা উচ্চারণের এই অনিশ্চয়তাই সে-যুগের ছন্দ-শৈথিল্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলা ভাষা উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করিলে, বাংলা উচ্চারণ হইতেও এই শিথিলতা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়। সেজন্য চর্যাপদাবলীর তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় মধ্যযুগের কবিদের রচনায় অধিক পরিমাণে আধুনিক ছন্দ-পদ্ধতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সে-যুগে বাংলার স্বকীয় উচ্চারণ-রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ না করায় অপভ্রংশ যুগে অক্ষরের যে নূতন মাত্রা-মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল, চর্যার যুগে তাহাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপভ্রংশ ছন্দ শাস্ত্রে দীর্ঘ অক্ষরের হ্রস্ব ও হ্রস্ব অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ বিকল্পে স্বীকৃত হয়, প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা আমরা দেখাইয়াছি। চর্যার ছন্দে অক্ষরের এইরূপ অ-তৎসম প্রয়োগ খুব বেশী। যেমন,

–● ●ʼ– ‿○ – – –
চিঅ সহজে | শূ ন সংপুন্না।

–● ○ ‿ ‿ – – ● ●– –
কান্ধ বি য়ো এ মা | হোহ বিষন্না ॥

–– – – – – – –
ভণ কইসে | বাহ্ন্ নাহি।

○○● ●○●– ‿ ‿ ‿●– –
করই অনুদিনং | তৈ লো এ পমাই

পাঠ-নির্ণয়ে ছন্দ—এইরূপ হ্রস্ব অক্ষরের দীর্ঘ প্রয়োগ এবং দীর্ঘ অক্ষরের হ্রস্ব প্রয়োগ চর্যাপদগুলিতে অত্যন্ত সুলভ। এই উচ্চারণ-শৈথিল্য অপভ্রংশ ছন্দেও স্বীকৃত হইয়াছিল, সত্য। কিন্তু লিপিকরণে অশুদ্ধি ইহার আর একটি কারণ বলিয়া মনে হয়। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তে মাত্রা-পূরক দীর্ঘকরণের জন্য 'চিঅ' স্থলে 'চীঅ' পাঠই অধিক সঙ্গত।

অবশ্য এই দীর্ঘকরণ বা compensatory lengthening সকল ক্ষেত্রেই হইত বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে এক্ষেত্রে দীর্ঘকরণ সমর্থনযোগ্য। কারণ সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণে বহুস্থলে 'চীঅ' (=চিত্ত)-পাঠ পাওয়া যায়। যথা,

(১) চঞ্চল 'চীত্র' পাইঠো কাল ॥

(২) 'চীঅ' থির করি ধরহু রে নাহী। ইত্যাদি

সেজন্য এখানে 'চীঅ' পাঠই অধিক সঙ্গত। তাহা হইলে ছন্দও ঠিক থাকে। সেইরূপ, অনুজ্ঞা পদ 'ভন' অপেক্ষাকৃত আধুনিক ক্রিয়া রূপ। (তুলনীয় : করহ — করঅ—করো)। চর্যার ভাষার পক্ষে প্রাচীনতর 'ভণহ' বা 'ভণঅ' রূপই অধিক যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ 'শূন' স্থলে 'শুন' (তুলনীয় হিন্দী 'সুনসান') এবং 'কাহ্নু' স্থলে 'কাহ্নু' পাঠ (প্রাচীন মৈথিলীতে[১] এই পাঠ পাওয়া যায়) হওয়া উচিত কি না বিবেচ্য। ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেদের অনেক পাঠ পুনর্গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে[২]। এই ভাবে চর্যারও অনেক পাঠ সংশোধন করা যাইতে পারে। চর্যার মুদ্রিত পাঠে বহু লিপি-অশুদ্ধি আছে। অনেক সময় ছন্দ-বন্ধ উপেক্ষা করিয়া পংক্তির মধ্যভাগে অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত হইয়াছে। যেমন,

কইসনি (হালো ডোম্বী) তোহোরি | ভাভরি আলী।

এখানে 'হালো ডোম্বী' অংশটুকু পংক্তির মধ্যে নিরর্থক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। অতিরিক্ত অংশরূপে ইহা পংক্তির প্রথম দিকে বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত।

১। তুলনীয়—'বর্ণরত্নাকর', শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবাবুয়া মিশ্র সম্পাদিত, পৃঃ ২৫

২। Arnold, Vedic Metre, pp. 81

চর্যার ছন্দ-বিশ্লেষণ:—চর্যাপদগুলির ছন্দ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, লঘু ছন্দ বা ১৬ মাত্রার ছন্দ ও দীর্ঘ ছন্দ। ৪৭টি পদের মধ্যে ৩৭টিই* পাদাকুলক-জাতীয় ১৬ মাত্রার সমছন্দ। অবশিষ্ট ১০টি দীর্ঘ ছন্দে রচিত, অর্থাৎ ইহাদের প্রতি চরণ ১৬ মাত্রা অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অসমছন্দও আছে।

লঘুছন্দের দৃষ্টান্ত —

– – ◡ o o o – ◡ o – • •
(১) এবং কা র দৃঢ় | বা খো ড় মোডিডউ ।

o o o • – o o – • o – • •
বিবিহ বিআপক | বান্ধণ তোড়িউ ॥

– – o o o • – o • – –
কাহ্নু বিলসআ | আসব মাতা ।

• o • • ^ • o • • o • o – –
সহজ নলিনী বন | পইসি নিবিতা ॥ (গীত, ৯)

• • • • o o o • o o – –
(২) অপনে রচি রচি | ভব নিবাণা ।

– – ◡ o o – o ◡ o o o
মিছেঁ লো অ বন্ | -ধাব এ অপনা ॥

– ◡ • ◡ • ◡ o – o – –
অ ম্হে ন জান হু | অচিন্ত জোই ।

– o • • o • • • o • • – –
জাম মরণ ভব | কইসন হোই ॥ (গীত, ২২)

* পদ সংখ্যা—১-১৩, ১৭-২২, ২৬, ২৭, ২৯-৩৩, ৩৫-৩৮, ৪০, ৪২, ৪৪-৪৭, ৪৯ = ৩৭টি

দীর্ঘ ও অসম ছন্দের দৃষ্টান্ত

– – ●●– – ‿ ‿ ○●– – –

(১) গঙ্গা জউনা | মাঝেঁ রে বহঈ | নাঈ।

●○ ○●–● – – ● ● –

তহি বুড়িলী মা | -তঙ্গী পোইআ |

– – – ○ ○ – –

লীলে পার ক | -রেই ॥

– ●● – – – ●‿ – –

বাহতু ডোম্বী | বাহ লো ডোম্বী।

–○● ●●● ● – –

বাটত ভইল উ | -ছারা |

– ●● – ○ ● –

সদগুরু পাঅ প | -এ

– ○● ○● ●● – –

জাইব পুণু জিণ | -উরা | (গীত, ১৪)

[৮+৮+৪ ; ৮+৮+৮+৪ ; ৮+৮+৮+৪ ;
৮+২+৮+২]

(২) দোহা ছন্দ (২৬ মাত্রার চরণ)।

●●● ○ – – – ‿ ● –

মহারস পানে | মাতেল রে |

●○○● ●‿● ● – –

তিহুঅন সএল উ | -এখী।

–● ●○○ – –○ ○ –

পঞ্চ বিষয় রে | নায়কে রে |

○●● ‿ – ○ – –

বিপথ কো বীন | দেখী ॥

০০ ০●●● - - --

খর বিকিরণ স | -স্তাপে রে।

●●-০০ ●● ●●-

গঅণাঙ্গণ গই | পইঠা।

●- ● ●- ‿ ০● --

ভণন্তি মহিত্তা | মই এথু।

●-‿‿●০ --

বুড্‌ঢস্থে কিম্পিন | দিঠা। (গীত, ১৬)

[৮+৬+৮+৪ ; ৮+৬+৮+৪ ; ৮+৬+৮+৪ ;
৮+৬+৮+৪]

(৩) ২৮ মাত্রার ছন্দ

-- -- ---- -‿‿-০০ --

কিন্তো মন্তে | কিন্তো তন্তে | কি ন্তো রে ঝা ণব | -খানে |

●০--●● -●●-- ●০●●●● --

অপই ঠান ম | -হাসুহ লীনে | দুলখ পরম নি | -বাণে |

---- -●●০- -●০-- --

দুঃখেঁ সুখেঁ | একু করিআ | ভুঞ্জই ইন্দী | জানী |

০●-●●- -●● -০● ০০--●● --

স্বপরা পর ন | চেবই দারিক | সঅলানুত্তর | মাণী | (গীত, ৩৪)

[৮+৮+৮+৪]

চর্যাপদ ও বাংলা ছন্দ—যে-সকল অপভ্রংশ-বৈশিষ্ট্য চর্যার ছন্দে পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের কথা বলা হইল। যে-সকল বিষয়ে চর্যাপদের ছন্দ বাংলা ছন্দের অগ্রদূত সে সকল কথাও পূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে ঐ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিব :

(১) চর্যার অধিকাংশ গীত সমছন্দে রচিত। বাংলা কবিতাও সমছন্দ-প্রধান।

(২) মধ্যযুগের কাব্যে যেরূপ পয়ার ছন্দই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পরেই ত্রিপদী—চর্যাতেও সেইরূপ ষোড়শ মাত্রিক ছন্দের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ; ২৮ মাত্রার ছন্দ সংখ্যার দিক দিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে।

(৩) ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের ন্যায় চর্যাপদগুলির ছন্দও প্রধানতঃ আট মাত্রার পব দ্বারা গঠিত।

(৪) এইরূপ দুই, তিন বা চারটি পর্বেই চর্যার পংক্তিগুলি রচিত। ষোড়শ-মাত্রিক পংক্তিগুলি দ্বিপদী ও সমছন্দে রচিত। অবশিষ্ট গীতগুলি প্রধানতঃ ত্রিপদী ও চৌপদী। বাংলা ছন্দও প্রধানতঃ দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী।

(৫) অপভ্রংশ যুগেই যৌগিক অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ এবং অধিক সংখ্যক লঘু অক্ষর ব্যবহার করিয়া ছন্দ রচনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলে এই পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করে। চর্যার ছন্দ হইতেই আমরা এই তথ্যটি জানিতে পারি। চর্যায় বহুস্থলে ১৩, ১৪, ১৫ এমন কি ১৬টি লঘু অক্ষর দ্বারা, অর্থাৎ সবলঘু বা লঘু-সংখ্যাধিক অক্ষর দ্বারা এক একটি ষোড়শ মাত্রিক পংক্তি গঠিত হইতে দেখা যায়। এবং যৌগিক অক্ষর সঙ্কোচন দ্বারা এক মাত্রায় উচ্চারণ করিবার রীতিও চর্যার ছন্দে অত্যন্ত সুলভ। এই ব্যাপারে 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ' কাব্যের অপভ্রংশ ছন্দে ও চর্যার অপভ্রংশ ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। চর্যাগীতগুলিতে হ্রস্ব ও হ্রস্বীকৃত অক্ষরের প্রাধান্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এইরূপ ১৪টি অক্ষর ব্যবহার করিয়া পয়ার এবং ২৬টি অক্ষর ব্যবহার করিয়া ত্রিপদী ছন্দ রচনা করিবার রীতি বাংলা দেশে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেই প্রচলিত হইয়াছিল। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার-ত্রিপদীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অপভ্রংশ ছন্দ কি ভাবে

ক্রমে ক্রমে বাংলার প্রসিদ্ধ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল, চর্যাগীতগুলি সে সম্পর্কে মূল্যবান সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

কবি জয়দেব ও বাংলা ছন্দ

গীতগোবিন্দে অপভ্রংশ ছন্দ—বাঙালী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত একটি গীতিকথা। ইহাতে ৮০টি শ্লোক ও ২৪টি গীত আছে। ইহাদের মধ্যে ৭৭টি শ্লোক বিভিন্ন বৃত্তছন্দে, একটি আর্যায় এবং অবশিষ্ট ২টি শ্লোক ও ২৪টি 'গীত' অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। সংস্কৃত শ্লোক অপেক্ষা অপভ্রংশ ছন্দে রচিত গীতগুলিই অধিক প্রসিদ্ধ। আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের উপর অপভ্রংশ প্রভাবের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, জয়দেবের ন্যায় সক্ষম কবি সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করিতে বসিয়াও অপভ্রংশ ছন্দাদর্শ অনুকরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

পূর্বী অপভ্রংশ ও জয়দেব—অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ সাহিত্যে যে-সকল ছন্দ প্রচলিত ছিল তাহাদের কতকগুলি হিন্দীতে ও কতকগুলি বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। হিন্দী সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম পৃথ্বীরাজ রাসো। চাঁদ বরদাই রচিত এই কাব্য গ্রন্থখানি অপভ্রংশ ছন্দের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার। এই কাব্যে ব্যবহৃত অপভ্রংশ ছন্দগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) দোহা বা গাথা জাতীয় বিষম-পংক্তিক ছন্দ, এবং (২) মাত্রাসমক জাতীয় সমপংক্তিক ছন্দ। এই কাব্যের শতকরা ৯০টির অধিক ছন্দই প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ বিষম-পংক্তিক ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। দোহা ছন্দের (১ম পংক্তি ১৩ মাত্রার ও ২য় পংক্তি ১১ মাত্রার) এবং ইহার বিপরীত 'কবিত্ত' ছন্দের সংখ্যা এই কাব্যে অত্যন্ত অধিক। ইহার তুলনায় এই গ্রন্থে মাত্রাসমক হইতে উৎপন্ন

হিন্দী চৌপঈ ছন্দের সংখ্যা নগণ্য। অপর পক্ষে গীতগোবিন্দের ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জয়দেব মাত্রাসমক জাতীয় 'পাদাকুলক' এবং সম্ভবতঃ এই ছন্দ হইতেই উদ্ভূত অষ্টাবিংশ-মাত্রিক ছন্দই অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। জয়দেব কয়েকটি গীত বিষম পংক্তিক ছন্দে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা দোহা বা গাথা-জাতীয় ছন্দ নহে। শুধু গীতগোবিন্দে কেন, বাংলা সাহিত্যের আদি-গ্রন্থ চর্যা-গীতিকার অধিকাংশ ছন্দও ষোড়শ-মাত্রিক মাত্রা-সমক অথবা উহা হইতে উৎপন্ন অষ্টাবিংশ-মাত্রিক সম-পংক্তিক ছন্দ। ইহা হইতে আমরা অপভ্রংশ ছন্দের দুইটি ধারার কথা কল্পনা করিতে পারি—পূর্বী ধারা ও পশ্চিমা ধারা। পূর্বাঞ্চলের কবি অনুসরণ করিয়া জয়দেব মাত্রাসমক ছন্দই অধিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাই এখন পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্যে পরিণত হইয়াছে। অপর পক্ষে, দোহা-জাতীয় অসম ছন্দ হিন্দীতে এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

গীতগোবিন্দের ছন্দ-বৈচিত্র্য—গীতগোবিন্দের অপভ্রংশ ছন্দগুলি চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) চৌমাত্রিক (২) পঞ্চমাত্রিক ও (৩) সপ্তমাত্রিক গণের ছন্দ এবং (৪) মিশ্র ছন্দ

(১) চৌমাত্রিক গণের ছন্দ

(ক) প্রতি পংক্তি ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬ মাত্রা; পাদাকুলক ছন্দ—

স্তনবিনি | হিতমপি | হারমু | দারম্।
সা মনুতে কৃশ তনুরিব ভারম্। (গীত, ৯)

গীত সংখ্যা ৯, ১২, ১৪ ও ১৮ এই ছন্দে রচিত

(খ) প্রতি পংক্তি ৪ + ৪ + ৪ + ৩ = ১৫ মাত্রা

অনিল ত | -রল কুব | -লয় নয় নেন।
তপতি ন সা কিশলয় শয়নেন। (গীত, ১৬)

(গ) প্রতিপংক্তি ৪+৭=২৮ মাত্রা

নিন্দতি | চন্দন | মিন্দু কি | -রণ মনু | -বিন্দতি | খেদম | ধীরম্
ব্যালনিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্ ॥ (গীত, ৮)

এই অষ্টাবিংশ মাত্রিক ছন্দ জয়দেবের বিশেষ প্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ ২৪টি গীতের মধ্যে দশটিই তিনি এই ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৭, ২০, ২২ ও ২৩ সংখ্যক গীত গুলি এই দীর্ঘ ছন্দে রচিত। বৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করিবার সময়েও জয়দেব দীর্ঘ শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দের প্রতিই অধিক পক্ষপাত দেখাইয়াছেন।

(গ) প্রতি পংক্তি — ৪ × ৬ + ৫ = ২৯ মাত্রা

নয়ন কু | -রঙ্গ ত | -রঙ্গ বি | -কাশ নি | -বাস ক | -রে শ্রুতি | মণ্ডলে।
মনসিজ পাশ বিলাস ধরে শুভ বেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥ (গীত, ২৪)

(ঘ) প্রথম পংক্তি—৪ × ৫ = ২০ মাত্রা
দ্বিতীয় পংক্তি—৪ × ৪ = ১৬ মাত্রা

প্রলয় প | -য়োধি জ | -লে ধৃত | বানসি | বেদম্।
বিহিত বহিত্র চরিত্রম খেদম্ ॥ (গীত, ১)

(ঙ) প্রথম পংক্তি—৪ × ৩ = ১২ মাত্রা
দ্বিতীয় পংক্তি—২ + ৪ = ৬ মাত্রা
তৃতীয় পংক্তি—৩ + ৪ + ৩ = ১১ মাত্রা

দিনমণি | মণ্ডল | মণ্ডন।
ভব | খণ্ডন।
মুনিজন | মানস | হংস ॥ (গীত, ২)

(২) পঞ্চ-মাত্রিক গণের ছন্দ :

(ক) প্রতি পংক্তি—৫ × ৪ = ২০ মাত্রা

কুসুম সুকু | -মার তনু | -মতনু শর | লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষম শীলয়া ॥ (গীত, ১৩)

(খ) প্রতি পংক্তি—৫×৬+৪=৩৪ মাত্রা (অথবা ২০+১৪)

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী |
হরতি দর | তিমিরমতি | ঘোরম্।
স্ফুরদধর সীধবে তব বদন চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্॥ (গীত, ১৯)

(৩) সপ্ত-মাত্রিক গণের ছন্দ—

প্রতি পংক্তি—৭×৩+৩=২৪ মাত্রা

কিং করিষ্যতি | কিং বদিষ্যতি | সা চিরং বির | -হেন।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেন॥ (গীত, ৭)

এই গীতে সপ্ত-মাত্রিক গণগুলির প্রথম ও চতুর্থ মাত্রায় এক একটি গুরু অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ফলে কবিতাটিতে বৃত্ত-ছন্দের ন্যায় একটি বিশেষ প্যাটার্ণ পাওয়া যায়। বৃত্ত-ছন্দের গণ-পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে এই সপ্তদশাক্ষর ছন্দের গণ-বিন্যাস হইবে র-স-জ-জ-ভ-গ-ল।

(৪) মিশ্র-ছন্দ—অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রা-দৈর্ঘ্যের গণ দ্বারা গঠিত ছন্দ:

(ক) প্রথম পংক্তি—৫+৫+৫+২=১৭ মাত্রা

দ্বিতীয় পংক্তি—৮+৫+২=১৫ মাত্রা (অন্য প্রকার গণ-সমাবেশও হইতে পারে)

মধুমুদিত | মধুপকুল | কলিতরা | -বে।
বিলস মদন রস | সরস ভা | -বে॥
মধুরতর পিক নিকর নিনদ মুখরে।
বিলস দশন-রুচি রুচির শিখরে॥ (গীত, ২১)

(খ) প্রথম পংক্তি—৩+৩+৫=১১ মাত্রা মিল ক
দ্বিতীয় পংক্তি—৩+৩+৩= ৯ " " খ
তৃতীয় পংক্তি—৩+৫+২=১০ " " ক
চতুর্থ পংক্তি—৪+৪+৫=১৩ " " খ

দহতি | শিশির | ময়ূখে।
মরণ | -মনুক | -রোতি।
পততি | মদন বিশি | -খে।
বিলপতি | বিকল ত | -রোতি ॥
ধ্বনতি মধুপ সমূহে।
শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিত বিরহে।
নিশি নিশি রুজ মুপযাতি॥ (গীত, ১০)

এই ছন্দেই কেবল অসম দোহা ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। ছন্দটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার প্রতি চরণের প্রথম ছয়টি অক্ষর লঘু এবং অবশিষ্টাংশ (১) লঘু+গুরু+গুরু, (২) গুরু+লঘু, (৩) লঘু+লঘু+গুরু, এবং ৪) লঘু+লঘু+গুরু+লঘু অক্ষর দ্বারা রচিত। বৃত্তছন্দ অনুসারে ইহার গণ বিন্যাস হইবে—ন-ন-য়, ন ন-গ-ল, ন-ন-স, -স-ল।

জয়দেবের অপভ্রংশ ছন্দে গুরু অক্ষরের প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। যুগ্ম-মাত্রিক ছন্দে (অর্থাৎ চার মাত্রার 'গণ'-গঠিত ছন্দে) সাধারণতঃ অযুগ্ম মাত্রায় গুরু অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩, ৭, ১১, ১৫, প্রভৃতি মাত্রা অপেক্ষা ১, ৫, ৯, ১৩, প্রভৃতি মাত্রার গুরু অক্ষরের প্রয়োগই বেশী। ইহার ফলে ঐ সকল অক্ষর উচ্চারণ কালে এক প্রকার তরঙ্গ-ভঙ্গ সৃষ্টি হইয়া চৌমাত্রিক 'গণ'-বিভাগ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় যুগ্ম মাত্রায় গুরু অক্ষর ব্যবহার করিয়া আট মাত্রার এক একটি যুক্ত-গণ সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, 'ধূমকেতুমিব', 'কনকদণ্ডরুচি' 'বন্ধুজীবমধু'। জয়দেবের সমস্ত অপভ্রংশ ছন্দেই শেষ 'গণে' অন্ততঃ একটি গুরু অক্ষরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য পংক্তির শেষে বিশেষ এক প্রকার ঝোঁক অনুভূত হয়।

জয়দেবের ছন্দও সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় পংক্তি-নির্ভর, বাংলা ছন্দের ন্যায় পর্ব-নির্ভর নহে। সে যুগে একটি চরণে মোট কত মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার উপরেই ছন্দের গঠন নির্ভর করিত। 'গণ'-বিন্যাস তখনও ছন্দের গঠনে সহায়তা করিত না। তথাপি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দেই যে যতি-বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'গণ' বা পর্বের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। জয়দেবের ছন্দে এই যতি-বিভাগ আরও স্পষ্ট। সেই জন্যই 'গণ' অনুসারে জয়দেবের ছন্দ বিশ্লেষণ করা হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের সাহায্যে একটি পংক্তি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন,

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্। (গীত, ১১)

গীতগোবিন্দ ও বাংলা ছন্দ—উপরে উদ্ধৃত তিন অংশে বিভক্ত পংক্তির সহিত বাংলা ত্রিপদী ছন্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। শেষে দুইটি গুরু অক্ষর ব্যবহার করিয়া ১৪ অক্ষরে ১৬ মাত্রার পংক্তি-রচনাও গীতগোবিন্দে সুলভ। এই শ্রেণীর পংক্তির আদর্শেই পয়ার ছন্দ রচিত হইয়াছিল। চর্যার ছন্দে ভঙ্গ প্রাকৃতের পূর্বাভাষের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। গীত গোবিন্দের যতি-প্রধান ও লঘু-অক্ষর-প্রধান পংক্তিগুলি তাহা সমর্থন করিতেছে।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস জয়দেবের অপভ্রংশ ছন্দ অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেজন্য বাংলা শুদ্ধ প্রাকৃত ছন্দের উপর গীতগোবিন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আদি যুগে দেশজ ছন্দ

আদি যুগে লোকসঙ্গীত হইতে দেশজ ছন্দের উদ্ভব হইয়াছিল। শুভঙ্করের 'আর্যা' নামে পরিচিত ছড়াগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে

অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।[১] এই ছড়াগুলি পঞ্চদশ শতকের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। শুভঙ্করের কোন কোন ছড়া আদি যুগের দেশজ ছন্দে রচিত। যেমন,

| | | |

কড়বা কড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥

ইহা চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ। শুভঙ্করের নামে প্রচলিত ছড়াগুলিকে 'আর্যা' বলা হয়। কিন্ত প্রাচীন আর্যা ছন্দের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। খুব সম্ভব অপভ্রংশ যুগে আর্যা ছন্দে এই জাতীয় গাণিতিক সূত্র বা ফরমুলা রচিত হইত। ঐ সকল সূত্রের বাংলা রূপান্তরও 'আর্যা' নামেই অভিহিত হইতে থাকে। শুভঙ্করের 'আর্যা' গুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত। কয়েকটিতে চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ পাওয়া যায়। পাদাকুলক ছন্দেও এইরূপ 'আর্যা' রচিত হইয়াছিল। যেমন,

পণশশী পঞ্চম শর গজবাণ।
নবগু নবগ্রহ রস বসুমান॥ ইত্যাদি

অধিকাংশ শুভঙ্করী 'আর্যা' পয়ার ছন্দে রচিত। ইহাদের ভাষা, ছন্দ ও বিষয় বস্তু, কোনটিই আদি যুগের উপযুক্ত নহে।

ডাকের প্রবচন, খনার জ্যোতিষিক সূত্র এবং মেয়েদের ব্রতকথার ছড়াগুলি কবে রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই সকল রচনায় যে সাংস্কৃতিক চিত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, এগুলি পঞ্চদশ শতকের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। কারণ পঞ্চদশ শতকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন-প্রবাহে যে-পৌরাণিক প্লাবন আসিয়াছিল, এই ছড়া জাতীয় রচনাগুলিতে তাহার কোনরূপ প্রভাব পড়ে নাই।

১। শ্রীসুকুমার সেন বা. সা. ই., পৃঃ ৩৬

এগুলি একান্ত ভাবেই বাংলার লোক-শ্রুতির (folk lore) নিজস্ব সম্পদ্। ১৩-১৪শ শতকে ব্রাহ্মণ্য ও স্থানিক সংস্কৃতির সমবায়ে যখন নূতন এক হিন্দু সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই যুগেই এই সকল প্রবচন, প্রবাদ ও ছড়া ব্যাপক প্রচলন লাভ করে। ডাকের বচন উড়িষ্যায় ও আসামেও প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত।

এই প্রবচন ও ছড়াগুলি যে আদি যুগেরই রচনা, ইহাদের ছন্দ-রূপ দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারা যায়। মধ্য যুগের শেষ দিকে এবং আধুনিক যুগে দেশজ ছন্দে যে-পারিপাট্য দেখা যায়, এই সকল রচনায় তাহা পাওয়া যায় না। এই যুগের দেশজ ছন্দের কয়েকটি নমুনা :

ষণ্মাত্রিক ছন্দ —

(১) ধর্ম করিতে যেজন জানি।
পুখর দিয়া রাখিয়ে পানি॥
অশ্বথ রোপে বড় কর্ম।
মণ্ডপ দেএ অশেষ ধর্ম॥ (ডাকের বচন)

(২) আমি অটনা | চার্যের বেটী।
গণতে গাঁথতে কারে বা আটি॥ (খনার বচন)

(৩) ভরা হইতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হইতে পাছে ভাল যদি ডাকে মায়॥ ঐ

চৌমাত্রিক ছন্দ—

(৪) আষাঢ়ে কাড়ান নামকে।
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে॥
ভাদরে কাড়ান শীষকে।
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে॥

(৫) আঘাণে পৌটি।
পৌষে দেউটি॥
মাঘে নাড়া।
ফাল্গুনে ফাঁড়া (খনার বচন

বিদ্যাপতির ছন্দ

বিদ্যাপতি ও বাংলা ছন্দ—বিদ্যাপতি মৈথিল এবং অবহট্ঠ ভাষায় অনেকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। গীত গুলি মিথিলা অপেক্ষা বঙ্গদেশেই অধিক সমাদর লাভ করে। কবিত্বে, ধ্বনি-মাধুর্যে এবং ছন্দ-বৈচিত্র্য বিদ্যাপতির পদাবলী অতুলনীয়। ইহারা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাপতি নানা প্রকার অপভ্রংশ ছন্দে কয়েক শত গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। গীতের সংখ্যাধিক্য বশতঃ জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির ছন্দে অধিক বৈচিত্র্য থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, গীতগোবিন্দের অধিকাংশ ছন্দ বিদ্যাপতির গীতগুলিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির ছন্দ আলোচনার দুইটি দিক আছে—(১) জয়দেবের ধারা ও বিদ্যাপতি, (২) বিদ্যাপতি কর্তৃক নূতন ছন্দ সংযোজন ও বাংলা ছন্দ।

জয়দেবের ধারা ও বিদ্যাপতি—ছন্দের গঠনের কথা বিবেচনা করিলে জয়দেব ও বিদ্যাপতির ছন্দে সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। জয়দেব ৪, ৫ ও ৭ মাত্রার 'গণ' ব্যবহার করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতির ছন্দেও এই তিনটি গণের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি পাঁচ মাত্রার 'গণ' ব্যবহার করিয়া খুব বেশী সংখ্যক গীত রচনা করেন নাই। কিন্তু

৪ ও ৷ মাত্রার গণ বিদ্যাপতির বিশেষ প্রিয়। বিশেষ করিয়া ৪ মাত্রার 'গণ' অবলম্বন করিয়া তিনি ষোড়শ-মাত্রিক, পঞ্চদশ-মাত্রিক এবং অষ্টাবিংশ-মাত্রিক ছন্দ রচনা করিয়াছেন। অষ্টাবিংশ-মাত্রিক জয়দেবী ছন্দ 'গীতগোবিন্দে'ই বিশেষ মর্যাদা পাইয়াছিল. একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীতেও এই ছন্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহাতে মনে হয়, বিদ্যাপতি জয়দেবেরই ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন; অথবা উভয়েই একই অপভ্রংশ ধারার সহিত পরিচিত ছিলেন। বিদ্যাপতি 'চৌকল' (অর্থাৎ চার মাত্রার 'গণ' গঠিত) ষোড়শ ও পঞ্চদশ মাত্রিক ছন্দেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গীত রচনা করিয়াছিলেন। সংখ্যা-বিচারে বিদ্যাপতির পদাবলীতে জয়দেবী ২৮শ মাত্রার ছন্দ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও, রূপ ও রসের বিচারে এই ছন্দে রচিত গীতগুলিই বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ রচনা। জয়দেবের ঐতিহ্য-বাহী কয়েকটি ছন্দের নমুনা :

৪ মাত্রার 'গণ' গঠিত ১৬ মাত্রার ছন্দ —

●○○● ◡●●● -●◡ ●●-

কানুমুখ | হেরইত | ভাবি নী | রমণী।
ফুকরই | রোয়ত | ঝর ঝর | নয়নী ॥

৪ মাত্রার 'গণ' গঠিত ১৫ মাত্রার ছন্দ—

কি করব | রে সখি | কানুক | রূপ।
কে পতি | -য়ায়ব | স্বপন স্ব | -রূপ ॥

৪ মাত্রার 'গণ' গঠিত ২৮ মাত্রার ছন্দ—

●●● ● - ●● -●● -○●

(১) কনক লতা অব লম্বন উয়ল,

●●● -○ ◡● - -

হরিণ-হীন-হিম ধামা।

(২) আজু রজনী হম ভাগে গমাওলুঁ,
পেখলু পিয়ামুখ-চন্দা ।

(৩) ঈ নব যৌবন বিরহে গমাওব,
কি করব সে পিয়া নেহে ।

(৪) তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে ।

৫ মাত্রার 'গণ' গঠিত ছন্দ—

কনক জয় | প্রেম কসি । পুনু পালটি | বাঁক হসি ।
আধিসয় | অধর মধু | পান দে | -হী ।
[৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ২ + ১]

এই ছন্দে জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' গীতটির চাল পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতির এই ছন্দটি আরও দীর্ঘ :

৭ মাত্রার 'গণ' গঠিত ছন্দ—

(১) ই ভর বাদর | মাহ ভাদর |
শূন মন্দির | মোর ।

(২) জখনে দুহুক | দিঠি বিছুড়লি |
দুহুমনে দুহু | লাগু । |

নূতন ছন্দ সংযোজন—উপরে যে-সকল ছন্দের কথা বলা হইল, তাহাদের অতিরিক্ত আরও অনেক নূতন নূতন ছন্দ বিদ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যে-সকল ছন্দের সহিত পরবর্তী বাংলা ছন্দের সাদৃশ্য আছে, তাহাদের কথাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে ছয় মাত্রার 'গণ'-গঠিত ছন্দ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে 'ষট্‌কল'

'হীর' ছন্দের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। চর্যায় বা গীতগোবিন্দে ষণ্মাত্র-পর্বিক ছন্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীতে এই শ্রেণীর ছন্দ সুলভ। প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যেও ষণ্মাত্র-পর্বিক ছন্দের প্রচলন খুব বেশী। বাংলা ছন্দের কাল-ক্রমিক বিচার করিলে বিদ্যাপতির গীতাবলীতেই এই শ্রেণীর ছন্দের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। বিদ্যাপতির কাব্য হইতে 'ষট্কল' ছন্দের নমুনা :

জল জল হম   জলপে চিক্কন   কৈসন কুটিল   কান।
কাঠ কঠিন   কএক মোদক   উপরে মাখিয়া   গুড়।
কনক কলস   বিখে পুরইল   উপর দুধক   পুর॥

এই শ্রেণীর ছন্দ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার ছন্দ বিদ্যাপতির গীত-গুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও এই সকল ছন্দ বিশেষ প্রচলিত। যেমন,

১০ মাত্রার ছন্দ, 'দিগক্ষরা'—

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনু উনমত কান॥

১১ মাত্রার ছন্দ, 'একাবলী'—

•• ••• ○• •••
হমর বচন | সুন সজনি।
–○ •○• ••• ••
মান করবি | আদর জানি॥
জব কিছু পিয়া পুছব তোয়।
অবনত মুখ রহবি গোয়॥

এইগুলি ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ছন্দ বিদ্যাপতির পদাবলীকে বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি ছন্দোবন্ধের কথাই শুধু আমরা এখানে বলিব।

বিদ্যাপতি 'সপ্তকল' ছন্দের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার গীত-গুলিতে নানা প্রকার সপ্ত-মাত্রিক ছন্দ পাওয়া যায়। পূর্বে দুই প্রকার সপ্ত-মাত্রিক চৌপদী ছন্দের কথা বলা হইয়াছে। সপ্ত-মাত্রিক দীর্ঘ-ছন্দই তাঁহার কাব্যে অধিক পাওয়া যায়। সপ্ত-মাত্রিক দ্বিপদীও আছে। যেমন,

●●● – ●● ●● ●–●●
অরুণ লোচন | ঘুমি ঘুমাএল।
● ○ ● – ●○ ●●● – ○●
জনি রত্তোপল | পবনে পাওল ॥

সপ্ত-মাত্রিক মিশ্র দ্বিপদী দ্বারা চার চরণের স্তবক :

●○○– – ○●● – –
কুমুদ বন্ধু মলিন ভাসা
–● –●○ ○●● ● – ●
চারু চম্পক অরুণ বিকাসা।
শুদ্ধ পঞ্চম গাব কলরব,
কলয় কণ্ঠী কুঞ্জ রে। ১
রে রে নাগর জাগ এ দেহ খব
ছোড় আঞ্চল জাব পথ নহি পথিক সঞ্চর
লাজ ডর নহি তো পরাণী
দে মোরানি রে। ২

২৮শ মাত্রার জয়দেবী ছন্দ হইতে ত্রিপদী উৎপন্ন হইয়াছে, একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। জয়দেবের কাব্যেই এই ছন্দ কোথাও ২৮শ মাত্রার একপদী, কোথাও ১৬+১২ মাত্রার দ্বিপদী*; আবার কোথাও

* একপদী—"ললিত লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।" গীতগোবিন্দে এই ছন্দের দ্বিপদী অর্থাৎ ১৬+১২ মাত্রার পঙ্ক্তির সংখ্যাই অধিক।

কবি মিত্রাক্ষর বিন্যাস করিয়া পংক্তিগুলিকে ৮+৮+১২—এই ভাবে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ছন্দে শেষ দুইটি গঠনই পাওয়া যায়। যেমন, ১৬+১২=২৮ মাত্রার দ্বিপদী :

অঙ্কুর তপন তাপ যদি জারব |
কি করব বারিদ মেহে।

আবার মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া ছন্দটিকে ত্রিপদীতে পরিণত করা হইয়াছে। যেমন,

প্রেম রতন খনি রমনী শিরোমণি
পিয় বিরহানল জানি।
অম্বর জর জর নয়ন নিঝর ঝর
বদনে ন নিকসএ বাণি ॥

অনেক সময় মিল ব্যবহার না করিয়া শুধু প্রবল যতি দ্বারা ছন্দ-পংক্তি ত্রিখণ্ডিত করা হইয়াছে। যেমন,

জয় জয় ভৈরবি অসুর ভরাউনি
পসুপতি ভামিনি মায়া।
সহজ সুমতি বর দিঅও গোসাউনি
অনুগতি গতি তুয় পায়া ॥

বিদ্যাপতি দীর্ঘ ও হ্রস্ব অক্ষরের তৎসম প্রয়োগই বেশী করিয়াছেন। তবে সঙ্কোচন-মূলক অক্ষরও তাঁহার পদাবলীতে সুলভ। বিদ্যাপতির ছন্দে লঘু অক্ষরের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। চর্যায় কোন কোন পংক্তিতে দীর্ঘ অক্ষরের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু বিদ্যাপতি সর্ব-লঘু অথবা অধিকাংশ-লঘু অক্ষর দ্বারা ছন্দ রচনা করিয়াছেন।

কীর্তিলতার ছন্দ—বিদ্যাপতি রচিত কীর্তিলতার ভাষা পরীক্ষা করিলে ইহাকে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মৈথিলীর মিশ্রণ হইতে

উদ্ভূত এক প্রকার সঙ্কর-ভাষা বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই নানা প্রকার মিশ্র ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অর্বাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের 'গাথা ভাষা'ও এক প্রকার মিশ্র ভাষা। ইহাতে প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃতের মিশ্রণ করা হইত। ব্রজবুলিও বাংলা ও মৈথিলীর মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন ভাষা।

কীর্তিলতায় পঞ্চ-কল ও সপ্ত-কল ছন্দই অধিক। অপভ্রংশ ছন্দে, এবং জয়দেবের কাব্যেও, এই দুই ছন্দ এতটা প্রাধান্য লাভ করে নাই। কীর্তিলতার ছন্দে এইখানেই অপভ্রংশোত্তর যুগের রুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য কীর্তিলতাতে অপভ্রংশ-সুলভ 'দোহা' ও 'পাদাকুলক' ছন্দও আছে। আর একটি বিষয়ে কীর্তিলতার ছন্দ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশেষ মূল্যবান। এই কাব্যের কয়েকটি অংশ ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটক ছন্দে রচিত। বাংলা দেশে মধ্যযুগের আখ্যান-মূলক কাব্যে এই ছন্দ দুইটি পাওয়া যায়। কীর্তিলতা হইতে ভুজঙ্গপ্রয়াতের দৃষ্টান্ত :

ততো বে কুমারো পইট্ঠে বজারো।
জহিঁ লক্খ ঘোরা মতঙ্গা হজারো॥
কহীঁ কোটি গন্দা কহীঁ বাদিবন্দা।
কহীঁ দুরি রিক্কা বিএ হিন্দু গন্দা। (পৃঃ ৩৫)

তোটক ছন্দের নমুনা :

হসি দাহিন হত্থ সমত্থ তই।
রণরত্ত পট্টিঅ খগ্গ লই॥
তহিঁ এক্কহি একক পহার পলে।
জহিঁ খগ্গহিঁ খগ্গহিঁ ধার ধরে। (পৃঃ ৩৯)

অবহট্‌ঠ ছন্দ ও বাংলা

অবহট্‌ঠ ভাষা—উত্তর ভারতে অপভ্রংশোত্তর যুগে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রকার অপভ্রংশ-ধর্মী ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতে ইহা 'পিঙ্গল' নামে অভিহিত। পূর্ব ভারতে বোধ হয় এই শ্রেণীর ভাষাকেই অবহট্‌ঠ বলা হইত। বিদ্যাপতি তাঁহার কীর্তিলতায় অবহট্‌ঠ ভাষার জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

সক্কয়-বাণী বুহঅন ভাবই।
পাউঁঅ-রসকো মম্ম না পাবই।
দেসিল বঅনা সবজন মিট্‌ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পওঁ অবহট্‌ঠা। (পৃঃ ৪)

["পণ্ডিত লোকে সংস্কৃত ভাষা চিন্তা করেন। কেহই প্রাকৃত রসের মর্ম পায় না। দেশী বোলা সকলের কাছেই মিষ্ট লাগে, আর লোকে অপভ্রংশ ভাষাকেও তেমনি বলিয়া মনে করে"।]

অবহট্‌ঠ ছন্দ—দোহাকোষের বিভিন্ন সঙ্কলনে ও 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' অপভ্রংশোত্তর অপভ্রংশ ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। এই সাহিত্য প্রধানতঃ অপভ্রংশ ছন্দেই রচিত। পূর্ব ভারতে রচিত দোহাগুলিতেও অসম দোহাছন্দের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। ১৬ মাত্রার সমছন্দও এই সাহিত্যে সুলভ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

'দোহা' ছন্দ :

আখক্‌খর বাঢ়া সঅল জগু ণাহি নিরক্‌খর কোই।
তাব সে অক্‌খর ঘোলিআ জাব নিরক্‌খর হোই।

(সরহবজ্র, পৃঃ ১১৪)

১৬ মাত্রার ছন্দ :

মন্ত্র ণ তন্ত্র ন ধেঅ ণ ধারণ।
সব্ব বি রে বট বিব্‌ভম করণ ॥ (ঐ, পৃঃ ৯২)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছে। বহুবিধ আলোচনার অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই যে, গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য তাহা নহে। ইহাতে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কাব্যের অন্য কোন গুণ আছে কি নাই, তাহা বিচার না করিয়াও শুদ্ধ এই ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যই কাব্যটিকে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব, ইহার পুথির লিপি, ইহার লেখক, বাংলায় বৈষ্ণব মত-বিকাশের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান—এই সকল প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্যটির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্য-রূপ ও ছন্দ বিশ্লেষণ করিলেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব—বৃক্ষের মূল কাণ্ড তাহার শাখা প্রশাখার বিপুল সম্ভার বহন করিয়া স্বমহিমায় দণ্ডায়মান থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে এইরূপ একটি মূল কাণ্ডের সহিত তুলনা করা চলে। মধ্যযুগে বাংলায় দেবকেন্দ্রিক সাহিত্যের তিনটি শাখা দেখিতে পাওয়া যায় : (১) রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের পৌরাণিক আখ্যান, (২) বৈষ্ণব পদাবলী ও (৩) মঙ্গলগান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইহাদের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল জাতীয়

পৌরাণিক আখ্যান বলিতে পারি না, কারণ ইহা ভাগবতের অনুবাদ নহে। শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বাল্যলীলা ইহাতে নাই, এবং ভাগবতে বা পুরাণে এবং তাহার অনুকরণ করিয়া মধ্য বাংলার পৌরাণিক সাহিত্যে যে ভাবে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা অনুসৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঘটনা-বিন্যাসে লেখক সম্পূর্ণ পৃথক্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের সহিত ইহার সাদৃশ্যও আছে। এখানে লেখক পুরাণ-বর্ণিত গোপী লীলাই তাঁহার কাব্যের মূল উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক ও নায়িকা কৃষ্ণ ও রাধিকা, উভয়েই পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া কথা বলিতে ভালবাসেন। ইহার ফলে কাব্যের একটি পৌরাণিক পটভূমিকা রচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সনাতন ধর্মে বিশ্বাস ও আদর্শ-নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করাই পৌরাণিক সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই পৌরাণিক সুরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও অব্যক্ত হইলেও, ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে মধ্য বাংলার পৌরাণিক সাহিত্যের গোষ্ঠী-ভুক্ত করা না গেলেও, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যের সূচনা পাওয়া যাইতেছে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণীভুক্ত করা না গেলেও পদাবলীর পূর্বাভাষ ইহাতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে রাধার বিরহ বর্ণিত হয় না। মাথুর ও ভাবসম্মেলন পদাবলী সাহিত্যেরই বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট অংশ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাধা-বিরহের মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়। সেদিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীতে সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত পরবর্তী মঙ্গলগান গুলির সাদৃশ্যও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই কাব্যেও রাধা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপেক্ষা-মিশ্রিত সন্দেহ পোষণ করিতেন। এই উপেক্ষা ও সন্দেহ জয়

করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রধান প্রধান মঙ্গলগানের দেবতাদের ন্যায় ছল, বল, কৌশল—সব কিছুই অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, মঙ্গলচণ্ডী বা মনসাকে প্রায়ই কোন বিশ্বস্ত সখী বা ভক্তের মাধ্যমে নরনারীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াইকে দিয়া এইরূপ মধ্যস্থের কাজ করান হইয়াছে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' জাতীয় পৌরাণিক আখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলী বা মঙ্গলগান—ইহাদের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও, এই তিনটি শাখাই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে অপরিণত অবস্থায় নিহিত রহিয়াছে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের রস-বৃক্ষে যে-শাখা বিস্তার দেখা দিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে তাহার পূর্ববর্তী অবস্থার অর্থাৎ মূল কাণ্ডটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাহিত্যে বৈচিত্র্য সম্বন্ধে চেতনা জাগিলেও সে যুগের সাহিত্যে তখনও কোনরূপ বিশেষীকরণ (specialization) ঘটে নাই, অর্থাৎ মঙ্গলগীত, পদাবলী বা পৌরাণিক আখ্যান তখনও পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে পরিণত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলা সাহিত্যের এইরূপ একটি আদি যুগ-সুলভ নির্বিশেষ রূপ পাওয়া যাইতেছে। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরবর্তী সাহিত্যিক শাখাগুলির স্পষ্ট সূচনাও পাওয়া যাইতেছে। সেজন্য আরও সূক্ষ্মভাবে কাল নির্ধারণ করিলে বলিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি ও মধ্য যুগের সন্ধি-যুগে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে প্রাচীনত্বের নিদর্শন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। মধ্যযুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের পার্থক্য অনেক বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ-গোষ্ঠী হইতে সবে মাত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতির ছন্দকে বলা চলে ভঙ্গ-প্রাকৃত-গন্ধী শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ, আর শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্তনের ছন্দ শুদ্ধপ্রাকৃত-গন্ধী ভঙ্গপ্রাকৃত ছন্দ। মধ্য যুগের পয়ার-জাতীয় ছন্দে ভঙ্গপ্রাকৃত-বর্জিত উচ্চারণ অল্প পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে এই শ্রেণীর দীর্ঘ উচ্চারণ অত্যন্ত সুলভ। অবশ্য ইহাতে হ্রস্ব বা হ্রস্বীকৃত অক্ষরের সর্বময় প্রয়োগও অত্যন্ত সুলভ। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেই আদর্শ ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেমন,

তোহ্মে জবে যোগী হৈলা | সকল তেজিএ্যা।
থাকিব যোগিনী হএ্যা | তোহাঁক সেবিএ্যা ॥
না যাইবোঁ ঘর আর | তোহ্মাক ছাড়িএ্যা।
বড় দুখ পাইলোঁ তোর | বিরহে পুড়িএ্যা ॥
পরাণে না মার মোরে | দেব গদাধরে।
তিরিবধ ভয় কেহ্নে | নাহিক তোহ্মারে ॥

অথবা,

শুণহ নাতিনী রাহী হাঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈল আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন
গেলা দূর মথুরা নগরী ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ হইতে আদর্শ ভঙ্গ-প্রাকৃত পংক্তি উদ্ধৃত করিতে হইলে বহু অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। মধ্য যুগের ছন্দে আদর্শ ভঙ্গ-প্রাকৃতের দৃষ্টান্ত অনেক বেশী সুলভ। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ ইহার জন্মগত শুদ্ধ-প্রাকৃত প্রকৃতি এখনও ভাল ভাবে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সেজন্য অক্ষরের শুদ্ধপ্রাকৃত-সুলভ তৎসম প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন,

বা-সিত ফুলে রাধা | বা-ন্ধসি কেশ।
আহ্মাত না পাত রাধা | না-গরী বেশ ॥
ভা-ঙ ভাঁগিআঁ তোর | খা-ইবোঁ দহী
পড়িযাউ আসি তোর | আইহন কহী ॥

অথবা,

দে-বা-সুর নর ঈ-শ্বর
কাহ্নের না ভাঁগে আশে।
বাসলী চরণ শিরে ব-ন্দিঅ।
গাইল (=গাল্য) বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

এইরূপ রীতি-মিশ্রণ পরবর্তী যুগ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অধিক সুলভ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার-ত্রিপদীর রূপ মোটের উপর সুগঠিত হইলেও, গঠন-শৈথিল্য বহু স্থানে পাওয়া যায়। পয়ার ও ত্রিপদীর এই গঠন-শৈথিল্য প্রাচীনত্বের নিদর্শন। এই সকল শিথিল প্রয়োগ ১৯শ শতকের কাব্যেও কখনও কখনও পাওয়া যায়, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু পয়ার চরণে মাঝে কোন যতি পড়ে না। চর্যার বা বিদ্যাপতির ছন্দে অনেক সময় ষোড়শ মাত্রিক পংক্তিতে কোনরূপ পর্ব বিভাগ থাকে না। ঐসকল ক্ষেত্রে অপভ্রংশের সংস্কার বশে সমগ্র পংক্তি একটি ইউনিট রূপে গণ্য করা হইত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এইরূপ পংক্তি-পর্বিক পয়ার চরণ পাওয়া যায়। এই সকল চরণে গদ্যের আভাস রহিয়াছে। যেমন,

ভার বহিব তাত না করিব মো আনে ॥

৮+৬-এর পরিবর্তে ৬+৮ বা ৭+৭-এর পর্ব-সমাবেশও ইহাতে পাওয়া যায়। যেমন,

(১) সত্তরে পশিলা | সাগরের জল মাঝে। (৬+৮)
(২) তার পাছে জমল | অর্জুন পাঠায়িল। (৭+৭)
(৩) কণ্ঠদেশ দেখিয়া | শঙ্খত হৈল লাজে। (৭+৭)

এইরূপ ৭+৭-এর পর্ব-সমাবেশের সহিত তুলনীয় ভারতচন্দ্রের

নখে নখ বাজায়ে | নারদ মুনি হাসে।

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে ৮ মাত্রার পর্ব ২+৩+৩ বা ৩+২+৩ পর্বাঙ্গ দ্বারা গঠিত হইলে ভাল শুনায় না। কারণ মূল অপভ্রংশ ছন্দের সম-চলন অর্থাৎ ৪ ও ৮ মাত্রার চলন ইহাতে ব্যাহত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ প্রয়োগ খুব বেশী। একটি দৃষ্টান্ত,

তাক : সুঁঅরী : দৈবকী | কাঁপে বড় ডরে

বা, কংসের : বধ : কারণ | অতি মহাবীর

বা, তোর মুখে শুনি | রাধিকার রূপ | আওর : নব : যৌবনে

আর একটি বিষয়ে মধ্য যুগের বাংলা কাব্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আদি যুগের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। মধ্য যুগের কাব্যে ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু যে রচনাংশকে পয়ার বা ত্রিপদী নামে অভিহিত করা হইত তাহা নহে—ইহা পরবর্তী পুথিলেখকগণের প্রক্ষেপ হইতে পারে—কিন্তু অনেক সময় লেখক নিজেই রচনার মধ্যে পয়ার ও লাচাড়ি (ত্রিপদী), ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত ইহাকেই আমরা মধ্য যুগের প্রথম গ্রন্থ বলিয়া জানি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কবি লিখিয়াছেন :

ভাগবত-অর্থ যত 'পয়ারে' বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥

পয়ারের এই উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়, অপভ্রংশ যুগ হইতে প্রচলিত এক শ্রেণীর মাত্রাছন্দ এই যুগে এতখানি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছিল যে নূতন ভাবে এই সকল ছন্দের নামকরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িল। আদি যুগে রচিত কোন কাব্যেই ছন্দের নাম নাই। শুধু রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাগ ও তালের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে ছন্দের কোন উল্লেখ নাই। বাংলা দেশে মধ্য যুগের বাংলা রচনাতেই ছন্দ উল্লেখ করার রীতি প্রবর্তিত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে-সময়ে রচিত হইয়াছিল,

তখন হয় বাংলা ছন্দের গঠন ও নাম নির্দিষ্ট হয় নাই, নতুবা তখনও ছন্দের নাম উল্লেখ করার পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও অক্ষরছন্দ—বাংলা ছন্দকে অক্ষর-নির্ভর করিবার চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য কবি অনেক সময় বিপ্রকর্ষ বা স্বরাগম দ্বারা অক্ষর-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। উপরের একটি দৃষ্টান্তে দেখা যায়, 'স্ত্রীবধ' না লিখিয়া কবি 'তিরিবধ' ব্যবহার করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে 'কাহ্নাঞি' ও অন্যান্য যৌগিক স্বরান্ত শব্দ মাত্রা-সঙ্কোচন দ্বারা উচ্চারণ করা হইয়াছে। এই কাব্যে শব্দ-মধ্য যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরও প্রায়ই এক মাত্রায় উচ্চারণ করা হয়। একটি দৃষ্টান্ত :

সুগন্ধি কেতকী সম | সাজাইআ দহী।
আনাআঁা বানাল্য সব | গোয়ালিনী সহী॥

আবার, যে সকল ছন্দ খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকৃতে পরিণত করা সম্ভব নহে, সেখানেও তিনি হ্রস্বীকৃত অক্ষর ব্যবহার করিয়া ছন্দটিকে অক্ষর-বৃত্তে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একাদশ-মাত্রিক একাবলী ছন্দের কথা বলা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির কাব্যে এই ছন্দের শুদ্ধ-প্রাকৃত রূপটি পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হ্রস্ব বা হ্রস্ব-কৃত ১১টি অক্ষর দ্বারা এই ছন্দ রচনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক কাল পর্যন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়া 'একাবলী' অক্ষর-ছন্দ রূপেই গণ্য হইয়া আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু গীতে 'একাবলী' ছন্দ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত :

আয়িলা দেবের | সুমতি শুনী।
কংসের আগক | নারদ মুনী॥
পাকিল দা-ঢ়ী | মাথার কেশ।
বামন শরীর | মাকড় বেশ॥

অথবা,

"সুন্ধ সুবন্নের | মোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর | ধরহ বাণী ॥"
"গোআলিনী আহ্মে | নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ | তোর কিঙ্কিনী ॥"

সাত মাত্রার 'গণ'-গঠিত ছন্দকেও অক্ষর-নির্ভর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পরে উদ্ধৃত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-বৈচিত্র্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটিও দেশজ ছন্দ নাই। ইহাতে শুদ্ধ-প্রাকৃত ও ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের নানা প্রকার প্যাটার্ণ পাওয়া যায়। 'সপ্তকল' ছন্দগুলি স্পষ্টতঃ শুদ্ধ-প্রাকৃত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। লঘু ত্রিপদী জাতীয় 'ষট্‌কল' ছন্দেও ভঙ্গ-প্রাকৃত অপেক্ষা শুদ্ধ-প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যই অধিক পাওয়া যায়। 'একাবলী' ছন্দের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল ছন্দ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত ছন্দই ভঙ্গ-প্রাকৃত পদ্ধতিতে রচিত। তবে উভয় শ্রেণীর ছন্দেই রীতি-মিশ্রণ পাওয়া যায়। কোন কোন 'সপ্তকল' প্যাটার্ণের উপর জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যাপতির ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসও সমিল এবং অমিল ত্রিপদী রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ প্রধানতঃ সমপদী হইলেও ইহাতে বহু অসম ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী এবং একাবলীর দৃষ্টান্ত পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি প্যাটার্ণের নমুনা :

'সপ্তকল' ছন্দ—

কাহ্নাঞির হাথে পড়ো | সুন বড়ায়ি ল-
মো-এঁ হারাইলোঁ | বুধী।
উদ্ধার পাইএ যেন | সুন বড়ায়ি ল-
তো-হ্মে চিন্ত সেহী | বুধী ॥

এখানে 'শুন বড়ায়ি ল' ষট্‌কল-পর্ব রূপেও গণ্য হইতে পারে। এই প্যাটার্ণটির সহিত তুলনীয়ঃ

কিং করিষ্যতি | কিং বদিষ্যতি | সা চিরং বির -হেণ

(জয়দেব)

এবং

পহিলি পী-রিতি | পরাণ আঁ-তর |
তখনে ঐ-সন | রীতি। (বিদ্যাপতি)

বড়ু চণ্ডীদাসের আর একটি 'সপ্তকল' ছন্দঃ

বল না কর মোরে | কাহ্নাঞি ল |
(আ'ল) বচন আ-হ্মার | শুন
দে-ব ধরম কি | সহিব তোরে |
এহাত হৃদয়ে- | গুণ

এখানে 'সহিব তোরে' বা 'কাহ্নাঞি ল'—এই দুইটি পর্ব সম্প্রসারিত করিয়া সপ্তমাত্রিক করা অপেক্ষা ইহাদের পঞ্চমাত্রিক আবৃত্তিই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে এই প্যাটার্ণের সহিত তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের

কোশল নৃপতির | তুলনা নাই
জগৎ জুড়ি যশো | -গাথা।

এইভাবে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের প্রথম স্তরে যে-প্যাটার্ণটি সমপর্বিক ছিল, দ্বিতীয় স্তরে তাহাই অসম-পর্বিক প্যাটার্ণে পরিণত হইল।

আর এক প্রকার 'সপ্তকল' ছন্দঃ

ডালি ভরায়া ফুল | পানে।
তোরে পাঠাঅ। দিল | কাহ্নে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেক স্থলে যুক্ত-বর্ণাশ্রিত মহাপ্রাণ-ধ্বনি উচ্চারণ করা হইতে না, উপরের দৃষ্টান্তে 'কাহ্নে' ও 'পানে'র মিল হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

৮ মাত্রার একপদী ছন্দ :

(১) আমি দেব শ্রী-হার। মথুরাতে অবতরি ॥
আমি সে সৃজিল দান। আমারে জুড়সি মান ॥
(পরিশিষ্ট)

১০ মাত্রার একপদী, "দিগক্ষরা" :

অতি বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে।
জাইতে (জাত্যে) নারোঁ ত্বরিত গমনে ॥
পথ হারাইলোঁ বৃন্দাবনে।
তোহ্মাক তেজিলোঁ তে কারণ ॥

১১ মাত্রার দ্বিপদী ; পর্ব সমাবেশ, ৮+৩

উচিত বচন শুন | মুরারি।
ভা-র বহিলোঁ নেহ | মজুরী ॥
আন কাম আহ্মে করি | -তেঁ নারী
এবার থাকউ মন | নেবারী ॥

১৬ মাত্রার অমিল দীর্ঘ-ত্রিপদী :

হা-র কেয়ূর আর | যত আভরণ সব।
নিলে কা হ্নাঞি মোর বলে।
যতেক যতেক তার | আছিল : মনে : সন্তাপ
সুঝায়িল নিকু-ঞ্জ তলে ॥

অসম-পর্বিক ত্রিপদী : [৬+৪ অথবা (৫, ৬)+৮]

চির দিন মথু | -রাক না জাহা ল |
কেহ্নে নঠ কর দহী।
গোআল জরম | আহ্মে শুণ |
দধি দুধে উতপতী।
এবে তাক উপে | -খহ কেহ্নে |
তোর ভৈল কি কুমতী।

মিশ্র দ্বিপদী; [৮+৬ ; ১০] :

তোর মুখে রাধিকার | রূপ কথা শুনি।
ধরিবাক না পারেঁ। পরাণী ॥
দারুণ কুসুম শর | সুদৃঢ় সন্ধানে।
অতিশয় মোর মন হানে ॥

অসম পংক্তিক দ্বিপদী , [৮+৮ ; ৬+৮]

আল) এ তোর : আড় নয়নে | পাঞ্জর বেধিল ঘুণে।
পাঞ্জর বেবিআঁ | বুকত লাগিল ঘুনে ॥
এবে দেহ চুম্ব দানে | আর দেহ মধুপানে।
আলিঙ্গন দিয়া | বারেক তোষহ মনে ॥

স্তবক বৈচিত্র্য : তিন চরণের স্তবক—

এবে তোহ্মার বিরহে I —ক
মোর আকুল দেহে I —ক
আহ্মাক তেজিতে তোর | উচিত নহে —ক

ছয় চরণের স্তবক :

সাহু নিষেধিল মোরে বালী, (ল বহু) I —ক
দধি বিকে না জাইহ কালী I —ক
উ- বোলি না জাইহ | মথুরার হাটে I —খ
ভা-ও ভাগিব তোর কাহ্নু, I —গ
দধি- খাইব তোর আনে, I —গ
রাজ ভাগিনা বল | করিব তোরে বাটে ॥ I —খ

[১০ ; ১০ ; ৮+৬ ; ১০ ; ১০ ; ৭+৭]

আর এক প্রকার ছয় চরণের স্তবক :

কাল হা–ণ্ডির | ভাত না খাও।
কা-ল মেঘের | ছায়া নাহি রাও
কালিনী রাতি মোঁ। | প্রদীপ জালিআঁ। | পোহাও।
কা-ল গাইর | ক্ষীর নাহি খাও
কা-ল কাজল | নয়নে না লও
কা-ল কাহ্নাঞি | হো-ক বড় | -রাও।

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ দান' কবিতাটির স্তবক গঠন তুলনীয় :

প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি,
অনাথ পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ | নিনাদে ;
সদ্য মেলিতেছে | তরুণ তপন,
আলস্যে অরুণ | সহাস্য লোচন,
শ্রাবস্তী পুরীর | গগন-লগন | প্রাসাদে।

এই সকল ছয় চরণের স্তবকে তৃতীয় ও ষষ্ঠ চরণে মিল ব্যবহৃত হওয়ায় ত্রিপদী যুগ্মকের আভাস পাওয়া যায়।

বড়ু চণ্ডীদাস যে কিরূপ কলা-নিপুণ কবি ছিলেন, তাহা বুঝিবার পক্ষে উপরে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই যথেষ্ট। এরূপ বৈচিত্র্য ও কারুকার্য বাংলা সাহিত্যে অল্প কয়েকজন কবির রচনাতেই পাওয়া যাইবে। সংস্কৃত ও অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ্‌ সাহিত্যের সহিত নিবিড় পরিচয় এবং মাতৃভাষায় দক্ষতা না থাকিলে এরূপ ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব নহে।

আদি যুগে মিত্রাক্ষর ও স্তবক

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বাংলা-ছন্দের উপাদান চারটি—(১) অক্ষর-মাত্রা, (২) পর্ব (পদ), (৩) চরণ ও (৪) স্তবক। আদি যুগের ছন্দ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে যে সকল কথা আলোচিত হইল, তাহা হইতে ছন্দের

প্রথম তিনটি উপাদান সম্বন্ধে আদি যুগের বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে। এবার আমরা আদি যুগে ছন্দের মিল ও স্তবক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মিত্রাক্ষরতা—সংস্কৃত সাহিত্যে মিত্রাক্ষরকে অর্থাৎ ধ্বনি-সাম্যকে 'অলঙ্কার' বলিয়া গণ্য করা হইত। মিত্রাক্ষর যমক-অনুপ্রাসের উপজীব্য। বৃত্তছন্দে তাহার কোন স্থান ছিল না। অপভ্রংশ ছন্দেই প্রথম মিত্রাক্ষরতাকে ছন্দের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এবং পরবর্তী প্রাদেশিক সাহিত্যে এই নূতন ছন্দ-লক্ষণ প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। সেজন্য আদি যুগের বাংলা ছন্দ আলোচনা কালে মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

জয়দেবের কাব্যে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই কাব্যে ব্যবহৃত 'মিল' গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে. অপভ্রংশ-যুগের মিত্রাক্ষরতার সহিত যাহাকে বাংলায় 'মিল' বলা হয়, তাহার পার্থক্য কোথায়। সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে অব্যয় ব্যতীত অন্যান্য শব্দে বিভক্তি যুক্ত হয়। প্রাক্-বাংলা ভাষাগুলিতে বাক্যে বিভক্তিহীন শব্দের সংখ্যা অল্প। সেজন্য ঐ সকল ভাষায় মিল ব্যবহার করিতে হইলে বিভক্তিযুক্ত শব্দেই ধ্বনি-সাম্য দেখাইতে হইবে। বিভক্তি-যুক্ত শব্দে ধ্বনি-সাম্য আনা সহজ। যেমন দ্বিতীয়ার একবচনে 'ং' ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'লোচনং', 'চঞ্চলং', 'উদরং', প্রভৃতি দ্বিতীয়া বিভক্তি-যুক্ত শব্দে মিল দেখাইয়া কবিতা রচনা করা যাইতে পারে। ক্রিয়াপদের বিভক্তিকেও মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন, 'করোতি', 'উপযাতি', 'নিদহাতি'। বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। বিভক্তি-হীন শব্দই বাংলা বাক্যগুলিতে অধিক ব্যবহৃত হয়। সেজন্য বাংলা ছন্দে মিত্রাক্ষর বলিতে শব্দেরই মৈত্রী বুঝায়। এখানে শব্দের মৌলিক ধ্বনি-সাম্যই দুইটি শব্দকে স্বাভাবিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। বিভক্তির সহায়তায় বহিরঙ্গ মিলনের চেষ্টা করা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে প্রকৃত 'মিল' পাওয়া গেলেও, সে যুগে উত্তম, মধ্যম ও অধম মিলে কোন ভেদ ছিল না। শব্দান্ত ব্যঞ্জন অক্ষরের মিল থাকিলেই হইল। উপান্ত স্বরে বা ব্যঞ্জনেও সাম্য আছে কি না, তাহা দেখা হইত না। সেজন্য 'কথা' ও 'মাথা', 'প্রাণ' ও 'ধন' মিল রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। বিভক্তি-ঘটিত মিলও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সুলভ। তাহা সত্ত্বেও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় মিল অধিকাংশ স্থলে বেশ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মিলগুলি পরীক্ষা করিলে সে যুগের উচ্চারণ সম্পর্কিত কয়েকটি কথা জানিতে পারা যায়। 'হ' ও 'এ' তখন ব্যঞ্জন রূপে লিপিবদ্ধ হইলেও, প্রকৃত উচ্চারণে ইহাদের ব্যঞ্জনত্ব প্রায় ক্ষেত্রে লোপ পাইয়াছিল। সেজন্য 'জায় রাহী'র সহিত 'সুন্দর কাহ্নাঞি'র মিল দেওয়া হইয়াছে। 'ন' ও 'ণ' এবং 'শ', 'ষ' ও 'স'-কে পৃথক্ ধ্বনি বলিয়া মনে করা হইত না। 'ব' ও 'ল'-কে 'মিত্রাক্ষর' রূপে গণ্য করা হইত। তাই, 'যমজ পোঁআর'-এর সহিত 'বরুণের জাল' মিলানো হইয়াছে। একই বর্গের বিভিন্ন ধ্বনিও মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'দেহ দধী ঘৃত দান যত হএ লেখে। পসারের দান দিয়া যাহা একে একে॥' সেইরূপ, 'শঙ্খত তৈল লাজে'র সহিত 'সাগরের জল মাঝে'র এবং 'দশনের ঘাত'-এর সহিত 'গোপীনাথের'-এর মিল দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একই বর্গের অঘোষ ও ঘোষবৎ ধ্বনিগুলি এবং মহাপ্রাণ-বর্জিত ও মহাপ্রাণ-যুক্ত (বিশেষ করিয়া অঘোষ মহাপ্রাণ) ধ্বনিগুলি তখনও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত। সেজন্য এই সকল ধ্বনির মিল আদি যুগের ছন্দে অল্পই পাওয়া যায়। মধ্য যুগের উচ্চারণে ধ্বনির 'ক্ষয়' বৃদ্ধি পায়, সেজন্য ঐ যুগে একই বর্গের বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে মিলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

আদি যুগে স্তবক—অপভ্রংশ ছন্দে নানা প্রকার স্তবক পাওয়া গেলেও দুই চরণের গুচ্ছ বা 'যুগ্মক' ঐ যুগে প্রাধান্য লাভ করে। বাংলা ছন্দেও যুগ্মকের প্রচলন খুব বেশী, ইহা আদি যুগ হইতেই লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে ত্রিপংক্তিক ও ষট্‌পংক্তিক স্তবকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুগ্মকের তুলনায় বিভিন্ন স্তবক-রচিত পদ্যের সংখ্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অত্যন্ত অল্প।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ইতিহাস

মধ্য যুগ

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা—এই যুগ ১৪৫০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং শুদ্ধ-প্রাকৃতের সহিত ইহার পার্থক্য স্ফুটতর হয়। শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ প্রধানতঃ বৈষ্ণব গীতি কবিতায় এবং ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ প্রধানতঃ আখ্যান-মূলক মহাকাব্যগুলিতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই যুগেই পয়ার-ত্রিপদীর উৎকর্ষ-বিধান এবং নানা প্রকার দ্বিপদী ও চৌপদীর প্রচলন হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া পর্ব-গঠনে বৈচিত্র্য দেখা দেয় ও নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি হইতে থাকে। এই যুগেই মিলের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু মিল এখনও ছন্দের বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য। ছন্দের বন্ধন-মুক্তি ও গদ্যের পূর্বাভাষ এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই যুগে গোবিন্দদাস শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের, ভারতচন্দ্র ভঙ্গ-প্রাকৃত ও শুদ্ধ তৎসম ছন্দের এবং রামপ্রসাদ দেশজ ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি। ব্রজবুলির ছন্দে

জয়দেব ও বিদ্যাপতির এবং লোচনের ধামালীতে ছড়ার ছন্দের অনুসরণ হয়। ছন্দালোচনার সূত্রপাত এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

মধ্য যুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ

আদি যুগে অপভ্রংশ-ধর্মী শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ প্রধান ছিল ; মধ্য যুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত-ছন্দ প্রাধান্য লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে যে পরিমাণ রীতি-মিশ্রণ এবং পর্ব ও পর্বাঙ্গ-গঠনে শৈথিল্য দেখা যায়, মধ্য যুগে তাহা হ্রাস পায়। তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য হইতে সুগঠিত ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এখন মধ্য যুগের কয়েকটি নূতন ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দোবন্ধের কথা আমরা আলোচনা করিব।

একপদী ছন্দ—আদি যুগে আট ও দশ মাত্রার পর্ব দ্বারা একপদী ছন্দ রচিত হইত। মধ্য যুগেও তাহাই হইতে লাগিল। এই যুগে কোন কোন কবির রচনায় 'ষট্‌কল' একপদীও পাওয়া যায়। যেমন,

তবে গোপীগণ : হইল বিমন ॥
কবিচন্দ্র ভণে। গোবিন্দ চরণে ॥

দ্বিপদী ছন্দ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভঙ্গ-প্রাকৃত দ্বিপদী ছন্দে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু মধ্য যুগে পয়ার ছন্দ (৮+৬=১৪ মাত্রা) ব্যতীত আরও নানা প্যাটার্ণের ভঙ্গ-প্রাকৃত দ্বিপদীর প্রচলন হয়। মুকুন্দরাম পয়ারের সহিত মিশাইয়া ৮+৮=১৬ মাত্রার দ্বিপদী চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন,

নিদারুণ মাঘ মাস | নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব জন নিরামিষ | কিংবা উপবাস ॥

("ফুল্লরার বারমাস্যা")

"রামলীলা গ্রন্থ পয়ার" নামক একখানি অপ্রকাশিত পুথিতে ৬+১০ মাত্রার দ্বিপদী ছন্দ পাওয়া যায়:

গত বৃন্দাবনে | বৃক্ষবল্লী প্রফুল্ল হইল।
সব জল স্থলে | সহস্র চন্দ্রিকা প্রকাশিল ॥
বহে গন্ধ বায়ু | পুষ্প গন্ধ সহ প্রতি বনে।
বৈসে প্রতি পুষ্পে | মধুকর মত্ত মধুপানে ॥

(বা, প্রা, পু, বি, ২, ১, পৃঃ ৬৩)

ভারতচন্দ্র পয়ার পংক্তির শেষে বা প্রথমে অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহার করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন,

(১) সরোবরে স্নান হেতু | যেয়ো না লো যেয়ো না।
কমল কানন পানে | চেয়ো না লো চেয়ো না।

(২) যথা চাতকিনী কুতকিনী | ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী | হিমাংশু মিলনে ॥

ত্রিপদী ছন্দ—মধ্য যুগের প্রথম ভাগে কবিগণ লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ প্রায়ই মিশাইয়া ফেলিতেন। মাত্রা-সম্প্রসারণের ন্যায় এই পর্ব-মিশ্রণও ত্রিপদী ছন্দের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। তবে ১৬-১৭শ শতকের প্রধান প্রধান কবিদের রচনায় লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদীর স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষে রচিত বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলেও সুগঠিত ত্রিপদী ছন্দ পাওয়া যায়। তবে মধ্যযুগের প্রথম ভাগে লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদীর মিশ্রণ সুলভ। মুকুন্দরামের একটি মিশ্র ত্রিপদী:

বিষম করাল রাঘব ঘোষাল
করবাল মারে বীরের অঙ্গে।
বীরের অঙ্গে করবাল ভাঙ্গে
স্বর্গে ত্রিপুরা হাসে রঙ্গে।
রণ করে যুবরাজ সেনাপতি পায় লাজ
বাজ শরাসন পুরে।
উভারে বীরে বীরে চর্ম ধরে
চর্মের উপরে ঘুরে ॥

জয়দেবের ছন্দে সমিল ত্রিপদীর সূত্রপাত হইয়াছিল। মধ্যযুগে সমিল ত্রিপদী পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। তবে এই যুগে অমিল ত্রিপদীও পাওয়া যায়। যেমন,

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো
একদিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো
হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে॥
(নরহরি)

মধ্য যুগে ত্রিপদীর সহিত একপদী মিশাইয়া কবিতা রচনা করার রীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এইরূপ মিশ্রণ অল্প কয়েক স্থলে পাওয়া যায়। এই রীতি বিদ্যাপতির বিশেষ প্রিয় ছিল। তুলনীয়:

(১) মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
(বি ্যাপতি)

(২) কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল
মোঞ নারী বড় অভাগিনী॥
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

(৩) প্রাণনাথ, সিংহল গমনে নাহি সাধ।
ঘরের চন্দন শঙ্খ দিয়া হও নিরাতঙ্ক
রাজস্থানে পাইবে প্রসাদ॥
(মুকুন্দরাম)

চৌপদী ছন্দ—বাংলা ছন্দে অষ্টাদশ শতকের কবিদের শ্রেষ্ঠ দান ভঙ্গ-প্রাকৃত চৌপদী ছন্দ। শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে চৌপদী ছন্দোবদ্ধ পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ভঙ্গ-প্রাকৃত চৌপদী ১৮শ শতকের কবিদের লেখনী মুখেই নিখুঁত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ভারতচন্দ্রের রচনায় নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর চৌপদী ছন্দ পাওয়া যায়।

মধ্য যুগের প্রথম ভাগে ১৬ মাত্রার দ্বিপদী রচনা করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্যাটার্ণ তেমন শ্রুতি মধুর হয় নাই। অষ্টকল দ্বিপদীকেই সম্প্রসারিত করিয়া ভারতচন্দ্রের যুগে অষ্টকল চৌপদী সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তুলনীয় ভারতচন্দ্রের

নয়ন চকোর মোর | দেখিয়া হ'য়েছে ভোর |
মুখ-সুধাকর-হাসি | -সুধায় বাঁচাও হে।
নিত্য তুমি খেল যাহা | নিত্য ভাল নহে তাহা |
আমি যে খেলিতে কহি | সে খেলা খেলাও হে ॥

ভারতচন্দ্রের ষট্‌কল চৌপদী—

নিদ্রার আবেশে | রজনীর শেষে |
মনোহর বেশে | বঁধুয়া আসিয়া।
প্রেম পারাবার | করিল বিস্তার |
নাহি পাই পার | যাই ভাসিয়া ॥

ভারতচন্দ্রের চৌপদী ছন্দ পরবর্তী কালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, বিহারীলাল প্রভৃতি সকলেই ভারতচন্দ্রের চৌপদী ছন্দ অনুকরণ করিয়াছিলেন।

মধ্য যুগে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ

পূর্বী অপভ্রংশ ধারা—অপভ্রংশ ছন্দের দুইটি ধারার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে দোহা ছন্দের ধারা প্রসার লাভ করে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে অপভ্রংশের মাত্রাসমক ছন্দই অধিক সমাদৃত হয়। চর্যাপদের কবিগণ দোহা ছন্দ একেবারে বর্জন করেন নাই। তবে মাত্রাসমক ছন্দই চর্যায় অধিক। জয়দেবের কাব্যে খাঁটি বাঙালী রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নূতন নূতন অসম-পংক্তির ছন্দ রচনা করিলেও, প্রাচীন আর্যার গোষ্ঠী-ভুক্ত অসম-পংক্তিক দোহা ছন্দ তাঁহার

কাব্যে একটিও নাই। মধ্য যুগের বাঙালী কবিদের রচনাতেও মাত্রাসমকের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখা যায়। ২৮ মাত্রার জয়দেবী ছন্দও তাঁহাদের বিশেষ প্রিয় ছিল। তাহা ছাড়া, পঞ্চকল ও সপ্তকল ছন্দেও বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা এই যুগের কবিগণ রচনা করেন। 'একাবলী' এই যুগের আর এক প্রকার জনপ্রিয় ছন্দ।

ব্রজবুলি ভাষা—বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা বর্ণিত হওয়ায় ঐ সুমধুর পদগুলি বাংলা দেশে বিশেষ প্রসার লাভ করে। বাঙালী কবিগণ ঐ সকল পদের অনুকরণে কবিতা রচনা করিতে বসিয়া এক নূতন কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করেন। ইহারই নাম ব্রজবুলি। এই ভাষায় রচিত গীতগুলিতেই শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। সেজন্য এই মিশ্র-ভাষার গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এই ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—অধিকাংশ ক্ষেত্রে ষষ্ঠীতে -র ও সপ্তমীতে -হি ব্যবহার, অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ায় যথাক্রমে বাংলা -ইল, -ইব বিভক্তির পরিবর্তে মৈথিলী -অল, -অব প্রয়োগ, সমাসের বাহুল্য এবং ধ্বনির তৎসম উচ্চারণপ্রবণতা। ব্রজবুলির শব্দ-ভাণ্ডার সংস্কৃত. বাংলা ও মৈথিলী উপাদানে গঠিত।

ব্রজবুলি পদগুলির ভাষা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে — (১) মৈথিলী-প্রধান, (২) বাংলা-প্রধান ও (৩) সংস্কৃত-প্রধান। বিদ্যাপতির পদগুলি মৈথিলী-প্রধান ব্রজবুলিতে রচিত। আদিতে ইহার সবটাই ছিল মৈথিলী। বাঙালীদের মুখে মুখে ইহাতে বাংলা শব্দও সংযোজিত হয়। ফলে এক নূতন কৃত্রিম মিশ্রভাষা সৃষ্ট হয়। মৈথিল-প্রধান ব্রজবুলিতে অনেক বাঙালী কবি পদ রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রাধামোহনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক কবি অধিক বাংলা ও অল্প-মৈথিলী ব্যবহার করিয়া ব্রজবুলি গীত রচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক সময় ইহারা একই পদে ব্রজবুলির সহিত

বিশুদ্ধ বাংলা ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের বহু পদে বাংলা প্রধান ব্রজবুলি পাওয়া যাইবে। গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদগুলির ভাষা স্বতন্ত্র শ্রেণীর! তিনি সংস্কৃত বহুল ভাষায় এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন। ভাষায় সমাস-বাহুল্য ও ছন্দে তৎসম উচ্চারণ-প্রবণতা তাঁহার রচনার দুইটি প্রধান রূপগত বৈশিষ্ট্য।

মধ্য যুগে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ—মধ্য যুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত শৈলীর ছন্দ প্রাধান্য লাভ করিলেও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের প্রতিষ্ঠা এযুগে এতটুকু হ্রাস পায় নাই। জয়দেবের ও বিদ্যাপতির ছন্দাদর্শে এযুগের কবিগণ বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন, এবং শুধু ব্রজবুলি সাহিত্যে নহে, এযুগের আখ্যান-মূলক বাংলা কাব্যগুলিতেও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে রচিত পদ সুলভ।

মধ্য যুগে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের গঠনে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা না দিলেও ধ্বনির তৎসম উচ্চারণের দিক দিয়া কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অপভ্রংশ ছন্দে উচ্চারণ-শৈথিল্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মধ্য যুগের কবিগণ বাংলা ভাষায় অপভ্রংশ ছন্দ অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিলে এই শৈথিল্য স্বভাবতঃই আরও বৃদ্ধি পায়। গোবিন্দদাস তাঁহার ব্রজবুলি পদগুলিতে তৎসম শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। সেজন্য উচ্চারণ-শৈথিল্য তাঁহার রচনায় অপেক্ষাকৃত কম। তাঁহার পদগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দগুলিতে স্বর-ধ্বনির প্রাচীন হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তদ্ভব শব্দে প্রায় সমস্ত একক স্বরধ্বনিই হ্রস্ব। অন্যান্য কবিদের ব্রজবুলি রচনায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন নিয়ম বাহির করা কঠিন। সুপণ্ডিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও পদাবলীর ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষরের নিয়ম বলিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন: "কোন্ স্থলে ঐ অক্ষরগুলি লঘু ও কোন্ স্থলে গুরু

পাঠ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা অসম্ভব” (প, ক, ৫ম, পৃঃ ২৪৪)।

মধ্য যুগে ২৮ মাত্রার জয়দেবী ছন্দ ও ১৬ মাত্রার 'পাদাকুলক' বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তাহা ছাড়া, ৪, ৫ ও ৭ মাত্রার গণ-গঠিত বিভিন্ন ছন্দোবন্ধও এই যুগে কবিদের রচনায় পাওয়া যায়। পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের আলোচনায় তাহা দেখান হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, আদি যুগ অপেক্ষা এই যুগের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে পর্ব-বিভাগগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের সাহায্যে এই বিভাগ স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। যেমন, “রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্”—এই ভাবে ২৮শ মাত্রার একটি পংক্তিকে মিত্রাক্ষরের দ্বারা ছোট ছোট তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করার রীতি জয়দেবের কাব্যেই পাওয়া যায়। মধ্য যুগে এই রীতি প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য অপভ্রংশ-সুলভ মিত্রাক্ষর-বর্জিত অভঙ্গ পংক্তিও অনেক কবির রচনায়, বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাসের পদাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন,

> জলদহি জলদ বিজুরি দিঠি তাপক,
> মরকত কনক কঠোর।
> এ দুহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন,
> নিরুপম নওল কিশোর॥

অথবা রাধামোহনের

> সম-বয়-বেশ-ভূষণ-ভূষিত তনু,
> সখিগণ সঙ্গহি মেলি।
> গজপতি নিন্দি গমন অতি সুন্দর,
> কিয়ে জিত খঞ্জন কেলি॥

মধ্য যুগে রচিত বাংলা পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। পাদাকুলক হইতে উদ্ভূত এক প্রকার ৪+৪+৪+৩=১৫ মাত্রার ছন্দ এই যুগে পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইহার সহিত ৮+৬=১৪ মাত্রার পয়ার ছন্দের সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। তুলনীয়ঃ

(১) ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কতহুঁ রমণী-মন-মীন॥
শ্রবণে মকর গিমে কম্বু বিরাজ।
তিমি মাহা লাখমী মিলিত মণি-রাজ॥ (গোবিন্দদাস)

(২) দেখি সব সখিগণ দুহুঁজন প্রেম।
কত ইহ যৈছন লাখবান হেম॥
বা-হু পসা-রি- রাই করু কোর।
না-গর নিজ করে মোছই লোর॥ (যদুনন্দন দাস)

জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যেও এই ছন্দ পাওয়া যায়। বাংলা পদাবলী সাহিত্যেই এই ছন্দের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এই যুগের রচনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এই শ্রেণীর ছন্দ হইতেই 'পয়ার' উৎপন্ন হইয়াছে।

পাঁচ ও সাত মাত্রার পর্ব-গঠিত শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের নমুনা তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি। এখানে ৭ মাত্রার গণের সহিত লঘু-ত্রিপদী পর্ব মিশাইয়া কি ভাবে পদ্য রচিত হইত, তাহা দেখাইব। তুলনীয় মুকুন্দরামের

সুধর্ম সভায় বসি দেবরায়
বিচিত্র হেম সিংহাসনে
লইয়া পাজি পুথি সম্মুখে বৃহস্পতি
বসিল রাজ সিংহাসনে॥

এই পদ্যটির মূল ছন্দ যে সপ্ত-মাত্রিক শুদ্ধ-প্রাকৃত আদর্শের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি ইহাকে লঘু ত্রিপদীর আদর্শে রচনা করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মুকুন্দরামের কাব্যে বিশুদ্ধ সপ্তমাত্রিক ছন্দও পাওয়া যায়।

এই যুগের বাংলা সাহিত্যে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের বহুবিধ গঠন পাওয়া যায়। আমরা কয়েকটি মাত্র দেখাইব ঃ

অসম ছন্দ—১২ ও ১৬ মাত্রার চরণ ঃ

উদসল কুন্তল ভারা।
মুরতি শিঙ্গার লখিমি অবতারা ॥
অতিশয় প্রেম বিকারা।
কামিনী করত পুরুখ বিহারা ॥ (কবিরঞ্জন)

দ্বিপদী—৮+৩=১১ ঃ

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জা-গিয়া রজনী পোহায় ॥
খেণে খেণে করয়ে বিলাপ।
খেণে রো-য়ত খেণে কাপ ॥ (নরহরি)

৮+৬=১৪ মাত্রা

হেরইতে বিনোদিনী | ভূ-লল রে-
গো-ধন দো-হন | তে-জিল রে- ॥
চাঁ-দ চকোরে জনু | পা-য়ল রে-।
রা-ই প্রে-ম ভরে | ভা-সল রে-।

অষ্টকল চতুষ্পদী

(১) শারদ কোটি | চাঁদ সঞে সুন্দর |
সুখময় গৌর কি | -শোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতি পি | -রীতি রসে মাতল |
ভাগল গুরুজন | -গৌরবলাজ ॥

(গোবিন্দদাস)

[৮+৮+৮+৭]

(২) সহজই কাঞ্চন | কান্তি কলেবর |
হেরইতে জগজন | -মনমোহনিয়া।
তহিঁ কত কোটি | মদন মুরছায়ল |
অরুণ কিরণহর | অম্বর বনিয়া ॥

(বলরাম)

[৮+৮+৮+৮]

তোটক ছন্দ-

নব নী-রদ নী-ল সুঠা-ম তনু-।
ঝলমল ও- মুখ চান্দ জনু- ॥
শিরে কু-ঞ্চিত কু-ন্তল ব-ন্ধ ঝুটা-।
ভালে শো-ভিত গো-ময় চি-ত্র ফোঁটা- ॥ (নৃসিংহদেব)

মধ্যযুগে তৎসম ছন্দ

মধ্য যুগের বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মান্দোলনের ফলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে পৌরাণিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাঙালীর ধর্মে, কর্মে, সমাজে ও সাহিত্যে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই যুগের বাংলা ভাষাতেও সংস্কৃত-করণের বহু চিহ্ন পাওয়া যায়। সংস্কৃত-মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষার কথা বলিয়াছি। অনেকে ক্রিয়াপদ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সমাস-বদ্ধ সংস্কৃত শব্দের দ্বারা পদ রচনা করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এইরূপ ক্রিয়াপদ বর্জিত ভাষাকে ভাষা-সম অলঙ্কার বলা হয়। ভারতচন্দ্রও এইরূপ ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন। মধ্য যুগের অনেক কবি আবার সংস্কৃত বাক্যাংশ মিশাইয়া তাঁহাদের বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত-গন্ধী করিতে চেষ্টা

করেন। ১৮শ শতক হইতেই এইরূপ ভাষা-মিশ্রণ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। তুলনীয় রামপ্রসাদের

জননী পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।

উনিশ শতকে এইরূপ সংস্কৃত-মিশ্রণ বৃদ্ধি পায়। এই যুগধর্মের প্রভাবে পড়িয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" রচনা করেন।

মধ্য যুগে তৎসম ছন্দ—এই সংস্কৃত-চেতনার ফলে মধ্য যুগেই কবিগণ বাংলায় বৃত্তছন্দের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। তোটক, তূণক, ভুজঙ্গ-প্রয়াত শ্রেণীর বৃত্তছন্দ প্রকৃতপক্ষে মাত্রাছন্দই, কারণ ইহাতে বদ্ধাক্ষরতা অত্যন্ত অল্প, ও এই বদ্ধাক্ষরতায় বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। বিদ্যাপতি তাঁহার কীর্তিলতায় তোটক ও ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দ লিখিয়াছিলেন। এই জাতীয় লঘু চলনের তৎসম ছন্দ ১৬শ ও ১৭শ শতকের বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যাইবে। কিন্তু মধ্য যুগের প্রথম ভাগে বাংলা ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত ছন্দ রচনা সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ ঐ সময় বাংলা ভাষা যথেষ্ট পরিমাণ চর্চা-পুষ্ট হইয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়তঃ, তৎসম ছন্দের সূক্ষ্ম ছন্দ-স্পন্দ বুঝিবার সামর্থ্য তখন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকগণের মধ্যে খুব বেশী সংখ্যক লোকের ছিল বলিয়া মনে হয় না।

অষ্টাদশ শতকে নবদ্বীপের টোলগুলি ছিল বিশেষ ভাবে জীবন্ত। নবদ্বীপের রাজসভাতেও এই সময় বাংলা ভাষার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। এবং তিন শত বৎসরের অনুশীলনে বাংলা ভাষাও তখন ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে এই শতকেই প্রাচীন বৃত্তছন্দের গঠন অনুকরণ করিয়া বাংলা কবিতা রচনা করিবার সক্ষম প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র।

অষ্টাদশ শতকে যে-সকল অর্বাচীন বৃত্তছন্দ বা মাত্রা-পদ্ধতি-মিশ্রিত বৃত্তছন্দ বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, বৃত্তছন্দের কাঠামো থাকিলেও ঐ সকল ছন্দে পদবন্ধ ও মিত্রাক্ষরতা মিশাইয়া ছন্দগুলি বাংলায় রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যেমন, 'তূণক' সংস্কৃত সাহিত্যে ১৫ অক্ষরের ছন্দ ; গণ-বিন্যাস র-জ-র-জ-র ; যতি-বিন্যাস ৪+৪+৪+৩, অথবা ৮+৭, অথবা ৭+৮। বাংলা তূণক ছন্দের প্রতি পংক্তিও ১৫ অক্ষরে গঠিত। ৪+৪+৪+৩-এর যতি-বিভাগই বাংলায় চলে। এই যতি-বিভাগ অনুযায়ী প্রতি পংক্তি চারটি পর্বে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুই পর্ব মিত্রাক্ষর-বদ্ধ করিয়া অনেকে তূণককে ত্রিপদীর ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করিলেও গঠন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহা চৌপদী। প্রকৃতপক্ষে তূণক ছন্দে লঘু ও গুরু অক্ষর ক্রমিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। একটি সংস্কৃত তূণক ছন্দের দৃষ্টান্ত—

সা সুবর্ণ কেতকং বিকাশি ভৃঙ্গ পূরিতং
পঞ্চবাণ বাণজাল পূর্ণ হেতি তূণকম্।

ইহার সহিত তুলনীয় ভারতচন্দ্রের তূণক ছন্দ :

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥

ভারতচন্দ্রের সময় পয়ার-ত্রিপদীর সহিত সকলের পরিচয় হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য অষ্টাদশ শতকের কবিগণ ভণিতায় পয়ার-ত্রিপদীর উল্লেখ খুব কম করিতেন। কিন্তু তূণক, তোটক ও ভুজঙ্গ-প্রয়াতের বেলায় ভণিতায় ছন্দের নাম জুড়িয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। ভারতচন্দ্রের ভণিতাগুলি এইরূপ—

(১) ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥ (অন্নদামঙ্গল)

(২) ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে॥ (ঐ)

(৩) দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥ (বিদ্যাসুন্দর)

রামপ্রসাদ ও কবিচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও এই শ্রেণীর বৃত্তছন্দ পাওয়া যায়।

খাঁটি বৃত্তছন্দ তখন বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নূতন ছিল। সেইজন্য ভারতচন্দ্র তূণক-তোটক-ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ সাধারণের জন্য রচিত আখ্যানগুলিতেই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বৃত্তছন্দ ঐ সকল কাব্যে ব্যবহার করিতে সাহসী হন নাই। স্বতন্ত্র খণ্ড-কবিতায় তিনি এই সকল নূতন ছন্দ-রচনার পরীক্ষা করিয়াছেন। যেমন, নাগাষ্টক নামক রচনায় প্রথমে শিখরিণী ছন্দে সংস্কৃতে একটি শ্লোক লিখিয়া তাহারই বাংলা অনুবাদে তিনি শিখরিণী ছন্দের গঠন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভাবে তাঁহাকে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তৎসম মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ভাষায় অনুকরণ করা যে কত কঠিন, ভারতচন্দ্রের বাংলা শিখরিণী ছন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যাইবে। নীচের দৃষ্টান্তে গুরু অক্ষর বুঝাইবার জন্য ঐ সকল অক্ষরের পরে হাইফেন-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে :

শিখরিণী ছন্দে রচিত সংস্কৃত শ্লোক—

অহে কৃষ্ণস্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয় হ্রদং
পুরা নাগ গ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদিদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

শিখরিণী ছন্দে ইহার বঙ্গানুবাদ—

ওহে- কৃ-ষ্ণ স্বা-মিন্ স্মরণ কর না- কা-লিয় হ্রদে-,
ছিল- না-গ-গ্র-স্ত- প্রথম সময়ে- সব জনপদে-।
কবে- রা-জন্ চে-ষ্টা- করিবে তুমি হে- না-গদমনে-
বিরা-গে- হে- না-গে- সকলি গ্রসিতে-ছে- হরি হরি॥

'কৃষ্ণস্বামিন্' হইলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। আটটি শ্লোকে কবি তাঁহাকে দুঃখ-কষ্টের নাগ-পীডন হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলিতে হ্রস্ব স্বরধ্বনি প্রাধান্য লাভ করায় এই সকল ভাষায় খাঁটি বৃত্তছন্দের অনুকরণ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ভারতচন্দ্রের বাংলা শিখরিণী ছন্দেও এই কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়িবে। ক্রিয়া-পদের ও অন্যান্য খাঁটি বাংলা শব্দের শ্রুতিকটুতা পীড়াদায়ক। পশ্চিমা হিন্দীতে স্বরধ্বনির তৎসম উচ্চারণ এখনও স্বাভাবিক। সেজন্য প্রাচীন বৃত্তছন্দের অনুকরণ হিন্দীতে এরূপ শ্রুতি কটু হয় না। হিন্দীতে শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দ:

রাণী শ্রী যসুদা পুকারত—অরী,
রাধা কহাঁ তূ গঈ।
রাধা হেরত কুঞ্জ মেঁ সুনু অলী,
কাহ্নু ন বা কো লখী॥

মধ্য যুগে দেশজ ছন্দ

ধামালি ছন্দ—আদি যুগের ছড়া-প্রবচনে যে-লৌকিক ছন্দের প্রচলন আমরা দেখিয়াছি, মধ্য যুগে তাহা সাহিত্যে স্থান লাভ করিল। ১৭শ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে পদাবলীতে, মঙ্গলকাব্যে, লোক-সঙ্গীতে ও প্রবচনে এই ছন্দ বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। এই সময় এই শ্রেণীর রচনাকে 'ধামালি' বলা হইত। লোচনের ধামালির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ছড়া-জাতীয় রচনা বুঝাইতে 'ধামালি' শব্দটি এখনও উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদের রচনায় এবং তাহার পরে বাউল সঙ্গীতে এই ছন্দ আপন আসন সুনির্দিষ্ট করিয়া লয়। কিন্তু তাহার পূর্বে ধারাবাহিক রচনায় এই ছন্দ পরীক্ষিত হয় নাই। আমরা

এখানে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য হইতে ধামালি ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব :

(১) প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি ॥
আগুন লাগুক কাস্থের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড় খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে ॥ (বিজয় গুপ্ত)

(২) লাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপেতে বেচায় দুধের ছাওয়া'ল ॥ (মাণিকচন্দ্র রাজার গান)

(৩) ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম নিরঞ্জন ॥
জল বন্ধ স্থল বন্ধ বন্ধ শিবের কুড়্যা (?)।
আট হাত মৃত্তিকা বন্ধ চন্দ্র সূর্য খুঁজ্যা ॥ (মালদহের শিবের গাজন)

(৪) চৈত্র মাস মধু মাস শিবের জন্ম মাস।
নন্ সন্ন্যাসী লইয়া বালা চলেন শিবের বাস ॥
শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা।
পাড়া-পড়শী দেখতে এল বিযার কথা শুইনা ॥ (বরিশালের গাজন)

(৫) কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক ॥ (মুকুন্দরাম)

মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে এক স্থলে দেশজ ছন্দকে পয়ারের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তুলনীয় :

বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কেলি।
গণার মূষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গালি ॥

প্রবাদ-বচনে দেশজ ছন্দ—বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে এবং ঘুম-পাড়ানী ছড়াতেও দেশজ ছন্দ সুলভ। দেশজ ছন্দে রচিত কয়েকটি প্রবচন :

চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ—

(১) গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয়।
বোনে বোনে দেখা নয়॥

(২) টাকা তুমি যাও কোথা? পিরীত যথা।
আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে॥

ষণ্‌মাত্রিক দেশ ছন্দ—

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘনিয়ে বসে কাছে।
কথা দিয়ে কথা লয়, প্রাণে বধে পাছে॥

রামপ্রসাদ ও দেশজ ছন্দ—সাহিত্য ও সঙ্গীত দুইটি পৃথক্ শিল্প। দুইটিকেই সমান প্রাধান্য দিয়া বাংলা দেশে যে রস-প্রস্রবণ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তুলনাহীন। গীতগোবিন্দ ও ধ্রুপদ, বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তন, রামপ্রসাদী গান ও তাহার সুর এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত—বাঙালীর শিল্পশালার এই চারিটি নিখুঁত অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি।

রামপ্রসাদী কাব্য-সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহার লোকায়ত ভাব ও ভঙ্গী। এই খানেই ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রধান পার্থক্য। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি, রামপ্রসাদ সর্বসাধারণের কবি। তাঁহার কাব্যে যে ভক্তি-ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, ভক্ত ও ভগবানের যে ব্যক্তি-গত সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এদেশের জন-চিত্তের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। গভীর তত্ত্ব-কথা সহজ, সরল ভাষায়, দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট ঘটনার সাহায্যে প্রকাশ করিলে, তাহা কিরূপ অনায়াসে মর্ম স্পর্শ করিতে পারে, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বাণী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদও খাঁটি কথ্য ভাষায় তাঁহার গীতাবলী রচনা করেন, এবং অভিজাত ছন্দ-শৈলী বর্জন করিয়া তিনি অধিকাংশ গানে লোক-ছন্দ ব্যবহার করেন। দেশজ ছন্দের শক্তি-সামর্থ্যও রামপ্রসাদের রচনাতেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে।

রামপ্রসাদ চৌপদী পংক্তির সহিত দ্বিপদী পংক্তি মিশাইয়া অধিকাংশ গীত রচনা করিয়াছেন। সমস্ত পংক্তিতে একই প্রকার মিত্রাক্ষর প্রয়োগ তাঁহার ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য। পংক্তির আরম্ভে অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহার তাঁহার ছন্দে সুলভ। আমরা নীচে দুইটি রামপ্রসাদী গীত উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

( ) আমি নই আ | -টাশে ছেলে।
ভয়ে) ভুলব না কো | চোখ রাঙালে ॥
সম্পদ আমার | ও রাঙাপদ | শিব ধরেন যা | হৃৎ-কমলে।
ওমা) আমার বিষয় | চাইতে গেলে | বিড়ম্বনা | কতই ছলে ॥
শিবের দলিল | সৈ মোহরে | রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার) করব নালিশ | নাথের আগে | ডিক্রী লব | এক সওয়ালে।
জানাইব | কেমন ছেলে | মোকদ্দমায় | দাঁড়াইলে।
যখন) গুরুদত্ত | দস্তাবিজ | গুজরাইব | মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে | মোকদ্দমা | ধুম হবে রাম | -প্রসাদ বলে।
আমি) ক্ষান্ত হব | যখন আমায় | শান্ত করে | লবে কোলে ॥

(২) ওরে) শমন কি ভয় | দেখাও মিছে।
তুমি) যে-পদে ও | পদ পেয়েছ | সে মোরে অ | -ভয় দিয়েছে ॥
ইজারার | পাট্টা পেয়ে | এত কি গো | -রব বেড়েছে।
ওরে) স্বয়ং থাকতে, | কুশের পুতুল | কে কোথা দা | -হন করেছে।
হিসাব বাকী | থাকে যদি | দিব নারে | তোদের কাছে।
ওরে) রাজা থাকতে | কোটালের দো াই | কোন দেশেতে |
কে দিয়েছে ॥
শিব-রাজ্যে | বসতি করি | শিব আমারে | পাট্টা দিয়েছে।
রাম) -প্রসাদ বলে | সেই পাট্টাতে | ব্রহ্মময়ী | সাক্ষী আছে ॥

মধ্য যুগে ছন্দের বন্ধন-মুক্তি

'আখর' ও 'ছড়া' কাটা।--ছন্দের নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ ভাঙ্গিয়া দিয়া কি ভাবে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ হইতে মুক্তক ও গৈরিশ ছন্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেকথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মধ্য যুগেই প্যাটার্ণের বন্ধন ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা প্রথম দেখা যায়। গায়েন ও কীর্তনীয়া 'ছড়া' ও 'আখর' কাটিয়া যে-সকল পংক্তি আবৃত্তি করিতেন, তাহাতে অনেক স্থলে ছন্দ আছে, কিন্তু কোন প্যাটার্ণ নাই। যেমন,

তখন দুটি ভাই দেখে, আনন্দিৎ হলেন রাম।
তার ক্রোধ সব দূরে গেল, জিজ্ঞাসেন নাম॥
বলেন তোমার ভাবে পাই, দুটি ভাই বট সহোদর।
(তোমরা) কার পুত্র, কোথা থাক, কোন দেশে ঘর॥
(লব কুশের যুদ্ধ—বা, প্রা, পু, বি, ২, ১, পৃঃ ৭৫)

ষোড়শ-মাত্রিক পংক্তির আভাস থাকিলেও এই সকল পংক্তিতে গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান হ্রাস পাইয়াছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এইরূপ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

পরিধানের শাড়ী অর্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া।
যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম স্মরণ করিয়া॥
(ব, ভা, সা, ১৩৫৬, পৃঃ ২৬)

'রাসলীলা গ্রন্থ পয়ার' নামক একখানি পুথিতে (বা, প্রা, পু, বি, ঐ, পৃঃ ৬৩) পয়ারের সহিত ১৬ ও ১৮ মাত্রার ছেদ-নিষ্ঠ পদ্য পংক্তির মিশ্রণ পাওয়া যায়। পুথির শিরোনামা হইতে বুঝা যাইতেছে তখন এই জাতীয় ছন্দ-পংক্তিকেও 'পয়ার' বলা হইত। চতুর্দশ অপেক্ষা অল্প-সংখ্যক অক্ষর ব্যবহার করিয়া মাত্রা-সম্প্রসারণ দ্বারা ১৪ মাত্রা পূরণ করা—ইহাই প্রাচীন পয়ারের প্রধান শৈথিল্য। পয়ার ছন্দে অক্ষর-সংখ্যার আধিক্য আদি যুগ অপেক্ষা মধ্য যুগেই অধিক সুলভ। বিশেষ করিয়া

কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত গায়েনদের ছড়াতেই১ এই জাতীয় ছন্দ-শৈথিল্য বেশী পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা সুর করিয়া গদ্য আবৃত্তি করা। এই সকল রচনায় বাংলা গদ্যের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

শূন্যপুরাণের ছন্দ—এই প্রসঙ্গে শূন্যপুরাণের ছন্দের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহার প্রায় কোন ছন্দেরই নির্দিষ্ট গঠন নাই, এবং প্রতি চরণে অনেকগুলি অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

আইদ ভূপতি নিবাব দেহারা ধর্ম জন্ম আইদ স্থান।
নব খণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী
ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সন্মান॥
চানক দিল মানিক ভাণ্ডার পুখুর আড়ের উপর।
চিত্র গড়র কামিনা বিসস্তর। (অথ ধর্মস্থান)

ইহাকে আদি যুগের বাংলা ছন্দ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। সেজন্য আদি যুগে পয়ার-জাতীয় ছন্দে যতি-কাঠিন্য অধিক। সে যুগের ছন্দে অন্য নানা প্রকার শৈথিল্য ছিল, কিন্তু আদি যুগের ছন্দ প্রধানতঃ যতি-নির্ভর। চর্যা-পদাবলীতে এবং বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের ছন্দে এই ছেদ-বিরোধিতা ও যতি-নির্ভরতা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শূন্যপুরাণের ছন্দে যতি অপেক্ষা ছেদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেজন্য ইহাতে অক্ষর-সংখ্যার নিশ্চয়তা নাই। এই ছেদ-ধর্মী ছন্দ গঠন-যুগের সঙ্গীত-ধর্মী ছন্দ হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সেজন্য আমাদের মনে হয়, শূন্যপুরাণ ১৭-১৮শ শতকে রচিত। ইহার বারমাসী অংশ সে যুগের গদ্য-ভঙ্গীর সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বাংলা প্রবাদে ছন্দ—জনপ্রিয় কবিদের লেখনী-মুখে অথবা লোক-মুখে প্রবাদ বচন সৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট কাব্য-গ্রন্থ হইতে আহৃত

১। তুলনীয়—বিলাপ দীর্ঘছন্দ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বা, প্রা, পু, বি, ৩, ২, পৃঃ ৩৮; যোগাদ্যার বন্দনা, ঐ, পৃঃ ১০১।

প্রবাদের ভাষা ও ছন্দোভঙ্গী মার্জিত। ইহাতে সকল শ্রেণীর ছন্দই পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রবাদ বলিতে যে-শ্রেণীর রচনা বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সৃষ্টি লোক-মুখে। পুরাকাল হইতে এই সকল প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, ইহাই সকলের বিশ্বাস। সেজন্য কবে কে এই সকল প্রবাদ রচনা করিয়াছে, তাহা লইয়া কোন মাথা-ব্যথা নাই। আমাদের প্রবাদগুলির ভাষা অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক হইলেও ছন্দের বিচারে অধিকাংশ প্রবাদই মধ্য যুগের। সেজন্য এখানে বাংলা প্রবাদের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

আমাদের প্রবাদ গুলিতে মিশ্র ছন্দের দৃষ্টান্ত সুলভ। মধ্যযুগে ছন্দের আদর্শ ও অক্ষরের মাত্রা-মূল্য নির্ধারিত হয় নাই। বাংলা প্রবাদ গুলিতেও শিথিল-বন্ধ ছন্দের সংখ্যা অধিক। সেজন্য মনে হয় এই সকল প্রবাদ মধ্য যুগে সৃষ্ট হইয়া লোক মুখে আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। যেমন,

কষ্ট দিয়ে দান, পিত্তি মেরে খাওয়ান,
—করা না করা দুইই সমান।

মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায় উপরের দৃষ্টান্তটি পদ্যের মর্যাদা পাইল বটে, কিন্তু পদ্যের নিয়মিত চলন ইহাতে নাই। বহু বাংলা প্রবাদের গঠনে এই গদ্য-ভঙ্গী পাওয়া যায়। প্রবাদ-বচনের মূল উৎস মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বহু-দর্শন। কোন উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর যাহা ঘটিতেছে, তাহারই বস্তুনিষ্ঠ রেখা-চিত্র আমাদের অধিকাংশ প্রবাদ-বচন। সেজন্য গদ্যের রূপ লইয়াই ইহা সাধারণতঃ স্বতোৎসারিত হয়। যেমন,

(১) বড় মানুষের কান আছে, চোখ নাই।
(২) মুখ দেখলেই শিকারী বেড়াল চেনা যায়।
(৩) টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।
(৪) আপনার চরকায় তেল দাও।

অনেক প্রবাদে প্রস্ফুট ছন্দের গঠন আছে, কিন্তু মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত না হওয়ায় গদ্যের স্বাভাবিকতা পাওয়া যাইতেছে :

(১) ঢাকে ঢোলে বিয়ে,
তাই) উলু দিতে মানা।
(২) রামকপে কাক মরেছে—
কাশীধামে হাহাকার।

কোন কোন ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর সত্ত্বেও গদ্যের রেশ পাওয়া যায় ; যেমন,

একবার যায়
দুইবার যায় ভোগী,
তিনবার যায় রোগী।

প্রবাদে দেশজ ছন্দের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি। তাঁহার কাব্যের প্রসাদগুণ ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ঐ যুগে অতুলনীয়। মধ্য যুগের অন্যান্য আখ্যান রচয়িতাদের পয়ার-ত্রিপদীর দীর্ঘ একঘেয়েমি তাঁহার কাব্যে নাই, ইহা তাঁহার রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। আখ্যানটিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতিটি অংশ এক একটি বিষয়ানুগ ছন্দে রচনা করিয়াছেন। নিপুণ ভাবে ছন্দ ও শব্দ চয়ন করিতে পারায় তাঁহার রচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

রূপ-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে ভারতচন্দ্র সর্ব শ্রেণীর ছন্দগোষ্ঠী হইতে ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। তৎসম, প্রাকৃতজ, দেশী, বিদেশী—সকল প্রকার ছন্দ রচনাতেই তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ সকলেই প্রায় ছন্দ-বৈচিত্র্যের সাহায্যে রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি

করিতে চাহিয়াছেন। ভঙ্গ-প্রাকৃত পয়ার ও ত্রিপদী, শুদ্ধ-প্রাকৃত একাবলী, 'দশাক্ষরা' ও সপ্তমাত্রিক ছন্দ, এবং দেশজ ছন্দ—এই গুলিই ছিল তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য। ভারতচন্দ্র এই সকল ছন্দের অতিরিক্ত তৎসম ছন্দ, ভঙ্গ-প্রাকৃত চৌপদী এবং দুই একটি ফার্সী ছন্দ ব্যবহার করিয়া মধ্য যুগের কবিদের মধ্যে রূপদক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ছন্দ-শৈলীর সাহায্যে রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টির ব্যাপারে ভারতচন্দ্র অতুলনীয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তিনি কাহিনী বর্ণনায় সাধারণতঃ পয়ার ও লঘু ত্রিপদী, করুণ ও গম্ভীর বিষয়-বস্তু বর্ণনায় দীর্ঘ ত্রিপদী, অদ্ভুত রস বর্ণনায় একাবলী ও দশাক্ষরা, এবং উৎসাহ দ্যোতনে তূণক, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত ও মালঝাঁপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদেশী ভাটের মুখে ফার্সী ছন্দ চরিত্রানুগ হইয়াছে। ছন্দটি এইরূপ :

ভূ́প মৈ́ ভি́খারী ভ́ট্ট কা́ঞ্চী́পু́র জা́য়কে́।
ভূ́প কো́ সমা́ঝ বা́ঝ রা́জ́পু́ত্র পা́য়কে́॥

ছন্দটির সহিত তূণকের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক যে এখানে প্রতি বিযোড় অক্ষরে প্রবল স্বরাঘাত পড়িতেছে; এবং এই ছন্দে দুইটি মাত্র অক্ষর লইয়া এক একটি পর্ব গঠিত। অপর পক্ষে, তূণক ছন্দে গুরু অক্ষরের পরে লঘু অক্ষর ক্রমিক ভাবে ব্যবহৃত হইলেও ঐ ছন্দে চারটি অক্ষর বা ছয় মাত্রা দ্বারা পর্ব গঠিত হয়। যথা,

চণ্ড মুণ্ড | মুণ্ড খণ্ডি | খণ্ড-মুণ্ড | মালিকে।
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্ত কেশ জালিকে॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তিতে মিশ্রভাষা ও অসম মিশ্রছন্দ ব্যবহার করিয়া ভারতচন্দ্র কৌতুক রস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। এই গ্রন্থে নানা

স্থানে আমরা ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি যে দেশজ ছন্দ রচনাতেও নিপুণ ছিলেন, তাহা নীচের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে :

আই আই | ওই বুড়া কি | এই গৌরীর | বর লো।
বিয়ের বেলা | এয়োর মাঝে | হৈল দিগম্বর | লো ॥
উমার কেশ | চামর ছটা | তামার শলা | বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া | ফোঁপায় ফণা | দেখে আসে | জ্বর লো ॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে মিত্রাক্ষর ও স্তবক সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ১৯৯ ও ২০১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইবে।

ছন্দালোচনার সূত্রপাত

পারিভাষিক শব্দের ইঙ্গিত—আদি যুগে বাঙালী কবি অপভ্রংশ ছন্দের আদর্শ অনুসরণ করিতেন। তখনও বাঙালীর নিজস্ব ছন্দ গড়িয়া উঠে নাই। তাই বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রও তখন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই খাঁটি বাংলা ছন্দের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তখনও এই সকল নূতন ছন্দের নামকরণ হয় নাই। পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে বাংলা ছন্দ শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে থাকে, মধ্য যুগের সাহিত্যে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এই যুগের বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, মঙ্গলগান, মঙ্গলগীত, বিজয়, শ্লোকছন্দ, গীতছন্দ, পুরাণ-বন্ধ, পয়ার-বন্ধ, পয়ার-প্রবন্ধ, পয়ার, পঞ্চালিকা বা পাঁচালী, ত্রিপদী, লাচাড়ী, দীর্ঘ-ছন্দ, ইত্যাদি। সবগুলিই সাহিত্য-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ। ইহাদের প্রকৃত অর্থ এখনও কিছুটা অস্পষ্ট রহিয়াছে। মঙ্গলগান সম্বন্ধে আমরা আমাদের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র ভূমিকায় কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। অপর কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব।

যদুনন্দন দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সংস্কৃত কাব্য গোবিন্দলীলামৃতের বাংলা অনুবাদ করেন। এই বাংলা অনুবাদটিকে তিনি পাঁচালী নামে অভিহিত করিয়াছেন। তুলনীয়ঃ

দন্তে তৃণ করিয়া কহোঁ বারে বার।
যত্ন করিয়া এই গ্রন্থ করিবে বিচার॥
পাঁচালি বলিয়া মাত্র মনে না করিহ হেলা।
শ্লোক-প্রবন্ধে কহে এই মতি খেলা॥

(বা, প্রা, পু, বি, ৩, ৩, পৃঃ ৯৪)

মধ্য যুগের অন্যান্য কবিদের রচনাতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, তখন সংস্কৃতে রচিত মূল, অভিজাত শ্রেণীর কাব্য বুঝাইতে 'শ্লোকছন্দ', 'শ্লোক-প্রবন্ধ', ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত, এবং প্রাদেশিক বা লৌকিক রীতি অনুযায়ী রচিত বাংলা কাব্যকে পাঁচালী বা পঞ্চালিকা বলা হইত। সে যুগের আখ্যায়িকা-মূলক কাব্যগুলিতে, বিশেষ করিয়া মহাভারতে, এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য 'পাঁচালী' শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত সুলভ। যথা,

শ্লোকচ্ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস॥
সেই অনুসারে আমি পাঁচালি রচিল।

অনেক সময় বাংলা কাব্যও 'পয়ার' বা 'পয়ার-প্রবন্ধ' আখ্যা লাভ করিয়াছে। সঞ্জয় রচিত মহাভারতের শেষে আছেঃ

সঞ্জয় কহিল কথা ভব তরিবারে।
মহাভারতের কথা রচিছে পয়ারে॥

সঞ্জয় কৃত মহাভারতের বহু অংশ লাচাড়ী বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত। সেজন্য উদ্ধৃত অংশে 'পয়ার' শব্দ সমগ্র কাব্যটি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে দেখা গেল, মধ্য যুগের প্রথম দিকেই 'পয়ার' শব্দের প্রচলন হইলেও, ইহার অর্থ সম্বন্ধে সে সময় অস্পষ্টতা ছিল। ইহা শুধু যে ৮+৬=১৪ মাত্রার দ্বিপদী ছন্দ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে। অন্যান্য দ্বিপদী বন্ধকেও পয়ার নামে অভিহিত

করা হইত। তাহা ছাড়া, বাংলা ভাষায় ও প্রাদেশিক রীতিতে রচিত কাব্যকেও অনেক সময় 'পয়ার' বলা হইত। মধ্য যুগের কাব্যগুলিতে আর একটি পরিভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা 'ত্রিপদী'। তুলনীয়,

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সেযুগে ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ বুঝাইতে আরও একটি শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা লাচাড়ী বা নাচাড়ী। প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যে এই শব্দটি শিব-বিষয়ক ভক্তি-মূলক গীত অর্থে প্রচলিত। লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর পার্থক্য সম্বন্ধে মধ্য যুগের বাঙালী কবিগণ সচেতন ছিলেন। বহু প্রাচীন পুথিতে দীর্ঘ ছন্দ বুঝাইবার জন্য লাচাড়ী দীর্ঘছন্দ বা শুধু দীর্ঘছন্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সকল ছান্দসিক পরিভাষার প্রচলন হইতে সেযুগে ছন্দালোচনার সূত্রপাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ছন্দাশুদ্ধির ভয়—এই নূতন ছন্দোবন্ধ গুলিকে নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য সেযুগের কবিগণ সচেষ্ট ছিলেন, তাহারও প্রমাণ মধ্য যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়। ছন্দের প্রয়োজনে বিপ্রকর্ষ দ্বারা শব্দকে সম্প্রসারিত ও অপিনিহিতির দ্বারা সঙ্কুচিত করা হইত। যেমন, প্রীতি= ২ অক্ষর, পিরীতি=৩ অক্ষর; আসিহ=৩ অক্ষর, আস্য=২ অক্ষর। মধ্য যুগের শেষ দিকে অনেক কবিকে ছন্দাশুদ্ধির জন্য পাঠকের নিকট মার্জনা চাহিতে দেখা যায়। ইহা হইতেও সে যুগের ক্রমবর্ধমান ছন্দ-চেতনার কথা জানিতে পারা যায়। একজন সত্যনারায়ণ ব্রতকথার লেখক ছন্দ পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছেন:

ভাঙ্গা-টুটা পদ কিম্বা ছন্দ ভাঙ্গা হয়।
আপনে করিবে রক্ষা সত্য মহাশয় ॥

(বা, প্রা, পু, বি, ২, ১, পৃঃ ১৩)

মধ্য যুগে অনেক সংস্কৃতে অভিজ্ঞ বাঙালী মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বভাবতঃই নিরক্ষর কবিদের লৌকিক রচনা তাঁহাদের মনঃপূত হয়

না। 'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য' বলিয়া ইঁহাদেরই একজন বাংলা সমালোচনা শাস্ত্রের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদেরই সমালোচনার ভয়ে কবিগণ ক্রমে ক্রমে বাংলা ছন্দের গঠন সম্বন্ধে অবহিত হইতে থাকেন বলিয়া মনে হয়।

ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ—মধ্য যুগে বাংলা ছন্দতত্ত্বের উপর রচিত কোন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তখন সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা ছন্দকেও অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দে বিভক্ত করা হইত। ভঙ্গ-প্রাকৃত শ্রেণীর ছন্দকে তাঁহারা অক্ষরছন্দ বলিতেন, যদিও ছন্দের পরিমাপ খুব সম্ভব করা হইত হরফ গুণিয়া। ত্রিপদা, চৌপদী নামকরণ হইতে বুঝা যায়, বাংলা ছন্দ যে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ছন্দের ন্যায় পংক্তি-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল নহে, একটি চরণকে একাধিক অংশে বিভক্ত করিয়াই যে বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিতে হইবে, একথা সেযুগের ছান্দসিকগণও বুঝিয়াছিলেন। মাত্রাসম বা ব্রজবুলি ভাষায় রচিত ছন্দকে বা ঐরূপ তৎসম উচ্চারণ-যুক্ত বাংলা ছন্দকে তাঁহারা মাত্রাছন্দ বলিতেন। এবং দেশজ ছন্দ যে স্বতন্ত্র শ্রেণী-ভুক্ত, তাহাও সে যুগের ছান্দসিকগণ বুঝিয়াছিলেন। তাই এই অ-সংস্কৃত-মূল ছন্দের নাম হইল 'ধামালি'।

মধ্য যুগে মিত্রাক্ষর ও স্তবক

এই যুগের কাব্যে নানা স্থানে উত্তম মিল পাওয়া গেলেও কবিগণ উত্তম ও অধম মিলে পার্থক্য করিতেন না। এমন কি শুধু স্বরধ্বনির মিল (assonance) ব্যবহার করিতেও কবিদের আপত্তি ছিল না। যেমন, মুকুন্দরামের কাব্যে পাই,

কোপে কম্পমান তনু কাঁপে সর্ব্ব গা।
যোজন যোজন বহি পড়ে এক পা॥

স্বরধ্বনির মিল বা assonance ফরাসী ও পর্তুগীজ সাহিত্যে আদরণীয়, কিন্তু বাংলায় ইহার তেমন চল নাই। বাংলায় একাধিক স্বর ও ব্যঞ্জনের মিলনকেই উত্তম মিল বলিয়া গণ্য করা হয়। কবিতার বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব সম্বন্ধে মধ্য যুগের কবিগণ তেমন সচেতন হইয়া উঠেন নাই। সেজন্য উত্তম ও স্বতঃস্ফূর্ত মিত্রাক্ষর যে কাব্যের চমৎকারিত্ব কতখানি বৃদ্ধি করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদের ধারণা ছিল না। ভারতচন্দ্র সেযুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি। কিন্তু তাঁহার কাব্যেও কুমিল সুলভ। রাধামোহন সেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্নপূর্ণা মঙ্গল' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি ভারতচন্দ্রের রচনার দোষ ত্রুটি দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মিল সম্বন্ধে লেখকের অভিমত :

আনুপূর্বী যদিস্যাৎ করেন শীলন।
বহুপদে দেখিবেন আছে কুমিলন ॥১

এই যুগের ছন্দে যুগ্মকের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভঙ্গ-প্রাকৃত, শুদ্ধ-প্রাকৃত, তৎসম ও দেশজ ছন্দ সাধারণতঃ দুই চরণের গুচ্ছেই গঠিত হইত। সেজন্য স্তবক-বৈচিত্র্য এই যুগের কাব্যে বিরল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুকুন্দরামের কথা বলা যাইতে পারে তাঁহার পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ সুগঠিত। সপ্তমাত্রিক শুদ্ধ-প্রাকৃত ও একাবলী রচনাতেও তিনি নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ছান্দসিক হিসাবে মঙ্গলকাব্যের লেখকগণের মধ্যে তাঁহার স্থান বোধ হয় ভারতচন্দ্রের পরেই। কিন্তু তাঁহার সুবৃহৎ চণ্ডী-মঙ্গল গীতে কালকেতুর বনকর্তন অংশেই শুধু ষড়কের আভাস পাওয়া

১। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, 'রাধামোহন সেন' দ্রষ্টব্য।

যায়। অবশিষ্ট সমস্ত অংশই যুগ্মকে রচিত। আলোচ্য অংশটিতেও ত্রিপদী যুগ্মকের ভঙ্গী রহিয়াছে। তুলনায়ঃ

সিঁয়াকুল ডামাকুল শিঙ্গার বেত
কোদালি কাটিয়া করিল ক্ষেত
চিঞ্চার বহু বাঁশ কাটিল মান্দারি।
দেবধান গড়গড় ময়না কাঁটা
শালপাণি চাকুল্যা কাটিল জটা
কুকুরছড়্যা কাটিল গান্তারি ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আমরা এইরূপ ষড়ক দেখিয়াছি। বড়ু চণ্ডীদাস এক প্রকার ত্রিপংক্তিক স্তবকের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে তাহা অনুকৃত হয় নাই।

মধ্য যুগের সাহিত্যে যেখানেই যুগ্মকের বন্ধন-কাঠিন্য অমান্য করিয়া ছন্দকে অধিক সংখ্যক চরণের গুচ্ছে গঠিত করা হইয়াছে, সেখানেই প্রায়শঃ একই মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন চরণ-গুচ্ছকে এক-মুখী করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যেমন শেখরের একটি পদে পাই,

নিরজ-নয়নি লেয়ল বীণ
সকল গুণক অতি প্রবীণ
মধুর মধুর বাওত তাল মদন-মোহন-মোহিনী।
ঝঙ্কৃত ঝঙ্কৃত ঝনন-ঝঙ্ক
চলত অঙ্গুলি লেলিত অঙ্গ
কুটিল নয়নে করত ভাঙ অঙ্গ-ভঙ্গ-শোহিনী ॥

কবিতাটি প্রকৃত পক্ষে তিন চরণের স্তবক দ্বারা গঠিত। কিন্তু প্রতি স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে একই প্রকার মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই যুগে ভারতচন্দ্রের রচনাতেই শুধু যুগ্মকের বৈচিত্র্যহীনতা এড়াইবার চেষ্টা দেখা যায়। প্রথমতঃ. বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় একই প্রকার মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া তিনি যুগ্মকের একঘেয়েমি নষ্ট করিতে

চাহিয়াছেন। তাঁহার রসমঞ্জরীর অধিকাংশ কবিতায় এবং রামপ্রসাদের গীতগুলিতেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। রসমঞ্জরীর একটি কবিতা এইরূপ :

কোথায় রহিল রামা বিরহে দহিয়া আমা
নিরন্তর কাম-জ্বালা কত আর সহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু
দাপে-থেকো বায়ু-জ্বালা কত আর বহিব।
চন্দন কমল দল পোড়া যেন দাবানল
সুধাকর বিষধর কত সয়ে রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার পুরস্কার তিরস্কার
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব॥

রসমঞ্জরীতে ভারতচন্দ্র ক্রিয়াপদের মিত্রাক্ষরই অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। লো, গো, হে, প্রভৃতি শব্দ চরণান্তে জুড়িয়া দিয়াও মিত্রাক্ষরের সমতা রক্ষা করা হইয়াছে। রামপ্রসাদের গীতগুলিতে মিত্রাক্ষরের বৈচিত্র্য অধিক।

ভারতচন্দ্র অন্য ভাবেও স্তবক-বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন, দশমাত্রিক একপদী যুগ্মকের সহিত দীর্ঘ দ্বিপদীর এক পংক্তি সংযুক্ত করিয়া তিন চরণের স্তবক রচিত হইয়াছে। তুলনীয় :

প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহিল সহচরী।

সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সঙ্গী তোলে ধরাধরি করি।

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে,
ধরা তিতে নয়নের জলে।

কপালে কঙ্কণ হানে, অধীর রুধির বাণে,
কি কৈল কি কৈল ঘন বলে।

অষ্ট-মাত্রিক একপদী যুগ্মক প্রথম দুই চরণ রূপে ব্যবহার করিয়া লঘু ত্রিপদীর এক পংক্তি দ্বারা তৃতীয় চরণ গঠনও তাঁহার শিল্প-প্রতিভার পরিচায়ক। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের 'মালিনী-নিগ্রহ' অংশটি এইরূপ ত্রিপংক্তিক স্তবকে রচিত :

এ তিন প্রহর রাতি ;
ডাকিয়া কর ডাকাতি !
দোহাই রাজার লুঠিল আগার
ধরিয়া খাইল জাতি ॥

অসমীয়া ও ওড়িয়া ছন্দ

বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন ভগ্নী স্থানীয়া ভাষা। এখন এই তিনটি ভাষা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কিন্তু এক হাজার বৎসর পূর্বেও এই তিন স্থানের ভাষা মাগধী অপভ্রংশেরই তিনটি উপভাষা মাত্র ছিল। ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় আত্ম-প্রতিষ্ঠান ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই সময় হইতেই এই তিন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন স্বতন্ত্র ধারাপথে বাহিতে থাকে। কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী যুগে যে ইহারা একই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথমতঃ. আমরা ডাকের বচনের উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল প্রবচন আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যা—এই তিন অঞ্চলেই প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। দ্বিতীয় নিদর্শন হইল, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ। এই দুইটি ছন্দ অসমীয়া, বাংলা ও ওড়িয়া সাহিত্যের প্রধান ছন্দ। ১৫শ শতক হইতেই ইহাদের প্রচলন। ভক্তকবি শঙ্করদেব ও মাধব কন্দলী ১৫শ শতকে

আসামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনা হইতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত :

(১) হরির নাম। শুনিযো মহিমা
সাবধান করি চিত্ত।
অজামিল নামে আছিল ব্রাহ্মণ
বেস্যাত ভৈল পতিত॥ (শঙ্করদেব)

(২) যেহি কৃষ্ণ সেহি রাম গুণ অনুপাম।
ভকতর মহাধন যানে গুণ নাম॥
কৃষ্ণর চরণে কহে মাধব কন্দলী।
শুনিয়োক রামায়ণ সবাঙ্করে মিলি॥ (মাধব কন্দলী)

ওড়িয়া কবি সরল দাস ১৫শ শতকে আবির্ভূত হন। তাঁহার রচনায় পয়ার ছন্দের রূপ সুগঠিত। ওড়িয়া লোক-সাহিত্যেও পয়ার ছন্দ সুলভ। একটি ওড়িয়া পয়ার ছন্দ :

শুণ হে রসিকমানে চিন্তাকুটা বাণী
দ্বারে দ্বারে ডাকি চিন্তা কুটন্তি কেলুণী।

একটি ওড়িয়া ত্রিপদী :

কালিন্দী হ্রদরে পশন্তি বনমালী
শ্রীপদে দংশিলাক কালী।
বিষর জ্বালারে হৃদয় জলরে
শ্রীকৃষ্ণ পড়িলেক ঢলি॥

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে ১১শ-মাত্রিক একাবলী ছন্দের স্থান প্রচলনের দিক দিয়া পয়ার-ত্রিপদীর ঠিক পরেই। ওড়িয়া লোক-সাহিত্যেও একাবলী ছন্দ সুলভ। ওড়িয়া একাবলী ছন্দ :

শুণ হে সুজনে এসন বাণী
রাধাকু ন দেখি সারংগপাণি।
জমুনা কূলরে মিলিলে জাই
"হসি কথা কহ প্রাণর রাই।"

বাংলা ছড়ার ছন্দও ওড়িয়া সাহিত্যে পাওয়া যায়। যেমন,

আকল মাকল টাকল টিয়া
গড়িলা মাছকু ভাজঈ লিয়া।

আমরা যাহাকে চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ বলিয়াছি ('ইকড়ি-মিকড়ি চাম চিমড়ি', ইত্যাদি)—তাহার সহিত এই ওড়িয়া ছন্দের কোন ভেদ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ইতিহাস

আধুনিক যুগ

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:—এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের গঠন ও শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করিবার সময় আধুনিক যুগের বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে; আধুনিক বাংলা সাহিত্য হইতে ছন্দের অনেক দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ সকল কথার পুনরাবৃত্তি যথা সম্ভব বর্জন করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য কি ভাবে এ যুগের ছন্দ-রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ গদ্যের যুগ। গদ্যের ধর্ম মননশীলতা। নিরাভরণতাই ইহার শোভা, ও বলিষ্ঠতা ইহার বৈশিষ্ট্য। শুধু গদ্য-সাহিত্যে নহে, এ যুগের বাংলা পদ্য-সাহিত্যেও আধুনিকতার এই সকল লক্ষণ পাওয়া যায়। প্যাটার্ন-ছন্দ ভাঙিয়া অমিত্র ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ প্রবহমাণ ছন্দ, মুক্তক, অতিমুক্তক এবং গদ্যছন্দের উদ্ভবেও গদ্য-করণের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(২) এ যুগে পদ্য-বন্ধেরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। পূর্বে কাব্য গান করা হইত। কবিতা গীত হইলে সুরের ঝঙ্কারে কাব্যের অনেক দোষ ঢাকা পড়ে। হিন্দী কাব্য এখনও গীতি-মূলক। কিন্তু বাংলা কাব্য এখন গান করা হয় না, আবৃত্তি করা হয়। সেজন্য সঙ্গীত অপেক্ষা নাট্য-শিল্পের প্রতি ইহার আকর্ষণ বেশী। আবৃত্তি-মূলক হওয়ায় আধুনিক বাংলা পদ্য ছন্দ-ঝঙ্কারের উপর একান্ত নির্ভরশীল। সেই জন্যই এযুগের পদ্যছন্দ গঠন-পারিপাট্যে এত উন্নত। ছন্দ-শুদ্ধির প্রতি এযুগের কবিদের প্রখর দৃষ্টি। ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ এই যুগেই সুব্যক্ত হয় ও বিভিন্ন মাত্রা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে। রীতি-মিশ্রণ এ যুগে ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। উত্তম মিল ও স্তবকে কারুকার্য আধুনিক কাব্যের রূপগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছে। পর্ব ও চরণে বৈচিত্র্য আনিয়াও এ যুগের কবিগণ অসংখ্য ছন্দোবন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাংলা ছন্দের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই যুগেই বাংলা ছন্দের গঠন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বাঙালীর মনে বিশেষ কৌতূহল জাগিয়াছে।

(৩) রেনেসাঁসের ধর্ম মনোজগতের প্রসার বৃদ্ধি। সেজন্য রেনেসাঁস-সাহিত্যে একযোগে বিদেশী প্রভাব ও প্রাচীনত্বের উজ্জীবন দেখিতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে 'রেনেসাঁস' আসে। তাহার ফলে এদেশে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত দেশীয় প্রাচীন আদর্শেরও যুগপৎ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। আধুনিক বাংলা ছন্দেও এই ব্যাপ্তির লক্ষণ দেখা যায় বিদেশী ছন্দের অনুকরণে ও বাংলা বৃত্তছন্দের প্রচলন বৃদ্ধিতে। দেশজ ছন্দকেও এ যুগে সংস্কৃত-মূলক ছন্দের সহিত একাসনে বসানো হয়।

বাংলা সাহিত্যিক গদ্য

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ ও বাংলা গদ্য—সাহিত্যিক গদ্যের প্রবর্তন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা। বহু মনের সহিত

সংযোগ লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া যাহা লেখা যায়, তাহাই সাহিত্য বা সাহিত্যিক প্রয়াস। পূর্বে বাংলা দেশে পদ্যেই এইরূপ সাহিত্যিক প্রয়াস করা হইত। গদ্য তখন বাংলা 'সাহিত্যের' বাহন বলিয়া গণ্য হইত না। তাই সীমাবদ্ধ পাঠক-গোষ্ঠীর জন্য রচিত সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কিত কোন কোন গ্রন্থে ও মিশনরীদের ধর্মপুস্তকে গদ্যের প্রয়োগ হইলেও মধ্য যুগে বাংলা গদ্য-শৈলীর কোন ঐতিহ্য গড়িয়া ওঠে নাই।

তথাপি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের আবির্ভাব কাল হইতেই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ইতিহাস আরম্ভ করিতে হইবে, কারণ এই ছন্দেই বাংলা গদ্যের বীজ লুক্কায়িত ছিল। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ গদ্য-ধর্মী। ইহাতে স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতি ও গদ্যের পদ-বিন্যাস অনুসরণ করা হয়। এই শ্রেণীর ছন্দে গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান অত্যন্ত অল্প। সেজন্য সাহিত্যিক গদ্যের উৎপত্তি অনুসন্ধান কালে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের গোমুখী-তীর্থ পর্যন্ত যাইতে হইবে।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে অপভ্রংশ ছন্দ অর্থাৎ শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ প্রধান ছিল। কিন্তু মধ্য যুগে গদ্যধর্মী ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাহাই নহে, ঐ যুগে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের কৃত্রিমতা কমাইয়া তাহাতে ভঙ্গ-প্রাকৃতের স্বাভাবিকতা আনয়ন করার চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি, পয়ার জাতীয় ছন্দে যে-সামান্য বন্ধ-কাঠিন্য রহিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার প্রয়াস ঐ যুগের কোন কোন কবির রচনায়, বিশেষ করিয়া প্রবচন-জাতীয় বাক্যে, গায়েনদের ছড়ায় ও কীর্তনীয়াদের আখরে পাওয়া যাইবে। এ সকল কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। মধ্য যুগের এই গদ্য-প্রবণতায় আধুনিক গদ্যের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের রীতি – গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে ধারাবাহিক ভাবে গদ্য-সাহিত্য রচিত হইতেছে। প্রবন্ধে, আলোচনায়, সাংবাদিকতায়, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে বাংলা গদ্যের

প্রচলন হইয়াছে, এবং বহু শক্তিশালী লেখকের সাধনায় এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এই দেড় শত বৎসরের গদ্য-সাহিত্য পরীক্ষা করিলে ইহাতে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের তিনটি রসোত্তীর্ণ রীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—সাধু রীতি, চলিত রীতি ও মধ্য রীতি। বাংলা সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা হইতে সাধু ও চলিত রীতির উদ্ভব হইলেও, সাধু রীতির রচনা সাধু ভাষাতেই লিখিতে হইবে, এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। অর্থাৎ, চলিত ক্রিয়া-রূপ ব্যবহার করিয়াও সাধু রীতির বাংলা গদ্য লেখা চলে।

সাধু রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তৎসম শব্দের আধিক্য ও সমাস-বাহুল্য। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পরিভাষা ব্যবহার করিলে বলিতে হয়, বাংলা গদ্যের সাধু রীতি বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির মিশ্রণ-জাত। মাধুর্য (elegance) ও ওজোগুণ (strength) ইহার প্রধান অবলম্বন। চলিত রীতিতে তদ্ভব ও দেশী শব্দের অধিক প্রয়োগ হয়। সন্ধি-সমাস পরিহার করিয়া সহজ, সরল ভাষা ব্যবহার করাই ইহার লক্ষ্য। প্রসাদ গুণ, অর্থাৎ যাহা পড়িবা মাত্র বুঝা যায়, এবং 'অর্থ-ব্যক্তি' গুণ বা বাগাড়ম্বর না করিয়া অল্প কথায় দুরূহ বিষয় বুঝাইবার ক্ষমতা—এই দুইটি গুণ চলিত রীতির প্রধান অবলম্বন। সাধু রীতিতে রচনার সুর সর্বদাই উঁচুতে বাঁধা থাকে। কিন্তু চলিত রীতিতে সুরের ওঠা-নামা হয়। অর্থাৎ, আবেগের আতিশয্যে বাগ্‌ভঙ্গী ওজোধর্মী হইলেও পর মুহূর্তে সুর নামিয়া আসিয়া সাধারণ, অনাড়ম্বর ভাষণ-ভঙ্গী অবলম্বন করিতে পারে। ইহাতে 'পতৎ প্রকর্ষ' দোষ হয় না। এই আরোহ-অবরোহ মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম। সেজন্য চলিত রীতিতে ইহা স্বীকৃত। নিয়ম-কাঠিন্যের অভাব ও গতানুগতিকতার প্রতি বিরাগ চলিত রীতির আরও দুইটি লক্ষণ। হাস্য-পরিহাস ও রম্য প্রসঙ্গ এই রীতির উপযুক্ত বিষয়-বস্তু। বাংলা চলিত রীতিতে সংস্কৃতের পাঞ্চালী ও লাটী

রীতির মিশ্রণ পাওয়া যাইতেছে। অনেক লেখক একই রচনায় এই উভয় রীতি মিশাইয়া রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেজন্য বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের একটি মধ্য রীতিও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

বাংলা গদ্য-রীতির ক্রমবিকাশ—পূর্বকালে বাঙালী পণ্ডিতগণের কথাবার্তার ভাষাও কিরূপ সংস্কৃত-বহুল ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মধ্য যুগের বাংলা গদ্যের যে-সামান্য নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতেও সংস্কৃত ভাষার উৎকট প্রভাব লক্ষিত হয়। গদ্যে কিছু লিখিতে হইলেই সে সময় শব্দের সহিত সংস্কৃত বিভক্তি যোগ করা হইত। অষ্টাদশ শতকে কোন কোন লেখকের কবিতার ভাষাতেও সংস্কৃত বিভক্তি পাওয়া যায়। মধ্য যুগের ,সংস্কৃত-মিশ্রিত বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রাচীনকালের পুথি লেখকগণের শপথ-বাক্য-জাতীয় মন্তব্য-গুলির ভাষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, লেখকের দোষো নাস্তি'—এই শ্রেণীর বাংলা গদ্য প্রাচীন পুথি লেখকগণের মন্তব্যে প্রায়ই পাওয়া যায়। আমাদের পত্র-ব্যবহারের ভাষাতেও আমরা এইরূপ সংস্কৃত-মিশ্রিত রীতি অনুসরণ করি। যেমন, এখনও আমরা পত্র লিখিবার সময় লিখি—"শ্রীদুর্গাশরণং", "শ্রীচরণ-কমলেষু," "নিবেদনমিদং", "সমাপেষু", "ইতি শ্রীঅমুকচন্দ্র শর্মণঃ", ইত্যাদি। ইহাই ছিল আমাদের প্রত্নযুগের গদ্য-ভঙ্গী। এই গদ্য-শৈলী হইতে বাংলা সাধু-রীতির উদ্ভব হইয়াছে, বলা চলে।

বাংলা গদ্য লিখিতে বসিলেই সংস্কৃত গদ্যাদর্শের কথা মনে পড়িয়া যাওয়া আমাদের অনেকটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সমসাময়িক কালেও সংস্কৃত প্রভাবিত গদ্য-ভঙ্গীর প্রচলন দেখা যায়। আমাদের গদ্যের এই দুর্বলতা প্রথম ইয়োরোপীয়দের চোখে ধরা পড়ে। ১৮শ

শতকের প্রথম ভাগে মানোয়েল দা আসসুম্পসাম নামে একজন পোর্তুগীস পাদ্রী খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য বাংলা গদ্যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লেখেন। তাঁহার গদ্যে বাংলা ইডিয়ম-ঘটিত অনেক ভুল আছে। ছেদ বিন্যাসের ত্রুটির জন্য তাঁহার ভাষাও আড়ষ্ট। কিন্তু তাঁহার রচনাতেই প্রথম খাঁটি বাংলা গদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি বিদেশী, সেজন্য সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার মোহ ছিল না। বাংলা চলিত ভাষা তিনি যেরূপ শিখিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম গোষ্ঠী—১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। আমাদের গত দেড় শত বৎসরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পরীক্ষা করিলে এই ঘটনার প্রভাব যে কিরূপ সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। শিক্ষা দানের ও শিক্ষা গ্রহণের বিদেশী পদ্ধতি ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ-প্রাকার অতিক্রম করিয়া বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাইয়া দিল।

বাংলা সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান বাংলা গদ্যে রচিত কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক। বাংলা গদ্যের কোন উৎকৃষ্ট আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে না থাকায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা শিক্ষকগণকেই আদর্শ গদ্য-রীতি কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব লইতে হয়। এই গোষ্ঠীর প্রধান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা সাধু রীতির প্রবর্তক। ছেদ-নিয়ন্ত্রণ ও শব্দ-লালিত্যের অভাবে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সুষমা-হীন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার যুগ এবং পরিবেশের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের একজন উৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া গণ্য না হইলেও পথিকৃতের সম্মান অবশ্যই তাঁহার প্রাপ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম গোষ্ঠীর আর একজন কৃতী লেখক উইলিয়ম কেরী। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এই সময় ইংরেজী গদ্যকে সরল ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছিল। উইলিয়ম কেরী আদর্শ গদ্য বলিতে তাঁহাদের দেশে আদর্শ বলিয়া গণ্য সহজ, অনাড়ম্বর গদ্য-ভঙ্গীই বুঝিতেন। সেজন্য তিনি ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ ও স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার 'কথোপকথন' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙালীর কথ্য ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। নারী ও অশিক্ষিত লোকের ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব অল্প। সেজন্য এই গ্রন্থে প্রধানতঃ ইহাদেরই কথোপকথন রেকর্ড করা হইয়াছিল। কেরীর 'ইতিহাস মালা'র (১৮১২) ভাষা মোটের উপর আড়ম্বরহীন, সংযত ও ব্যাকরণ-শুদ্ধ।

কেরীর মুন্‌শী রামরাম বসুও ফোর্ট উইলিয়ম গোষ্ঠীর একজন খ্যাতনামা লেখক। তিনি ভাল ইংরেজী বলিতেন। আরবী-ফারসীতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার গদ্য রীতিতেই প্রথম সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর একটি বিষয়ে রামরাম বসুর গদ্যে আধুনিকতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। আধুনিক বাংলা গদ্যে অনেক স্থলে ইংরেজী ইডিয়ম ও বাক্য-বিন্যাস ব্যবহৃত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম গোষ্ঠীর বাঙালী লেখকদের মধ্যে তাঁহার রচনাতেই ইংরেজী গদ্য-ভঙ্গীর প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি বহুস্থলে বাংলা বাক্যে ইংরেজী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়ার পরে কর্ম-পদ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,

"ইহাতে রাজা প্রথমতঃ তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকের দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা মারিয়াছে। তাহারা তত্ত্ব করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে।"

রামরাম বসুর রচনায় মাঝে মাঝে বাগ্‌ভঙ্গীর বা ষ্টাইলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন,

"রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারই করতলে। এই মতে বৈভবে কতককাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি একছত্রী রাজা হইব এদেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানের দিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছুকাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য।" (প্রতাপাদিত্য চরিত্র)

রাজা রামমোহন রায়—এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাহিরেও বাংলা গদ্য-রীতির উন্নতি-বিধানের চেষ্টা চলিতে থাকে। মণীষি রাম-মোহন এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। পদ্যের বৈশিষ্ট্য rhyme বা মিল, এবং গদ্যের বৈশিষ্ট্য reason বা যুক্তি। আধুনিক যুগ গদ্যের যুগ। সেজন্য যুক্তি-নিষ্ঠ রচনাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ দান। রামমোহন বাংলার এই মননশীল সাহিত্যের জনক। তিনি বাংলা গদ্যে কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

সাময়িক পত্র ও বাংলা গদ্য—উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এদেশে সংবাদপত্রের প্রচলন হয়। গদ্য-ভঙ্গীর উৎকর্ষ-সাধনে সাময়িক পত্রের দান অপরিসীম। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতকে সাংবাদিকদের ব্যস্ত লেখনী-মুখে ইংরেজী গদ্যের আতিশয্য ও আড়ষ্টতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল। বাংলা গদ্য-ভঙ্গীও সাংবাদিকদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। প্রথম যুগের সাংবাদিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত—প্রথম যুগের সাংবাদিকগণের রচনাতেই বাংলা গদ্যের শক্তি ও সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। সেজন্য গত শতকের চতুর্থ দশকে এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুভার তথ্য

অনায়াস-লভ্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়-কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ব-বোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের ও বাঙালীর যুক্তি-নিষ্ঠ রচনাবলীর ইতিহাসে এই পত্রিকার দান অবিস্মরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন, 'তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—মৃত্যুঞ্জয়ের পরবর্তী যুগে সাধু রীতিকে মার্জিত করিয়া তোলাই ছিল গদ্য-লেখকগণের প্রধান চেষ্টা। সেজন্য তাঁহারা যথাসম্ভব দুরূহ সংস্কৃত শব্দ বর্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গদ্য-রচনাও যে এক প্রকার শিল্প-কর্ম তাহা প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যেই পরিস্ফুট হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা-গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" ছেদ-চিহ্নের সাহায্যে বাক্যাংশ-গুলিকে সামঞ্জস্য-পূর্ণ ভাবে সাজাইয়া গদ্য রচনা করিলে তাহাতেও যে এক প্রকার অস্ফুট ছন্দস্পন্দের উদ্ভব হয়, একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যেই প্রথম ছেদ-নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু শব্দ-নির্বাচন সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়।

প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন—বিদ্যাসাগর ও তাঁহার সমসাময়িক প্রবন্ধ-লেখকগণের গদ্যে সাধু রীতি এবং সাধু ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই যুগে চলিত রীতিও মার্জিত হইয়া উঠিতে থাকে। রামমোহন চলিত রীতির অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু গুরু-গম্ভীর বিষয়বস্তুর পক্ষে চলিত রীতি উপযুক্ত হইবে না, ইহাই ছিল সে যুগের লেখকগণের ধারণা। তাই তাঁহারা সাধু রীতিকেই সহজ, সরল করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

পরে ঐ শতকের মধ্যভাগে যখন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বাস্তব-ধর্মী লৌকিক আখ্যায়িকা রচনায় প্রবৃত্ত হন, সে সময় তাঁহারা দেখিলেন অক্ষয়-ভূদেবের প্রবন্ধ-সাহিত্যের গদ্য বা বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও শকুন্তলার গদ্য বাস্তব-ধর্মী গল্প-উপন্যাসের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। সেজন্য তাঁহারা চলিত রীতি অবলম্বন করিয়া আধুনিক গল্প-উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা-রীতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় (১৮৬২) চলিত রীতি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। তুলনীয় :

"এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে ২ কালা মেঘ আছে—রাস্তা ঘাট সেঁত সেঁত করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম সকম দেখিয়া কেহ২ বলিল—ওগো বাবু ঝাকা মুটের উপর বসে যাবে? তাহা হইলে দু পয়সায় হয়।" (আলালের ঘরের দুলাল)

কয়েকটি শব্দের archaism বাদ দিলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ও আধুনিক অন্যান্য গল্প-লেখকদের ভাষাই উদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইবে। 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র ভাষা অনেক বেশী কথ্য-ধর্মী। যেমন,

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হ'য়ে পড়ল; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যালো। জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অসুরের ঢাল তলয়ার, নানা রঙের ছোবান প্রিভিমের কাপড় ঝুলতে লাগ্‌লো; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে; 'মধু চাই!' 'শাঁখা নেবে গো!' বোলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে।

বঙ্কিমচন্দ্র—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। সেজন্য সমসাময়িক সমস্ত ধারাই তাঁহার সাহিত্যে আসিয়া মিলিত হয়। এ যুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এইরূপ ধারা-সঙ্গম পাওয়া যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে যুক্তিবাদী গদ্য-লেখক ও স্রষ্টা-সাহিত্যিক ছিলেন। এই উভয় শ্রেণীর সাহিত্যে তিনি অনেকটা একই গদ্য-রীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার গদ্য-রীতি অক্ষয়-বিদ্যাসাগর-ভূদেবের সাধু-রীতি এবং প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহের চলিত রীতির মধ্যবর্ত্তী। সেযুগে এইরূপ রীতি-মিশ্রণ রক্ষণশীলদের মনঃপূত হয় নাই। সেজন্য তখন এই শ্রেণীর মধ্যরীতিকে পরিহাস করিয়া 'শব-পোড়া মড়া দাহের ভাষা' বলা হইত।

উনিশ শতকে নাটক—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে নাটকের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ যুগে নাটক বাংলা গদ্যের উৎকর্ষে বিশেষ সহায়তা করে নাই। গত শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র শক্তিশালী লেখক ছিলেন। কিন্তু তিনি গৈরিশছন্দের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ তাঁহার নাটকের সংলাপে গদ্যের কোন বিশিষ্ট রস-ধারা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

বিবেকানন্দ—গদ্য রীতির উৎকর্ষ-বিধানে সংবাদ-সাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের দান আলোচনা করা হইল। বাগ্মিতাও গদ্য-রীতির ক্রম-বিকাশে সহায়তা করিয়া থাকে। এডমাণ্ড বার্কের ওজস্বিনী বক্তৃতাবলী ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের সম্পদ্‌। গত শতকে একজন বিশ্ব-বিজয়ী বাগ্মীর আবির্ভাব আমাদের এই দেশকে ধন্য ও বাংলা গদ্য-রীতিকে সমুন্নত করিয়াছিল। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। এই মহাপুরুষের উদাত্ত আহ্বান পরাধীন দেশবাসীর মনে নবীন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তাহাদিগকে জ্ঞানের ও কর্মের পথে অগ্রসর হইতে উদ্বুদ্ধ করে।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য—রবীন্দ্রনাথ গত শতকের শেষ ভাগেই সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেও, আমরা তাঁহাকে দিয়া বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করিতে চাই। কারণ এই অর্ধ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য তাঁহারই আলোকে উদ্ভাসিত। তিনি এ যুগের লেখকমণ্ডলের মধ্যমণি।

রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের গদ্য তিন শ্রেণীর—সাধু রীতির গদ্য, চলিত রীতির গদ্য ও গদ্যছন্দ। তাঁহার সাহিত্য- ও সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে সাধু রীতির চরম উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। মাধুর্য, ওজঃ প্রভৃতি সাধু রীতির সমস্ত গুণই তাঁহার এই সকল রচনায় বর্তমান। অথচ আতিশয্য, উৎকট শব্দ-প্রয়োগ প্রভৃতি দোষ তাঁহার গদ্যে নাই। সাধু রীতির গদ্যে এরূপ অনাড়ম্বরতা ও সাবলীলতা অল্প লেখকের রচনাতেই পাওয়া যাইবে। মোহিতলাল মজুমদারের গদ্যে রবীন্দ্রনাথের সাধু রীতির অনেকগুলি গুণ পাওয়া যায়।

চলিত রীতির গদ্যও রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে পরম সৌষ্ঠব লাভ করে। তাঁহার শেষের কবিতার ভাষায় চলিত রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই। কেরীর 'কথোপকথনে' যে-ভাষা অমার্জিত ও অসংস্কৃত অবস্থায় গদ্য-রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই উপাদান লইয়াই রমণীয় শিল্প রচনা করিলেন। এই চলিত রীতিই আরও বাহুল্য-বর্জিত ও সংযত-বন্ধ হইয়া তাঁহার লিপিকায় গদ্যছন্দে পরিণত হয়।

প্রমথ চৌধুরী—প্রকৃত পক্ষে চলিত রীতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্রের অন্যান্য লেখকগণ। উনিশ শতকে এই চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, বিগত যুগের লেখকগণ মৌখিক ভাষাকেই সাহিত্যিক গদ্যের গুরুভার অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সাহিত্যের ভাষাকে সর্বভাব-প্রকাশক্ষম ও ব্যঞ্জনাময় হইতে হইবে। দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষায় এই দুইটি গুণ থাকিবার কথা

নহে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় মোট প্রায় তিন হাজার শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং এই শব্দগুলির অর্থ নির্দিষ্ট থাকাই কথ্য ভাষার পক্ষে সুবিধাজনক। এই তুচ্ছ উপাদানে সাহিত্যের কলা-কৌশল কি করিয়া সম্ভব? এই তত্ত্বটি বুঝিতে না পারায় কেরীর 'কথোপকথন' সাহিত্য গ্রন্থ হয় নাই, এবং 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র ভাষায় গ্রাম্যতা-দোষ পীড়াদায়ক। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় যে-ভাষা ব্যবহৃত হইল তাহা নিছক কথ্য ভাষা নহে। ইহাতে ক্রিয়ার কথ্য-রূপ ব্যবহৃত হইলেও, তিনি প্রয়োজন মত সংস্কৃত শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। এবং বাক্যাংশের পরিমাপ-গত সামঞ্জস্য ভঙ্গ না হইলে, সন্ধি-সমাসেও তিনিও আপত্তি করেন নাই। এইভাবে তাঁহার চেষ্টাতেই প্রথম কথ্য ভাষা সাহিত্যিক গদ্যে রূপান্তরিত হয়। দুরূহ ও শ্রুতিকটু হইত বলিয়াই পূর্বে সংস্কৃত শব্দে আপত্তি ছিল। কিন্তু বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে সুললিত শব্দের অভাব নাই। প্রমথ চৌধুরীর সাফল্যের একটি প্রধান কারণ শব্দ-নির্বাচনে ও শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে তাঁহার দক্ষতা। মৌখিক ভাষার ক্রিয়া-রূপ ব্যবহার করিয়াও তিনি সাহিত্যিক গদ্যের একটি অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। কারণ বাস্তব-ধর্মী রম্য রচনায় ক্রিয়ার সাধু রূপ রসসৃষ্টির পরিপন্থী। তবে ক্রিয়ার কথ্য-রূপ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে চলিত রীতির লেখক বলিতেছি না। চলিত রীতির যে-সকল লক্ষণের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। বাগাড়ম্বর ও বাহুল্যের অভাব, অল্প কথায় দুরূহ বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা, গতানুগতিকতার প্রতি বিরাগ, প্রভৃতি গুণ তাঁহার রচনাকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করিয়াছে। এ পর্যন্ত সাধু ভাষাকে সরল ও শ্রুতিমধুর করিয়া লৌকিক করিবার চেষ্টা হইতেছিল। প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষাকেই মার্জিত করিয়া সংস্কৃত-ধর্মী করিবার চেষ্টা করিলেন। সেজন্য চলিত রীতির লেখকগণের মধ্যে তাঁহার ষ্টাইল স্বতন্ত্র। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

চলিত রীতির আর একজন শক্তিমান লেখক। তাঁহার ভাষা আরও সংস্কৃতধর্মী।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং আরও অনেকেই আধুনিক যুগে সাহিত্যিক গদ্য রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সেজন্য বাংলা গদ্যে নানা প্রকার ষ্টাইল বা ব্যক্তিগত ভঙ্গী পাওয়া যায়। ইহাদের কোন্‌টিকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হইবে? আমাদের মনে হয়, এক এক প্রকার বিষয়-বস্তুর পক্ষে এক একটি ষ্টাইল উপযুক্ত। যেমন, মননশীল প্রবন্ধের জন্য রবীন্দ্রনাথের সাধু রীতিই আদর্শ। বর্ণনামূলক রচনায় শরৎচন্দ্রের লৌকিক রীতিই শ্রেষ্ঠ। এবং personal essay-জাতীয় রম্য রচনায় বীরবলী ষ্টাইল অনুকরণ-যোগ্য।

বাংলা গদ্য রীতির ভবিষ্যৎ—বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ রূপ বর্তমান না থাকায় গত শতকের লেখকগণ সাহিত্যিক গদ্যের রূপ নির্ণয়ের জন্য গদ্য ভঙ্গী লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলেই সেযুগে একাধিক রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই সার্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে, অধিক সংস্কৃত ব্যবহার করিলে বাংলা গদ্য প্রাণহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ, নিছক কথ্য ভাষা কখনও সাহিত্যের বাহন হইতে পারে না। আদর্শ গদ্য সৃষ্টি করিতে হইলে বাংলা সাধু রীতিকে যেরূপ চলিতধর্মী করা আবশ্যক, সেইরূপ চলিত রীতিকেও কিছুটা সংস্কৃত ভাবাপন্ন না করিলে তাহা রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, আধুনিক সাহিত্যে বীর-করুণ-মধুর ইত্যাদি রসের অবতারণা এতই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন রীতি ও গুণের বিভেদ এখন সব সময় রক্ষা করা চলে না। এই সকল কারণে বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যিক গদ্যে সাধু ও চলিত রীতির ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এখন শাস্ত্র-বর্ণিত

রীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ষ্টাইল সম্বন্ধে লেখকগণ অধিক মনোযোগী।

পদ্যছন্দে গদ্যের প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দীর পদ্যে গদ্য প্রভাব—এই অধ্যায়ের সূচনায় আমরা বলিয়াছি, আধুনিক যুগ গদ্যের যুগ। এই যুগে শুধু যে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা নহে, পদ্য ভঙ্গীর গদ্যীকরণও এই যুগের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। পদ্যভঙ্গীর উপর গদ্যের প্রভাবের কথা আমরা এবার আলোচনা করিব। গদ্য ও পদ্যের প্রধান পার্থক্য হইল, পদ্যের নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ বা ছন্দোবন্ধ আছে, গদ্যের নাই। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ গদ্যধর্মী, তাহা সত্ত্বেও ইহাতে পদ্যের নিয়মিত বন্ধন বর্তমান। এই বন্ধন মধ্য যুগের শেষ দিকে কীর্তনীয়া ও গায়েনদের আখর ও ছড়ায় শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে।

ঈশ্বর গুপ্ত—উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পয়ার-ত্রিপদীতে বন্ধ-লঙ্ঘনের চেষ্টা ছিল না বটে, কিন্তু তিনি কবিতার ভাষায় চলিত শব্দ অধিক ব্যবহার করিয়া পদ্যের কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার কাব্যের বিষয়-বস্তু লৌকিক জগৎ হইতে আহরিত হইয়াছিল। সেদিক দিয়াও তাঁহার সাহিত্য আধুনিক যুগের এবং এই গদ্য যুগের উপযোগী।

মধুসূদন—পরে উনিশ শতকের মধ্য ভাগে ছেদ-নির্ভর গদ্যভঙ্গী যখন অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় উৎকর্ষ লাভ করে, সেই সময় মধুসূদন ইংরেজী blank verse-এর মধ্যে গদ্য যুগের উপযোগী নূতন এক ছেদ-নিষ্ঠ পদ্যভঙ্গীর সন্ধান লাভ করেন। কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ অপেক্ষাও অধিক গদ্যধর্মী। প্রথমতঃ, ইহাতে মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়তঃ,

ইহাতে পর্ব-বন্ধন নাই। তৃতীয়তঃ, এই ছন্দ যুগ্মকের বৈচিত্র্যহীনতা ও অস্বাভাবিকতা হইতে মুক্ত। মধুসূদনের সমসাময়িক অনেক কবিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনা করিলেন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্র ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহাদের রচনায় এতটা পরিস্ফুট হয় নাই। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল ও নবীনচন্দ্রও সক্ষম কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অমিত্র ছন্দ প্রকৃত পক্ষে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। অনেক স্থলে তাঁহাদের ছন্দ অমিত্রাক্ষর পয়ারে পর্যবসিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র—মধুসূদন পয়ার পংক্তির ৮+৬-এর দ্বিপদী গঠন বর্জন করিলেও পয়ারের চতুর্দশ-মাত্রিক গঠন তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন। গৈরিশ ছন্দে এই বন্ধনটুকুও অপসারিত হইল। ইহার ফলে ছন্দের প্যাটার্ণ সম্পূর্ণ ভাবে ভাঙিয়া দিয়া পদ্য পংক্তিগুলি ছেদ-নির্ভর, অসম, যুগ্ম-মাত্রিক অংশে গঠিত হইতে লাগিল।

বিংশ শতাব্দীর পদ্যে গদ্য প্রভাব—মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্র গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি সাহিত্যের বহিরঙ্গ সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিল। রসের ব্যাপারে পুরাতন পদ্ধতিকেই তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে মানিয়া লইয়াছিলেন। বীররস ও ভক্তিরস মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। মধুসূদন অমিত্র-ছন্দে প্রথমটি এবং গিরিশচন্দ্র গৈরিশ ছন্দে দ্বিতীয়টি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।

আধুনিক সাহিত্য—বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে গতানুগতিকতার প্রতি বিরাগ আরও গম্ভীর ভাবে দেখা দেয়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। আমাদের এই নূতন সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইল বাহুল্য-বর্জন। সাহিত্য বলিতে যে-শ্রেণীর অতিকথন-মূলক রচনা বুঝায়, তাহা পড়িতে পড়িতে অনেক সময় হ্যামলেটের মত বলিতে ইচ্ছা করে—'Words, words, words'।

নূতন যুগের সাহিত্যে সুনির্বাচিত শব্দের সাহায্যে সীমাহীন ভাব-ঐশ্বর্য ফুটাইয়া তোলাই লক্ষ্য। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ক্লাসিকাল উপমা-রূপকের গতানুগতিকতা বর্জন করিয়া নূতন নূতন স্বতঃস্ফূর্ত imagery বা শব্দ-চিত্র রচনা। তাহা ছাড়া, নিঃস্ব ব্যক্তির দানশীলতা অভিনয় মাত্র। সেইরূপ ভাবহীনের কাব্য রচনাও আন্তরিকতাহীন 'ন্যাকামী' ছাড়া অন্য কিছু নহে। নূতন বাংলা সাহিত্যে নিষ্ঠার অভাব কখনও মার্জনা করা হয় না। সংক্ষেপে ইহাই নবযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী এই নবযুগের প্রবর্তক। আধুনিক যুগের অনেক কবি এই নূতন টেকনিকে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

গদ্যছন্দ—এই নূতন সাহিত্যে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ, ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ, দেশজ ছন্দ, মুক্তক, অতিমুক্তক, প্রভৃতি নানা ছন্দ-শৈলী ব্যবহৃত হইলেও গদ্যছন্দই এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাহন হইবার অধিকারী। তবে আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরিতে হইবে। ইত্যবসরে গদ্যছন্দের রূপ আরও মার্জিত ও পরিণত হওয়া আবশ্যক। আমরা এখনও সঙ্গীতধর্মী ছন্দেই অধিক অভ্যস্ত; গদ্যছন্দের সূক্ষ্ম ছন্দস্পন্দে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে আমাদেরও আরো কিছু সময় লাগিবে। বাংলা গদ্যছন্দের যশস্বী লেখকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য, এবং তাঁহার 'লিপিকা' একখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ।

পদ্যের ছন্দ প্রস্ফুট, কিন্তু গদ্যের ছন্দ অস্ফুট। পদ্যছন্দে ও গদ্যছন্দে ইহাই প্রধান পার্থক্য। পদ্যে ছন্দ উৎপাদন করে 'যতি', গদ্যে ছন্দ উৎপাদন করে 'ছেদ'। যতির ধর্ম, কবিতার চরণগুলিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত করা। এই সকল খণ্ড বা পর্ব দৈর্ঘ্যে অসম হইলেও তাহাদের আবর্তনে নিয়ম ও শৃঙ্খলা থাকে। সেই জন্যই পদ্যে প্রস্ফুট ছন্দ উৎপন্ন হয়, এবং পদ্যছন্দের নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ থাকে।

গদ্যে 'যতি' নাই, আছে 'ছেদ'। ছেদ-বিভক্ত বাক্যে বাক্যাংশের কোন নির্দিষ্ট মাপ নাই, সেজন্য গদ্যের কোন নির্দিষ্ট রূপও নাই। এই ছেদকেই সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্যাংশের দ্বারা গদ্যে রূপের ও ছন্দের আভাস আনা কঠিন শিল্প-কর্ম! গদ্যছন্দে যতির যাদু-স্পর্শ নাই, বাংলা ছন্দের যুগ্ম চলনও নাই। ইহাতে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা যাইবে না, ও বাংলা গদ্যের syntax মানিয়া চলিতে হইবে। অনুপ্রাস-যমকের ঝঙ্কারে মন ভুলাইতে দেওয়া হইবে না; ক্লাসিকাল উপমা-রূপকের সাহায্যে ইনাইয়া বিনাইয়া কাব্য রচনা করাও ইহাতে নিষিদ্ধ। গদ্য-ছন্দের এই সকল বিধি-নিষেধের নিবৃত্তি-মার্গে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শিল্প-দক্ষতা ও ভাবের ঐশ্বর্য অনন্যসাধারণ, সন্দেহ নাই। এই ছন্দ-পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বে ১২৯-৩৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে। নীচে গদ্যছন্দের কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি; স্থানাভাবে সমগ্র কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারিব না, ইহাই দুঃখ:

(১) ভোর বেলায় সবাই কাঁদছে, দেখবে,
আলো চেয়ে,
গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে,
আলো দিয়ে ফোটাও।
ওই যে ক্ষেতের মাঝে একটা কাস্তে, চাষারা ভুলে এসেছে,
সে ভিজে মাটিতে প'ড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো,
একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে
চারদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

(অবনীন্দ্রনাথ, 'কুকড়ো')

(২) নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা।
ব্যবসায়ী সংসার
বারে বারে পাকা ধানে মই দিল,
চোখ বেঁধে আজ জুয়ের খেলায় ভাসা।
তবু ও চারি ধারে অদৃশ্য ধ্বংসের গ্রেনিয়ার।

(সমর সেন, 'বকধার্মিক'

(৩) হেমন্তের এই আলোর বন্যাময় শান্ত বাংলা দেশের গ্রাম
যতদূর দেখা যায় সোনার ফসল
মাঠের উপর স্তরের মতো নুয়ে পড়েছে
শান্ত নির্বাক সূর্যের উষ্ণ কোমল স্পর্শ
একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইলো
বাঁশ বন সির-সির করছে
একটা ফড়িং লাফিয়ে চোর-কাঁটার বনে অদৃশ্য হোলো
আকাশে শঙ্খচিল—
হঠাৎ দূরের মাঠ চিরে কালো মাল-গাড়ি চলে গেলো
হেমন্তের পরিপূর্ণ পড়ন্ত বেলায়
কী নিরর্থক ভাবা :
একদিন ছিলুম,
একদিন থাকবো না। (কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'ধুলো')

অনেক সময় গদ্য ছন্দে মাঝে মাঝে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া পদ্যের আভাস আনা হয়। যেমন,

তালিকা প্রস্তুত :
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নির্বাসিত কেরাণী।
বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।
যার এক খণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকরের আমিত্ব।
যত দিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কাণ, বাইরের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।
আপন জনকে ভালোবাসা,
বাঙ্‌লার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ী-ফেরার আশা।

(অমিয় চক্রবর্তী, 'বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন')

অতিমুক্তক—গদ্যছন্দের যে-সকল শিল্প-সূত্রের কথা উপরে বলা হইল, ঐ তালিকা হইতে কবিতার যুগ্ম চলন সম্পর্কিত সূত্রটি বাদ দিয়া ছন্দ রচনা করিলে, তাহা হইবে 'অতিমুক্তক'। এই গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। যতি ছন্দের গঠন নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। যতিকে এই সুযোগ না দিয়া চার, ছয়, আট ও দশ মাত্রার পর্ব বা অংশ অনিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিয়াও কবিতায় ছন্দস্পন্দ উৎপন্ন করা যায়। ইহাই অতিমুক্তক ছন্দের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মিত্রাক্ষর নাই, নির্দিষ্ট গঠনও নাই। ইহাতে যুগ্মমাত্রিক চলনের সাহায্যে পদ্যের আভাস আনা হয়, কিন্তু গদ্যের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করা হয় না।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই | এখনো অটুট !
ছড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো ক'রে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দল ছাড়া ঘুরে ফিরে | দেশে আর কালে।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'ফৌজ')

এই ছন্দে পদ্যের ভাষা ব্যবহার করিলে ছন্দটি গৈরিশের পর্যায়ভুক্ত হইবে। তুলনীয় :

ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি ; কর্ম মাঝে, মর্ম মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর !
মুক্তি শুধু মরীচিকা—সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছো বন্দী চিরন্তন।

(বুদ্ধদেব বসু, 'বন্দীর বন্দনা')

মুক্তক—অতিমুক্তকে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিলে এবং পদ্য পংক্তিতে পর্ব-বৈচিত্র্য থাকিলে, তাহা হইবে মুক্তক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে এই ছন্দের উৎকর্ষ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মুক্তকে মিত্রাক্ষরকে প্রাধান্য দিয়াছেন। অনেক আধুনিক কবি মুক্তকে মিত্রাক্ষরের ক্রমভঙ্গ করিয়া অথবা সদৃশ ধ্বনির মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া তাহাকে অপ্রধান রাখিবার কৌশল প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের মুক্তক ছন্দ অধিক গদ্যধর্মী। যেমন,

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোন এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর,—
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
বাদামি-সোনালি-সাদা-ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ 'মাইল' ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে !

(জীবনানন্দ দাশ, 'পাখীরা')

এই গ্রন্থের ১১৬-১৯ পৃষ্ঠায় মুক্তক সম্বন্ধে আলোচনা ও মুক্তকের অন্যান্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

পদ্যছন্দের উৎকর্ষ

উনিশ শতকে পদ্যছন্দের উৎকর্ষ - মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে তৎসম ছন্দ, দুই প্রকার প্রাকৃতজ ছন্দ (শুদ্ধ-প্রাকৃত ও ভঙ্গ-প্রাকৃত) এবং দেশজ ছন্দ—এই চারি প্রকার ছন্দ-শৈলীর প্রচলন ছিল। ইহাদের মধ্যে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের ও তৎসম ছন্দের উৎকর্ষ সাধিত হয় উনিশ শতকে। অবশিষ্ট দুই শ্রেণীর ছন্দ বিংশ শতকের লেখকদের রচনায় পরম রমণীয়তা লাভ করে।

মধ্য যুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ প্রাধান্য লাভ করে। এই শ্রেণীর একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দের প্যাটার্নগুলি মোটের উপর তখন বেশ সুগঠিত ছিল। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি, অক্ষরের সম্প্রসারণ-মূলক দীর্ঘ উচ্চারণ শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য। এক শ্রেণীর শব্দান্ত অক্ষর ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অক্ষরই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে হ্রস্ব। মধ্য যুগের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সুলভ। কিন্তু উনিশ শতকে ভঙ্গ-প্রাকৃতের নিয়ম সম্বন্ধে কড়াকড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য অষ্টাদশ শতক অপেক্ষা এই শতকের কাব্যে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের রূপ আরও শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে। ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত পুথির পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে মৌলিক স্বরধ্বনির দীর্ঘ প্রয়োগ সুলভ। ইহার ৩০ বৎসর পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সংশোধিত সংস্করণ সম্পাদন করেন। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে শব্দের শেষে অ-কারের লোপজনিত ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ছাড়া অন্য সব অক্ষরই লঘু। তর্কালঙ্কার এই নিয়ম অনুযায়ী পূর্ব সংস্করণের ছন্দাশুদ্ধিগুলি শোধন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, গত

শতকের প্রথম দিকেই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের মাত্রা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম সংস্করণে ছিল,

তুই ছার দুরাচারী হরিলে পরের নারী
'জীবনে' নাহি তোর ভয়
দশরথ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
'শ্রীরাম' তাহার তনয়।

তর্কালঙ্কার ছন্দ সংশোধন করিয়া লিখিলেন,

তুই ছার দুরাচারী হরিলি পরের নারী
'পরলোকে' নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
'শ্রীরাম যে' তাহার তনয়॥

সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয়, এই শতকে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে অক্ষরের মাত্রামূল্য অনেকটা নির্দিষ্ট হইয়া পড়িল। আমরা এই ছন্দকে মাত্রাছন্দ বলিয়া গণ্য করিতেছি, সেই জন্য কথাটা এই ভাবে বলা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, সে যুগে এই শ্রেণীর ছন্দকে, অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দকে 'অক্ষর ছন্দ' বলা হইত, এবং এই ক্ষেত্রে 'অক্ষর' শব্দের অর্থ বর্ণ বা হরফ। লেখকগণ তখন হরফ গুণিয়া পদ্য পংক্তির পরিমাপ ঠিক রাখিতেন। কিন্তু হরফ গুণিয়া ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের বিশ্লেষণ অবৈজ্ঞানিক, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরেও এবিষয়ে আলোচনা করিব। এই পদ্ধতি অত্যন্ত পুরাতন ও এক প্রকার 'গোজামিল' ছাড়া আর কিছু নহে। পরবর্তী যুগের মাত্রা-পদ্ধতি অনুসারেই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে হরফ গুণিয়া ছন্দের মাপ ঠিক রাখিবার পদ্ধতিটি সূক্ষ্ম বিচারে না টিকিলেও, ইহা যে এক প্রকার চলনসই পদ্ধতি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা খুব উৎকৃষ্ট অঙ্কুশ না হইলেও,

ইহার তাড়নেই উনিশ শতকের কাব্যে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের চলন খুব সংযত হইয়া পড়ে।

গঠন-পারিপাট্যেও এই ছন্দ উনিশ শতকে উৎকর্ষ লাভ করে। মধ্য যুগে এই ছন্দে ছয়, আট ও দশ মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইলেও, সে সময় প্রতি পংক্তিতে পর্বের সংখ্যা এবং প্রতি গুচ্ছে চরণের সংখ্যা প্রায় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকিত। ফলে মধ্য যুগের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে বৈচিত্র্য অল্প। উনিশ শতকের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে পংক্তি ও স্তবকের নানা প্রকার বৈচিত্র্য দেখা দিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন ও বিহারীলালের রচনায় ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের গঠন-বৈচিত্র্য সর্বাপেক্ষা অধিক।

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে ছন্দ-বৈচিত্র্যের প্রধান কারণ, এই সময় ইংরেজী লিরিক কবিতার অনুকরণে বাংলা সাহিত্যেও ভাবপ্রধান কবিতা রচিত হইতে থাকে। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য এবং বিহারী-লালের 'সারদামঙ্গল' 'সাধের আসন', 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'শরৎকাল' এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য রচনা।

মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে সমপংক্তিক ছন্দই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। ছয়, আট অথবা দশ মাত্রার পর্ব গঠিত একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী যুগ্মকই ছিল তখন প্রধান প্রধান ছন্দোবন্ধ। কোন কোন কবি ত্রিপদী ছন্দের আরম্ভে একটি একপদী বা দ্বিপদী পংক্তি ব্যবহার করিতেন। ভারতচন্দ্রের রচনায় মিশ্র-পংক্তিক পদ্যের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। তিনি যুগ্মকের বৈচিত্র্যহীনতা দূর করিবার জন্য মিশ্র-পংক্তিক ছন্দে স্তবক-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। এই বিষয়ে পূর্বে ২০১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে। মধুসূদন এবং বিহারীলাল তাঁহাদের লিরিক রচনায় এই ধারা অনুসরণ করিয়া একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর মিশ্রণে নানা গঠনের নূতন নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করেন। আখ্যানপ্রধান কবিতায় যুগ্মকের একটানা গতি আবশ্যক। কিন্তু লিরিক বা ভাবপ্রধান কবিতায়

রচনাটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। সেজন্য এই শ্রেণীর কাব্যেই স্তবক-বিভাগ অপরিহার্য। বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীকারগণ এবং ভারতচন্দ্র তাঁহাদের রচনায় স্তবক-বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহাদের কবি মন লিরিকধর্মী।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য নানা প্রকার পংক্তি গঠিত স্তবকের বৈচিত্র্যে অতুলনীয় বিহারীলালের লিরিক কাব্যে একপদী চরণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। একপদী চরণে মিত্রাক্ষরের ক্রম-বিন্যাসে বৈচিত্র্য আনিয়া এবং মাঝে মাঝে একপদী ব্যতীত অন্য প্রকার পংক্তি ব্যবহার করিয়া স্তবক গঠন করাই বিহারীলালের রচনার বৈশিষ্ট্য। বিহারীর 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' স্তবক-বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। ইহাতে সম্পৃক্ত স্তবকও সুলভ। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের দৃষ্টিতে যে বিস্ময় ও আনন্দ, যে প্রকৃতিময়তা, ভাবময়তা, আবেগ ও সৌন্দর্য-লোলুপতা পাওয়া যায়, বিহারীলাল তাহা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রোমান্টিক ভাবোদ্বেলতা অনেক সময় তাঁহার কবিতার ছন্দকেও স্তবকের গণ্ডীবদ্ধ হইতে দেয় নাই। কিন্তু মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে স্তবকের প্যাটার্ণ বা রূপ নির্দিষ্ট। নীচে মধুসূদন ও বিহারীলালের রচনা হইতে কয়েকটি স্তবক গঠনের উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইল। হেমচন্দ্রের কাব্য হইতে নানা প্রকার স্তবকের উদাহরণ কাব্য-নির্ণয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।—

(১) আয়, পাখী, আমরা দুজনে I	একপদী চরণ, মিত্রাক্ষর	ক
গলা ধরাধরি করি | ভাবি লো নীরবে ; I	দ্বিপদী " "	খ
নবীন নীরদে প্রাণ | তুই করেছিস দান |		
সে কি তোর হবে ? I	ত্রিপদী " "	খ
আর কি পাইবে রাধা | রাধিকা-রঞ্জনে I	দ্বিপদী " "	ক
তুই ভাব ঘনে, ধনি ! | আমি শ্রীমাধবে I	দ্বিপদী " "	খ

(ব্রজাঙ্গনা, 'ময়ূরী')

( ) হে বসুধে জগতজননী ! I	একপদী চরণ, মিত্রাক্ষর	ক
দয়াবতী তুমি, সতী, | বিদিত ভুবনে !I	দ্বিপদী " "	খ
যবে দশানন-অরি, I	একপদী " "	গ
বিসর্জিলা হুতাশনে | জানকী সুন্দরী, I	দ্বিপদী " "	গ
তুমি গো রাখিলা বরাননে। I	একপদী " "	খ
তুমি, ধনি, দ্বিধা হ'য়ে | বৈদেহীরে কোলে লয়ে, |		
জুড়ালে তাহার জ্বালা | বাসুকি-রমণী ! I	চৌপদী " "	ক

(ব্রজাঙ্গনা, 'পৃথিবী')

(৩) সেই আমি, সেই তুমি, I	একপদী চরণ, মিত্রাক্ষর	ক
সেই এ স্বরগ ভূমি, I	" " "	ক
সেই সব কল্পতরু, | সেই কুঞ্জবন ;	দ্বিপদী " "	খ
সেই প্রেম, সেই স্নেহ, I	একপদী " "	গ
সেই প্রাণ, সেই দেহ ; I	" " "	গ
কেন মন্দাকিনী-তীরে | দুপারে দুজন ! I	দ্বিপদী " "	খ

(সারদামঙ্গল, ৩য় সর্গ)

(৪) ওই যে সুন্দর শশী, I	একপদী চরণ, মিত্রাক্ষর	ক
আলো ক'রে আছে বসি ! I	" " "	ক
চিরদিন হিমালয়, I	" " "	খ
কি সুন্দর জেগে রয় ! I	" " "	খ
সুন্দরী জাহ্নবী চির | বহে কলস্বনে I	দ্বিপদী " "	গ
সুন্দর মানব কেন, I	একপদী " "	ঘ
গোলাপ-কুসুম যেন, I	" " "	ঘ
ঝরে যায়, মরে যায় | অতি অল্প ক্ষণে। I	দ্বিপদী " "	গ

(সাধের আসন, ৯ম সর্গ)

(৫) এই যে উঠেছে ধূমকেতু !	একপদী চরণ, মিত্রাক্ষর	ক
কে বলে রে অমঙ্গল হেতু ! I	" " "	ক
কি মহান্ শুভ্র পুচ্ছ, I	" " "	খ
গ্রহ তারা করি তুচ্ছ, I	" " "	খ
ওড়ে যেন বিজয়ের কেতু ! I	" " "	ক

আমরা সংক্ষেপে উনিশ শতকের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে রূপগত উৎকর্ষ দেখাইলাম। এই যুগের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে কয়েকটি ত্রুটিও চোখে পড়ে। ইহাকে সে সময় হরফ গোণা ছন্দ বলিয়া গণ্য করা হইত। সেজন্য আট মাত্রার পর্বে বিষম পর্বাঙ্গ ব্যবহার করিতে কবিদের কোন দ্বিধা ছিল না। মধুসূদনের ও বিহারীলালের কাব্যেও ৩+২+৩=৮ মাত্রার পর্ব সুলভ। যেমন,

আমার প্রেমসাগর | 'দুয়ারে মোর নাগর'।
তারে ছেড়ে রব আমি | ধিক এ কুমতি। I
(ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, 'বংশীধ্বনি')

শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ বা ব্রজবুলির ছন্দ উনিশ শতকের কাব্যে সমাদর লাভ করে নাই। এই যুগের অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর কবিতাই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে রচিত। গত শতকে মাত্রাছন্দ বলিতে প্রধানতঃ বৃত্তছন্দের অনুকরণই বুঝাইত। বৃত্তছন্দ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার মাত্রাছন্দ উনিশ শতকের বাংলা ছন্দগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল ছন্দ শুদ্ধ-প্রাকৃত আদর্শের অক্ষম রচনা। কোন বিশিষ্ট কাব্য গ্রন্থে ঐ জাতীয় ছন্দ ব্যবহৃত হয় নাই। তবে এই সময় সংস্কৃত ছন্দের বা বৃত্তছন্দের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কাব্যে নূতন ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এই সকল সংস্কৃত ছন্দের কথা বলা হইবে।

দেশজ ছন্দ অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদের গানগুলিতে ব্যবহৃত হওয়ায় ঐ সময় এই ছন্দের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকে বাউল ও সাধক কবিদের গানে এই ধারা রক্ষিত হয়। এই যুগে দেশজ ছন্দে চরণ বৈচিত্র্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে কোন রূপ কারুকার্যের চেষ্টা হয় না। এই যুগের দেশজ ছন্দে অনেক সময় গায়েনদের ছড়ার

মত গদ্যধর্মী শিথিল গঠন পাওয়া যায়। উনিশ শতকের কাব্য হইতে দেশজ ছন্দের নমুনা :

ওরে ময়ূর | বলরে মোরে,
কেবা তোরে | এমন করে | সাজায়েছে
মরি কার) এত সোহাগ | এ অনুরাগ, |
প্যাকম ধরে | বেড়াও নেচে।
একে) অপূর্ব পাখা | পালক ঢাকা, |
চাঁদের রেখা | তায় শোভিছে ;
যে তোরে) এমন করে | চিত্র করে, |
সে চিত্রকর | কোথা আছে।
ময়ূর তোরে) সর্ব রঞ্জন | ক'রে যে জন, |
দুটি পা কুৎ | -সিত করেছে ;
সে তোরে) একাধারে | রঞ্জনকারী |
দর্পহারী | গুণ দেখাচ্ছে। (কাঙাল ফিকিরচাঁদ)

বিশ শতকে পদ্যছন্দের উৎকর্ষ—বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ভঙ্গ-প্রাকৃত, শুদ্ধ-প্রাকৃত, তৎসম এবং দেশজ—এই চারি প্রকার বাংলা ছন্দই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। বৈচিত্র্যে, গঠন-সৌষ্ঠবে এবং নির্দোষ গঠনে এযুগের পদ্যছন্দ অনুপম। মধ্য যুগে রচিত অধিকাংশ বাংলা কাব্য আখ্যানপ্রধান। উনিশ শতকেও বাংলা সাহিত্যে আখ্যানপ্রধান কাব্যের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নাই। বিহারীলাল গত শতকের শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি। তিনিও দেশী ঐতিহ্যের প্রভাবে তাঁহার 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' সর্গ-বিভক্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন লিরিক কবিতা এক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের মূলেও রহিয়াছে রাধাকৃষ্ণের পুরাণ-কাহিনী।

বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যিক গদ্য সমুন্নত। দীর্ঘ আখ্যান এখন গদ্যেই রচিত হয়। অপর পক্ষে, লিরিক শ্রেণীর ভাবপ্রধান রচনার জন্য এখন পদ্যছন্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এযুগে বিভিন্ন পদ্যছন্দের উৎকর্ষের ইহাই প্রধান কারণ।

রবীন্দ্রনাথ – কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল সূত্রটি বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাণহীন দেহের অলঙ্করণ স্থায়ী হইতে পারে না। বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবকে বাঁচিতে হইলে প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই বাচিতে হইবে। তাই তাঁহার কাব্যে রূপকে প্রাধান্য দিয়া ভাবকে খর্ব করা হয় নাই। তিনি নিপুণ রূপকার ছিলেন। ভাবের উপাদানে গঠিত কবিতা-মূর্তিকে তিনি সুদক্ষ ভাস্করের ন্যায় পরিমার্জিত ও রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দের নিখুঁত গঠন, পর্ব ও স্তবকের রূপ-বৈচিত্র্য এবং তাঁহার কাব্যে মিত্রাক্ষরের সমারোহ বাংলা সাহিত্যে তুলনাহীন। তাঁহার রচনায় ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের শৈথিল্য বিরল। দেশজ ছন্দ তাঁহার লেখনীমুখেই মার্জিত ও সকল প্রকার ভাব প্রকাশে সক্ষম হইয়া উঠে। কিন্তু অধুনিক বাংলা ছন্দে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ. আমরা এই ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি। ইহা অপভ্রংশ ছন্দের উত্তর-বাহক। উনিশ শতকে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের সমাদর হয় নাই। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে কোন কোন স্থলে এই ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। তুলনীয় :

বন অতি রমিত | হইল ফুল ফুটনে।
পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, | চল লো বনে !

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ব্রজবুলি ছন্দে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করেন। এই কবিতাগুলিতে তিনি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ছন্দ ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্তু মৌলিক স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলায়

অস্বাভাবিক, এই তত্ত্বটুকু সেই অল্প বয়সেই তাঁহার কাণে ধরা পড়িয়াছিল। তাই তিনি ভানুসিংহের পদাবলীতে মৌলিক স্বরধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণ অধিকাংশ স্থলে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের সূত্রপাত করেন। পরে এই ছন্দ-শৈলী আরও মার্জিত ও সুগঠিত রূপে তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তাঁহার পূর্বে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ সংস্কৃত ছন্দ বলিয়াই গণ্য হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ প্রাকৃত ছন্দ এরূপ স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে ইহাকে এখন অপভ্রংশ ঋণ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্য ছন্দের অসংখ্য বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। অষ্টাদশ মাত্রিক দীর্ঘ পয়ারে প্রবহমাণতা আনিয়া তিনি এই ছন্দটির শক্তি বৃদ্ধি করেন। মুক্তক, অতিমুক্তক ও গদ্যছন্দও তাঁহার রচনা-মাধুর্যেই জনপ্রিয় হইয়াছে। যথার্থ রূপকারের শক্তি লইয়া তিনি মিত্রাক্ষরকে ছন্দ গঠনের কাজে ব্যবহার করিয়াছেন। এবং মিত্রাক্ষর বর্জন করিয়া কি ভাবে ভাব-সংহতি বৃদ্ধি করা যায়, তাহাও তিনি প্রথম যুগের রচনাতেই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মানসী-কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তুলনীয় :

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।

সুকবির রচনায় ছন্দ কবিতার ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখান যায়। যেমন, তাঁহার উর্বশী-কবিতাটিতে ৮+১০ মাত্রার দীর্ঘপর্বিক চরণের মাঝে মাঝে দশ-মাত্রিক ও ষণ্‌মাত্রিক একপদী ব্যবহার করায়, ছন্দ সমগ্র কবিতাটিতে বিস্ময়ের সুর ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে।

ভারতচন্দ্র, মধুসূদন ও বিহারীলালের রচনায় মিশ্রপংক্তিক স্তবক গঠনের সূত্রপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে এইরূপ গাঠনিক কারুকার্য সৌষ্ঠবে ও বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। মধ্য যুগে ত্রিপদীর আরম্ভে একটি একপদী বা দ্বিপদী পংক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মানসী-কাব্য হইতে একটি ষড়কের দৃষ্টান্ত দিতেছি; ইহাতে প্রথম দুই পংক্তি ত্রিপদী, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ চৌপদী, পঞ্চম চরণ পুনরায় ত্রিপদী। তাহার পর ষষ্ঠ চরণে একটি দ্বিপদী পংক্তি ব্যবহার করিয়া কবি সুন্দর ভাবে ভাব-সমাপ্তি করিয়াছেন। তুলনীয়:

দোলে রে প্রলয় দোলে | অকূল সমুদ্রকোলে |
উৎসব ভীষণ। I
শত পক্ষ ঝাপটিয়া | বেড়াইছে দাপটিয়া |
দুর্দম পবন। I
আকাশ সমুদ্র-সাথে | প্রচণ্ড মিলনে মাতে |
অখিলের আঁখি পাতে | আবরি তিমির। I
বিদ্যুৎ-চমকে ত্রাসি | হা হা করে ফেন রাশি, |
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি | জড় প্রকৃতির। I
চক্ষুহীন কর্ণহীন | গেহহীন স্নেহহীন |
মত্ত দৈত্যগণ I
মরিতে ছুটেছে কোথা, | ছিঁড়েছে বন্ধন। I

(সিন্ধু তরঙ্গ)

এই গ্রন্থের নানা স্থানে ছন্দতত্ত্ব আলোচনা কালে রবীন্দ্র-ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। সেজন্য আমরা এখানে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না; সংক্ষেপে কয়েকটি প্রধান কথা বলা হইল।

রবীন্দ্র যুগ—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কাব্য-রচনার দুইটি পদ্ধতি পাওয়া যায়; একটি পুরাতন পদ্ধতি ও অপরটি নূতন পদ্ধতি। তিনি উনিশ শতকের উত্তরাধিকার সূত্রে যে-পদ্ধতি লাভ করেন, তাঁহার প্রথম দিকের রচনায়, অর্থাৎ, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেদ্য, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সেই পুরাতন পদ্ধতিই উৎকর্ষ লাভ করে। এই সাহিত্যের উপর ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় দেখিতে পাই। এই সময়কার রচনায় বাংলার পুরাতন ছন্দাদর্শ অনুসরণ ও তাহার উৎকর্ষ বিধানই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। কিন্তু ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান সাহিত্যে কন্‌ভেন্‌শন্‌ বা গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রবল হইতে থাকে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে Pre-Raphelite Brotherhood নামে নবীন শিল্পী ও কবিদের একটি গোষ্ঠী স্থাপিত হয়, উদ্দেশ্য শিল্পের ক্ষেত্রে রাফেলকে এবং কাব্যের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যশস্বী কবিদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া। হুইটম্যানের কাব্যেও স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক কল্পনার এবং গদ্যছন্দের পক্ষে ওকালতি আরম্ভ হয়। এবং গত শতকের শেষ দিকে অসকার ওয়াইল্‌ডের রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করিবার আহ্বান জানাইতে থাকে।

আমাদের দেশে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সবুজ পত্রকে কেন্দ্র করিয়া পুরাতন সংস্কার, রুচি ও রসবোধকে অতিক্রম করিবার সাহিত্য-

সাধনা সুরু হয়। এই নূতন সাহিত্যের উদ্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে—
জোয়ার জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির ওপর চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।
আয় অশান্ত আয়রে আমার কাঁচা।

এই নূতন বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য পূর্বে ২১৯ ২০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বলাকা-কাব্য হইতেই এই নব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ করিতে হইবে। এই কাব্যগ্রন্থেই মুক্তক ছন্দ নূতন টেকনিকের সন্ধান দেয়। এবং পরে লিপিকা, পুনশ্চ, শ্যামলী, শেষ সপ্তক, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে গদ্যছন্দের আবির্ভাব এই নূতন বাংলা সাহিত্যকে অধিক শক্তিশালী করে। রবীন্দ্র সাহিত্যে যে-দুইটি পদ্ধতির কথা বলা হইল, সেই দুই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বাংলা দেশে দুইটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম বা পুরাতন পদ্ধতিটি আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রসধারা অস্বীকার করিতে হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের তালিকায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, এবং আরও অনেক সুকবির নাম করা যাইতে পারে। নূতন গোষ্ঠীর লেখকগণের মধ্যে সুকুমার রায়চৌধুরী, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র

মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আরও অনেক শক্তিমান কবির সাক্ষাৎ পাই। প্রথম গোষ্ঠীর লেখক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, ও কিরণধন চট্টোপাধ্যায়কে এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লেখক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে বোধ হয় মাঝামাঝি রাখাই সঙ্গত। কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ও কিরণধনের রচনায় নূতন সুর অবিসম্বাদী এবং যতীন্দ্রনাথের কাব্যে পুরাতন সুর সুস্পষ্ট।

এখন এই দুই গোষ্ঠীর লেখকগণের ছন্দ সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আমরা সাধারণ ভাবে বলিতে পারি, শুদ্ধ-প্রাকৃত, ভঙ্গ-প্রাকৃত ও দেশজ ছন্দ পুরাতন গোষ্ঠীর কবিদের অধিক প্রিয়। অপর পক্ষে, মুক্তক, অতিমুক্তক ও গদ্যছন্দ আধুনিক গোষ্ঠীর কবিদের নিকট অধিক আদরণীয়। কবিগণ নিরঙ্কুশ। ছন্দ-শাস্ত্রের নিয়মাবলী মানিয়া তাঁহাদিগকে কাব্য রচনা করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। তাহা থাকিলে ছন্দের বিচিত্র ক্রমবিকাশ কখনও সম্ভব হইত না। তথাপি ছন্দোবিৎকে বিভিন্ন কবির ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া ছন্দের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হয়। আমাদের আধুনিক ছন্দ-শাস্ত্রের নিয়মাবলী রবীন্দ্রনাথের ছন্দাদর্শ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকে। প্রথম গোষ্ঠীর অধিকাংশ কবি রবীন্দ্র কাব্যের ছন্দাদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহারও কবিতায় ছন্দ লইয়া নূতন পরীক্ষা খুব বেশী হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কবিগণ ভঙ্গ-প্রাকৃত, শুদ্ধ-প্রাকৃত ও দেশজ ছন্দে কবিতা রচনা করিবার সময়েও গতানুগতিক আদর্শ অস্বীকার করিয়া ও নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নূতন নূতন ছন্দোবন্ধ রচনার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। গতানুগতিক ছন্দাদর্শ নূতন গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় খুবই অল্প পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনা হইতে একটি নূতন গঠনের দেশজ ছন্দ উদ্ধৃত করিতেছি। এখানে কবি নৈপুণ্যের

সহিত ষণ্‌মাত্রিক দেশজ ছন্দে দুই মাত্রা গঠিত পর্ব চরণ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন :

মশা ! I
ক্ষুদ্র মশা ! I
মশার কামড় | খেয়ে আমার |
স্বর্গে-যাবার দশা | I
মশারি তো | মশার অরি।
শুনেছি কা | -হিনী।
দুসমনকে | দোর খুলে দেয় |
পঞ্চম বা | -হিনী।
একাই জন | -যুদ্ধ করি |
এ হাতে ও | -হাতে।
দুই হাতেরি | চাপড় বাজে |
নাকের ড | -গাতে।
একাই I
মশার কামড় | নিজের চাপড় |
কেমন করে | ঠেকাই। I
শেষে I
ম্যালেরিয়ায় | ধরলে আমায় |
একেবারে ঠেসে। I

আর একজন কবির রচনা হইতে একটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি। এখানে পর্ব ও চরণের বৈচিত্র্য উপভোগ্য।—

স্থির ভাবে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো, বারো ঘণ্টা ;
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি—
যতোই দোকা ন গিয়ে করো কাকুতি।

(অজিত দত্ত, 'নইলে')

বাংলা সাহিত্যে বারো মাত্রার পর্ব সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতায় পর্বে বারো মাত্রার গঠনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তুলনীয়ঃ

দিন মোর রাত্রির প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।

নূতন কবিদের রচনা হইতে এইরূপ থাপছাড়া ছন্দের বহু সুন্দর সুন্দর নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল কবি অমিল ছন্দ রচনায় পটু। কিন্তু ইঁহাদের রচনায় মিত্রাক্ষরের উৎকর্ষও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মিল এখন কবিতারই অঙ্গ, কবিতায় ভাব প্রকাশের সহায়ক।

সত্যেন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি। অন্য কোন বাঙালী কবি কবিতার ছন্দ লইয়া এত অধিক কারিগরি করেন নাই। বাংলা ছন্দে তাঁহার প্রথম দান, তিনি সাফল্যের সহিত দেশজ, শুদ্ধ-প্রাকৃত ও ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের নানা প্রকার প্যাটার্ণ উদ্ভাবন করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় দান, তিনি দেশ-বিদেশের নানা ছন্দোবদ্ধ বাংলায় অনুকরণ করিয়া বাংলা ভাষার শক্তি প্রমাণ করিয়াছেন ও বাংলা ছন্দকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। যতি-প্রধান ছন্দ বা পদ্যছন্দ তাঁহার কাব্যে নিখুঁত সৌন্দর্যে গরিয়ান। তাঁহার তৎসম ও বিদেশী ছন্দ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। প্রচলিত ছন্দগুলি তাঁহার রচনায় কি ভাবে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দেশজ ছন্দ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমসাময়িক অনেক কবির রচনাতেই দেশজ ছন্দের প্রতি পক্ষপাত পাওয়া যাইবে। সত্যেন্দ্রনাথের বহু ভাল কবিতা ষণ্‌মাত্রিক দেশজ ছন্দে রচিত। 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল', 'হল্লা ক'রে ছুটির পরে ঐ যে যারা যাচ্ছে পথে', 'ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার

পাগলি জেগেছে', 'তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম! অনির্বচনীয়', 'তোমরা কি কেউ শুনবে নাকো পাগলাঝোরার দুঃখগাথা', 'বীরসিংহের সিংহ শিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!', 'মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে', 'মধুর চেয়েও আছে মধুর, সে এই আমার দেশের মাটি', 'ফুলের বসন ফুটিয়ে যায়, অপ্সরীরা আয় গো আয়', 'দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে, বেঁধেছিলাম তোড়া', 'তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে অলস হাওয়ায় দীঘির জল', 'ইলসে গুঁড়ি, ইলসে গুঁড়ি, ইলিস মাছের ডিম',—এগুলি তাঁহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিতার প্রথম পংক্তি। এই সকল রচনায় ষণ্মাত্রিক দেশজ ছন্দের নানা প্রকার গঠন পাওয়া যাইবে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ 'পাল্কীর গান' কবিতাটি ষণ্মাত্রিক একপদী দেশজ ছন্দে রচিত। ছন্দও যে কবিতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে কতখানি সাহায্য করিতে পারে, এই কবিতাটি তাহার একটি বিরল দৃষ্টান্ত।—

|
পাল্কী চলে!
পাল্কী চলে!
গগন তলে
আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

কবিতাটিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। শব্দের ধ্বনি শুনিলেও পাল্কী-বেহারাদের সমগ্র চিত্রটি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিবে।

দেশজ ছন্দে অক্ষরের হ্রস্ব দীর্ঘ প্রয়োগ কবির ইচ্ছাধীন। ইহা এই ছন্দের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ। সত্যেন্দ্রনাথের 'সিংহবাহিনী' কবিতাটিতে মৌলিক স্বরধ্বনিকে কি ভাবে ছন্দের প্রয়োজনে সম্প্রসারিত করিয়া মাত্রাপূরণ করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। নীচের দৃষ্টান্তে হাইফেন-চিহ্ন দ্বারা মাত্রা-সম্প্রসারণ দেখানো হইল :

মরত লোকে- | এলো-কেশে- | ওকে এল তোরা | যা- দেখে- |
বিজলি ছটা- | ব-হ্নিজটা- | সিং-হ পরে- | পা- রেখে- !
নিখিল পা-প | নিধন তরে-
মৃণাল করে- | কৃপাণ ধরে-,
ঈষত হাসে- | শ-ঙ্কা হরে-, | চিনিতে ওরে- | পারে- কে- !

পংক্তির শেষে খণ্ডিত পর্ব প্রয়োগ বাংলা কাব্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। অনেক কবি পংক্তির আরম্ভেও সাফল্যের সহিত খণ্ডিত পর্ব ব্যবহার করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের রচনা হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিই। তাঁহার 'বঙ্গজননী' কবিতাটির মূল ছন্দ দেশজ বর্ণমাত্রিক চৌপদী। তুলনীয় :

ত্রিশূল তুলে | নে মা আবার | রূপের জ্যোতি | পরকালি,
ভয় ভাবনা | ভাসিয়ে দিয়ে | হাসো আবার | তেমনি হাসি !
চরণ তলে | সপ্তকোটি | সন্তানে তোর | মাগে রে—
বাঘেরে তোর | জাগিয়ে দে গো | রাগিয়ে দে তোর | নাগেরে;

এই কবিতারই কোন কোন পংক্তির প্রথম পর্ব সংক্ষেপে দ্রুত পাঠ করাই লেখকের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। যেমন,

কে মা তুই | বাঘের পিঠে- | বসে- আছিস্ | বিরস মুখে ?
শিরে তোর | নাগের ছাতা- | কমল মালা- | ঘুমায় বুকে- !
ঢলঢল্ | নয়ন যুগল | জল- ভরে- | পড়ছে ঢুলে- |
কাল মেঘ | মিলিয়ে গেল | তোর ঐ নিবিড় | কাল- চুলে- ।

এখানে প্রতি পংক্তির প্রথম পর্বটি সংক্ষেপে চার মাত্রায় পড়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'সাঁঝাই' কবিতাটিতে ষণ্‌মাত্রিক একপদী চরণের আরম্ভে খণ্ডিত পর্বের প্রয়োগ আরও সুগঠিত ও সুন্দর। তুলনীয়:

সাঁঝে আজ | কিসের আলো-,
ভুলালো- | মন ভুলালো-.
ফ.গুয়ার | ফাগ মিলালো-
শরতের | মেঘের মেলায়।
আলোতে- | ডুবিয়ে আঁখি,
পুলকে- | ডুবতে থাকি-!
হুবহু- | সোনার ফাঁকি-
ঝুরুঝুর্ | হাওয়ার খেলায়।

সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার গান' কবিতাটি চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত—

চরকার | ঘর্ঘর্ | পড়্‌শীর | ঘর ঘর!
ঘর-ঘর | ক্ষীর-সর, | আপনায় | নির্ভর!
পড়্‌শীর | কণ্ঠে- | জাগ্‌লো- | সা-ড়া-
দাঁ-ড়্- | আপনার | পা-য়ে- | দাঁ-ড়া-!

ভারতচন্দ্রের ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথেরও ছন্দ-রচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। সুষ্ঠু শব্দ নির্বাচনে ও মিত্রাক্ষর নির্মাণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ছন্দের গঠন সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। সেজন্য তাঁহার রচনায় ভাবের আবেগ বাঁধ-ভাঙা প্লাবনের ন্যায় ছুটিয়া চলে না। তিনি শ্রুতিমধুর ব্যঞ্জনান্ত দীর্ঘ অক্ষর অধিক ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন। সেজন্য ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের সরল একমাত্রিক পদক্ষেপ তাঁহাকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে

নাই। ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে রচিত তাঁহার 'গ্রীষ্মের সুর' কবিতাটিতে রূপ-সজ্জা আছে, তাহাতে নয়ন তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু শ্রুতি অতৃপ্ত থাকে। শ্রুতিসুখ উৎপাদন করা তাঁহার ছন্দের একটি প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দেই তিনি অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার দেশজ ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে পঞ্চকল, ষট্‌কল ও সপ্তকল গঠন অপেক্ষা অষ্টকল পর্ব গঠনেই তাঁহার স্বকীয়তা অধিক ফুটিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি ছন্দে গতির আভাস উৎপন্ন করিতে পারিতেন, তাঁহার 'পাল্কীর গান' কবিতাটির ছন্দ আলোচনায় আমরা তাহা দেখিয়াছি। অষ্টকল শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের কয়েকটি কবিতাতেও গতি-চাঞ্চল্য ফুটাইবার সার্থক চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহার 'দূরের পাল্লা' কবিতাটির ছন্দ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।—

ঝক্‌ঝক্ কলসীর
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোমটায় ফাঁক রয়
মন উন্মন্ গো।
তিন দাঁড় ছিপ খান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন গান গাচ্ছে ?

দূর পাল্লায় কত নূতন দেশ ও পরিবেশের মধ্য দিয়া তরীখানি আগাইয়া চলিয়াছে। দৃশ্যপটের এই পরিবর্তন বুঝাইবার জন্য কবি ইহাতে মাঝে মাঝে ছন্দ পরিবর্তন করিয়া দেশজ ছন্দের ষণ্‌মাত্রিক দ্বিপদী গঠন অবলম্বন করিয়াছেন; কখনও বা মিলের ক্রমভঙ্গ করিয়া গতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

তাঁহার ছন্দে যতি-বিভাগ স্পষ্ট। ব্যঞ্জন-ধ্বনির ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের বাহুল্যবশতঃ ছন্দে ধ্বনির ঝঙ্কার প্রাধান্য লাভ করে। অনুপ্রাস ও

যমকের প্রাচুর্য বশতঃ তাঁহার রচনায় শ্রুতি-মাধুর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক সময় অনুপ্রাস যমক কবিতার ভাব-প্রকাশেও সাহায্য করে। পূর্বে 'চরকার গান' হইতে উদ্ধৃত অংশে কয়েকটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির আবর্তনের সাহায্যে চরকার ঘর ঘর শব্দ সুন্দর ভাবে অনুকরণ করা হইয়াছে। তাঁহার 'পিয়ানোর গান' কবিতায় ব্যঞ্জন ধ্বনির সাহায্যে পিয়ানোর টুং টাং ধ্বনি উৎপাদনও উপভোগ্য।—

ঝিল্‌মিল্‌ ঝিক্‌ মিক্‌
ঝিক্‌ মিক্‌ ঝিল্‌ মিল্‌
পুষ্পের মঞ্জীল্‌
তার তন্‌ তার দিল্‌।

তার তন্‌ তার মন্‌
ফাল্গুন-ফ্‌ুল-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।

সত্যেন্দ্রনাথ শক্তিমান শিল্পী ছিলেন, সন্দেহ নাই। শব্দার্থের ব্যঞ্জনায় ভাব ফুটাইয়া তোলাই কবির কাজ। তিনি ধ্বনির ব্যঞ্জনায় ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

বিংশ শতকের বাংলা কাব্যে স্তবক—বিশ শতকের কাব্যে উল্লেখযোগ্য স্তবক-বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের ও প্রমথ চৌধুরীর রচনায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রযুগের লেখক হইলেও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্তক, একথা পূর্বে বলিয়াছি। গদ্য লেখক রূপেই তাঁহার খ্যাতি অধিক। কিন্তু তাঁহার পদ্য-রচনাতেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ লিরিক রচনা করিতে হইলে যে-

পরিমাণ ভাবাচ্ছন্নতা প্রয়োজন প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তাহা পাওয়া যায় না, সত্য। তাঁহার রচনায় ভাব পূর্ণরূপে বিকাশ লাভের পূর্বেই অনেক সময় পরিহাসের আঘাতে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। কিন্তু বহিরঙ্গ কারুকার্যে তাঁহার কাব্য অনবদ্য। তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে নানা প্রকার রূপ-নির্মিতি আনিয়া বাংলা কাব্যে রূপ-বৈচিত্র্যের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করেন। বাংলা কাব্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান 'সনেট পঞ্চাশৎ"। সনেট সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। অষ্টক, ষড়ক ও টের্জা রিমা (terza rima) রচনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার একটি অষ্টক :

উষা আসে অচল শিয়রে ক
তুষারেতে রাখিয়া চরণ। খ
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে, ক
উষা হাসে অচল-শিয়রে, ক
ধরে বুকে নীহারে শিকরে ক
সে হাসির কনক বরণ। খ
বসো সখি মনের শিয়রে ক
হিম বুকে রাখিয়া চরণ। খ

টের্জা রিমা এক প্রকার সম্পৃক্ত ত্রিপংক্তিক স্তবক। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে, এবং দ্বিতীয় চরণের সহিত পরবর্তী স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের মিল দেওয়া হয়। যথা,

বাদশা ছিলেন এক পরম খেয়ালী,
বিলাসের অবতার জাতে আফগান,
দিনে তাঁর নিত্য দোল, রাত্তিরে দেয়ালী।

জীবন তাহার ছিল শুধু নাচ গান,
শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্ত্রী—
নর্তকী দুবেলা দিত রূপের যোগান।

বাংলা সাহিত্যে সনেট—সনেট এক শ্রেণীর চতুর্দশ পংক্তির কবিতা। ত্রয়োদশ শতকে ইতালীতে সনেট রচনার সূত্রপাত হয়। চতুর্দশ শতকের ইতালীয় কবি পেতরার্কার সনেটগুলি শিল্প-নৈপুণ্যে ও কবিত্বে অতুলনীয়। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর কবিতা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এদেশে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন। কবিতাটি বাংলা ভাষার উপর রচিত। পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভের্সাই নগরে অবস্থান করিবার সময় পেতরার্কার সনেট পাঠে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি আরও অনেকগুলি বাংলা সনেট রচনা করেন। পর বৎসর "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নামে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মধুসূদন ও প্রমথ চৌধুরী রচিত সনেটগুলিই বাংলা সাহিত্যে অধিক প্রসিদ্ধ।

সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহার ভাব-সংহতি ও কঠিন বন্ধন। চতুর্দশ পংক্তিতে একটি ভাব-কেন্দ্রিক রচনা সম্পূর্ণ করিতে হয়। ইহার পংক্তিগুলিও দীর্ঘাকার হয় না। ইংরেজী সাহিত্যে সনেট-পংক্তি দশ অক্ষরে, ইতালীয় সাহিত্যে এগারো এবং ফরাসী সাহিত্যে বারো অক্ষরে গঠিত হইয়া থাকে। এবং বাংলা সাহিত্যে সনেট-পংক্তি ভঙ্গ-প্রাকৃত চতুর্দশ মাত্রার রচনা। এত অল্প পরিসরে ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হয় বলিয়া ইহার ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে কোনরূপ শৈথিল্য থাকিলে চলে না। সনেটের চিত্রপট অত্যন্ত ক্ষুদ্র ;—সমগ্র কবিতাটি এক দৃষ্টিতে দেখা যায়। সেজন্য সনেটে নানা প্রকার সূক্ষ্ম কারুকর্ম করা হয়। প্রধানতঃ মিত্রাক্ষর ও স্তবক অবলম্বন করিয়াই কারুকার্য সম্পাদিত হয়। গঠন-কারুকার্য না থাকিলে শুধু চতুর্দশ-পংক্তিক রচনাকেই উচ্চাঙ্গের সনেট বলা যায় না। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার "সনেট-পঞ্চাশৎ"-এ সনেট-শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন :—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

সনেটের গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দুইটি স্বীকৃত পদ্ধতি পাওয়া যায়। প্রথম পদ্ধতিটি পেতরার্কার সনেটে অমরতা লাভ করে; দ্বিতীয়টি এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজী সাহিত্যে প্রচলিত। পেতরার্কার সনেটে প্রথম আট চরণ একটি গুচ্ছে গঠিত হয় ও এই আট চরণে মিত্রাক্ষরের ক্রম হয় কখখককখখক। এবং পরবর্তী ছয় চরণ দুই, তিন অথবা চার চরণের সমবায়ে বা একটি ষড়কের দ্বারা গঠিত হইতে দেখা যায়। অপর পক্ষে, এলিজাবেথীয় বা শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেটে কখকখ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ—এই গঠনটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মিলটন ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এলিজাবেথীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া পেতরার্কার অনুসরণ করেন। পেতরার্কার সনেটে অষ্টম চরণের পরে ভাবের ছেদ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই নিয়ম সর্বত্র পালিত হয় নাই। শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেটে চতুর্দশ পংক্তিতে সাত প্রকার মিত্রাক্ষর পাওয়া যাইবে। কিন্তু পেতরার্কার সনেটে অল্প শ্রেণীর মিত্রাক্ষর ব্যবহার করাই নিয়ম।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর সকলেই প্রায় পেতরার্কার ন্যায় প্রথম অংশে ৮ চরণের গুচ্ছ ব্যবহার করিয়া সনেট রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি এলিজাবেথীয় প্রণালী হইতেও স্বতন্ত্র। এলিজাবেথীয় সনেটে চার চরণের তিনটি গুচ্ছের পরে একটি যুগ্মক দ্বারা কবিতার উপসংহার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'-কবিতাটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় পদ্ধতিতে রচিত উৎকৃষ্ট সনেট। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী রচনায়, বিশেষতঃ নৈবেদ্য-কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলিতে ৭টি যুগ্মক ব্যবহার করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সনেটে মিত্রাক্ষরের ক্রমে কোন বৈচিত্র্য না থাকিলেও মধুসূদনের ন্যায় তাঁহার সনেটগুলিতেও ছেদ-বিন্যাসে বৈচিত্র্য ও পংক্তির প্রবহমাণতা অধিক। সেজন্য তাঁহার সনেটে মিলনাত্মক

চরণ-গুচ্ছে বৈচিত্র্য না থাকিলেও ছেদ-নির্ভর চরণ-গুচ্ছে বৈচিত্র্য পাওয়া যায়।

মধুসূদনের সনেটে উভয় প্রকার বৈচিত্র্যই পাওয়া যাইবে। তাঁহার 'আশ্বিন মাস' শীর্ষক সনেটটিতে প্রথম চরণের পরেই পূর্ণচ্ছেদ। তাহার পর নবম চরণে আর একটি পূর্ণচ্ছেদ। সুতরাং ছেদ-ভিত্তিক বিশ্লেষণে ৯+৫-এর বিভাগ এই সনেটটিতে পাওয়া যায়। ইহার মিত্রাক্ষর-বিন্যাসেও নূতনত্ব রহিয়াছে। মধুসূদনের সনেটগুলিতে প্রথম আট চরণে মিত্রাক্ষর বিন্যাস অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই অংশের মিলগুলিতে নিম্নলিখিত rime order বা মিত্রাক্ষর-ক্রম পাওয়া যায়:

কখকখকখকখ ('বঙ্গভাষা', প্রভৃতি), কখখক কখখক ('কমলে কামিনী', প্রভৃতি), কখকখ খকখক ('কালিদাস', 'যশের মন্দির', প্রভৃতি), কখখক কখকখ ('মেঘদূত'—দ্বিতীয়াংশ,) কখ খক খকখক ('সৃষ্টিকর্ত্তা', প্রভৃতি), কখকখ খককখ ('সূর্য', প্রভৃতি), কখখক কখগখ ('সীতাদেবী', প্রভৃতি), কখকখ কখখক ('ঈশ্বরী পাটনী', প্রভৃতি)। প্রথম আটটি চরণে এইরূপ নানা প্রকার মিত্রাক্ষর-ক্রম পাওয়া যাইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী ছয় চরণের মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। অধিকাংশ কবিতাতেই গঘ গঘ গঘ ব্যবহৃত হইয়াছে। কয়েক স্থলে কেবল ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। যেমন, গঘঘগঙঙ ('বঙ্গভাষা'). গঘগঘগঙ ('অন্নপূর্ণার ঝাঁপি'), গঘগঘঙঙ ('কাশীরাম দাস'), গঘঙগঘঙ ('কীর্ত্তিবাস'), গঘঘ গকক ('জয়দেব'), গঘঘগঘগ ('মেঘদূত'), গঘঘগঘগ ('যশের মন্দির'), গঘঙঘগঘ ('শ্রীপঞ্চমী'), ঘঙঘঙঘঙ ('সীতাদেবী'), প্রভৃতি।

ভাব সংহতিতে, চিন্তার শৃঙ্খলায় ও কলানৈপুণ্যে মধুসূদনের চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলীর সহিত প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলির তুলনা করা চলে। কলানৈপুণ্যে প্রমথ চৌধুরীর রচনাই অধিকতর সুন্দর। তাঁহার

সনেটগুলিতে পেতরার্কার পদ্ধতির প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হয়। তিনি প্রথম আট চরণে অধিকাংশ সনেটে পেতরার্কার গঠন অনুসরণ করিয়া কখখককখখক-মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, 'বসন্ত-সেনা' ও 'ব্যর্থ-জীবন' কবিতা দুইটির প্রথম আট চরণে কককককককক মিত্রাক্ষর-ক্রম পাওয়া যায়; অর্থাৎ আট চরণে একই মিল ব্যবহৃত হইয়াছে। পেতরার্কার ন্যায় প্রমথ চৌধুরীও সনেটের শেষ ছয় চরণেই মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন,

গগকঘকঘ ('সনেট'), গগঘঙঙঘ ('ভাষ'), গগঘঙগঙ ('ভর্তৃহরি') খখ গঘ গঘ ('বসন্তসেনা'), গগঘকঘক ('পত্রলেখা'), গগঘঘঘঘ ('তাজমহল', 'চোরকবি') গগঘঙঙঘ ('বন্ধুর প্রতি' 'উপদেবতা') গগঘকঘক ('ধরণী'), গগখকখক ('একদিন'), গগগগগগ ('প্রতিমা') গগকগগক ('মুস্কিল আশান') ককঘকঘক ('ধুতুরার ফুল'), গগ কঘঘক ''রজনীগন্ধা') গগকঘকঘ (পাবানী'), প্রভৃতি। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মধুসূদনের অধিকাংশ সনেট ৮ ও ৬-য়ের দুইটি পৃথক্ গুচ্ছে বিভক্ত। সনেট প্রকৃত পক্ষে চতুর্দশ চরণের একটি মাত্র গুচ্ছ। সেজন্য প্রমথ চৌধুরী তাঁহার অধিকাংশ সনেটে দ্বিতীয় অংশেও 'ক' ও 'খ' মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের "ক্ষণদীপিকা" ও বাংলা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট সনেট-গ্রন্থ। কবি তাঁহার সনেটগুলির উভয় অংশেই নানা প্রকার মিত্রাক্ষর-গুচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় অংশেই মিত্রাক্ষর-ক্রমে অধিক বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। মিত্রাক্ষর-বিন্যাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

কখকখকখকখ গঘগগঘগ ('কি হবে সনেট লিখে'),

কথকথকথকথ গঘ গঘ ঙঙ ('বিস্ময়ে ভরিছে প্রাণ'),
কথথক কথথক গগঘঘঙঙ ('মোর তরে, হে অপর্ণা'),
কথথক কথথক গঘঙগঘঙ ('প্রথম সে কবে দেখা'),
কথকথ কথকথ গঘঘগগঘ ('মুঠা করি তুলি স্বর্ণ'), প্রভৃতি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নূতন ছন্দ

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে তৎসম ছন্দ—সংস্কৃত ছন্দে বা বৃত্তছন্দে নানা ছন্দোবন্ধ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে এই সকল নূতন নূতন গঠনের ছন্দ প্রচলিত করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি পায়। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিরচিত বাসবদত্তা-কাব্যে (১৮৩৬ খ্রীঃ) অনেকগুলি বাংলা বৃত্তছন্দ পাওয়া যায়। কাব্যনির্ণয়ে ইহার কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুকবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'ভারত-বিলাপ' (১৮৭১ ?) তোটক ছন্দে রচিত। এক সময় কবিতাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে। ৩
পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহ-বিনির্মিত হার বুকে। ৪
পর ভাষণ আসন, আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে। ৫
পর দীপশিখা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। ৬

উনিশ শতকে বাংলা তৎসম ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি বলদেব পালিত। তাঁহার "ললিত কবিতাবলী" (১৮৭০ খ্রীঃ) ও "ভর্তৃহরি কাব্য" (১৮৭২ খ্রীঃ) বাংলা বৃত্তছন্দে রচিত। তিনি ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর, পজ্ঝটিকা, দ্রুতবিলম্বিত, উপেন্দ্রবজ্রা, শার্দূলবিক্রীড়িত, বংশস্থ, উপজাতি, বসন্ত-তিলক, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা, মালিনী, প্রভৃতি ছন্দে এই দুইটি কাব্যের বিভিন্ন অংশ রচনা করেন। মৌলিক স্বরের তৎসম উচ্চারণ বজায় রাখিয়া এই সকল বাংলা কবিতা পড়িতে হইবে। সেজন্য বাংলা কবিতার স্বাভাবিক ও সচ্ছন্দ গতি কবিতাগুলিতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবে বলদেব পালিত তাঁহার বাংলা বৃত্তছন্দে তৎসম মাত্রা-পদ্ধতি বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ যাহাতে অস্বাভাবিক না শুনায় সেজন্য কবি এই সকল কবিতায় তৎসম শব্দ অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে কয়েকটি বাংলা তৎসম ছন্দ :

মালিনী ছন্দ—

ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘ-কেশা, কৃশাঙ্গী,
অচপল-তড়িতাভা সুন্দরী, গৌরকান্তি,
মধুর নব-বয়স্কা, পদ্মিনী অগ্রগণ্যা,
যুবক-নয়ন-লোভা "কামিনী কামশোভা"। ৩

(ভর্তৃহরি-কাব্য, প্রথম সর্গ)

বসন্ততিলক ছন্দ —

দূরে কিবা নয়ন-রম্য দিগন্ত লিপ্ত
কাদম্বিনী সদৃশ ভূধর-রাজি রাজে!
কাছে পুনঃ, বিটপ-গুল্ম-লতা-প্রতানে
পালাশ বর্ণ কটকে গিরিবৃন্দ শোভে। ২

(ভর্তৃহরি-কাব্য, তৃতীয় সর্গ)

দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ—

প্রবল বেগ সমীর তুরঙ্গমে
চড়ি নিদাঘ, অমোঘ পরাক্রমে,
তপন কাঞ্চন-শীর্ষক মস্তকে,
বিহরিছে দহি জীব সমস্ত-কে ॥

(ললিত কবিতাবলী, 'গ্রীষ্ম')

শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ—

বর্ষাকাল গতে সুনির্মল জলে কাসার শোভা করে
নানা জাতি জলেচরাণ্ডজগণে নীরে সুখে সন্তরে ;
পেয়ে পদ্মকলি, প্রমত্ত পবনে তদ্‌বাস হর্ষে হরে ;
গন্ধে অন্ধ হয়ে দ্বিরেফ-নিকরে মিষ্ট স্বরে গুঞ্জরে ॥

(ললিত কবিতাবলী, 'শরৎ')

বিংশ শতকে তৎসম ছন্দ - উনিশ শতকে মধুসূদন, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবিগণ তৎসম ছন্দ রচনার পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু বিশ শতকে কয়েকজন প্রধান কবিও বাংলায় তৎসম ছন্দ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসাত্মক রচনাতেই তৎসম ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার "আষাঢ়ে" কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি বাংলা বৃত্তছন্দ পাওয়া যায়। বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথই তৎসম ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বাংলায় বৈদিক ছন্দও অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তৎসম ছন্দ রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের কথা পূর্বে ৫২-৬১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার তৎসম ছন্দে কেবল যৌগিক ধ্বনিগুলিই দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হয় ; দীর্ঘ মৌলিক ধ্বনিগুলি এই সকল কবিতায় লঘু। সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথের তৎসম ছন্দ বাংলায় খুব

অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। পূর্বে বলদেব পালিতের রচনা হইতে একটি বাংলা মালিনী ছন্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ অংশটির সহিত সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা মালিনী ছন্দ তুলনা করিলেই সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। সত্যেন্দ্রনাথের রচনা হইতে বাংলা মালিনী ছন্দের নমুনা :—

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর
উৎসবের কুঞ্জ নির্জন ;
ভেঙ্গে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্বণ।

আধুনিক সাহিত্যে ফার্সী ছন্দ—সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী ছন্দও অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। আরবী-ফার্সী ছন্দে বর্ণ অর্থাৎ হরফ এবং বর্ণাশ্রিত ধ্বনি গণনা করিয়া ছন্দ নির্ণয় করা হয়। ইহাতে পাঁচটি অথবা সাতটি বর্ণে এক একটি পর্ব গঠিত হইয়া থাকে। বাংলা ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ রচিত ফার্সী ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি ফার্সী ছন্দ-শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া ঐ সকল কবিতা রচনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। ফার্সী ছন্দের সুর অনুসরণ করিয়া তিনি বাংলা শব্দ বসাইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেজন্য কবিতাটি ফার্সী ছন্দে লেখা, একথা বলিয়া না দিলে দেশজ ছন্দে রচিত কবিতা পড়িতেছি বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহার 'কবর-ই-নূরজাহান' কবিতার গোড়ায় তিনি ফার্সী ছন্দে রচিত দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ কবিতাংশের ছন্দের সহিত ছন্দ মিলাইয়া বাংলা কবিতাটি পড়িতে

হইবে, ইহাই কবির অভিপ্রায়। বাংলা লিপিতে ফার্সী ছন্দের বৈশিষ্ট্য বুঝা কঠিন। মূল ফার্সী কবিতাটি পঞ্চ বর্ণাত্মক ছন্দে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা কবিতাটি পঞ্চবর্ণাত্মক করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়াইবে:—

আজকে তোমা(য়) | দেখতে (এ)লাম | জগৎ আলো | নুরজাহান

এই কবিতাটিতে অধিকাংশ পর্বেই পাঁচটির অধিক বর্ণ (ও ধ্বনি) ব্যবহৃত হইয়াছে। সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথের এই চেষ্টা খুব বেশী সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই।

বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী ছন্দ—ভাষা এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে মানব সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ দুইটি মানব গোষ্ঠী পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের ব্যাবহারিক জগতে, ভাবজগতে ও ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান হওয়া খুব স্বাভাবিক। ঋণ গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য অভাব পূরণ করা। মানুষ সহজে তাহার কালচার বা গোষ্ঠীগত জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয় না। কিন্তু অভাব-পূরণের জন্য অপরের কালচার হইতে উপাদান আহরণ করা শাশ্বত কালের ধর্ম। উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার হাতে পাইয়া আমরা আমাদের সাহিত্যের দৈন্য অনেক পরিমাণে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, পরের জিনিষ হুবহু নকল না করিয়া তাহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়া লইতে পারিলে তবেই তাহা দেশীয় ঐতিহ্যের সহিত মিশিয়া দেশীয় সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হয়। সেজন্য মধুসূদন অমিত্র ছন্দ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ইংরেজী blank verse-এর iambic pentameter-গঠন অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করিয়া শুধু ঐ ছন্দের প্রবহমাণতা ও অমিত্রাক্ষরতা গ্রহণ করিয়া তাহা বাংলার নিজস্ব পয়ার পংক্তিতে প্রয়োগ করিলেন। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথও অপভ্রংশ ছন্দ

গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঐ ছন্দ অবিকল নকল করিতে চেষ্টা না করিয়া বাংলা ছন্দের সহিত ইহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইলেন। সেজন্য মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ খাঁটি বাংলা ছন্দ। অপর পক্ষে, পদাবলীকারগণ ব্রজবুলি ছন্দে অপভ্রংশ ছন্দাদর্শের অবিকল অনুকরণ করিতে চেষ্টা করায় তাঁহাদের রচনায় ছন্দের স্বাভাবিকতা পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর ছন্দকে প্রথম স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ বলা হইয়াছে। বৃত্তছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় কিছুটা সাফল্য লাভ করিলেও ইহা এখনও বাংলা ছন্দ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইরূপ ফার্সী ও ইংরেজী ছন্দও বাংলায় এখনও কোন স্বীকৃত রসধারা প্রবর্তন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় ইংরেজী ছন্দ রচনাতেও সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগে ছন্দালোচনা

উনিশ শতক—উনিশ শতকে কবি ও ছান্দসিকগণ বাংলা ছন্দের গঠন সম্বন্ধে লিখিত ভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই শতকে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে যে-কয়টি পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাদের মধ্যে লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত "কাব্যনির্ণয়" সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কবি হেমচন্দ্রের কোন কোন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতেও বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যাইবে। এই যুগে বাংলা ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার সূত্রপাত হয়। কিন্তু সকলেই সংস্কৃতের আদর্শে বাংলা ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারের পর্যালোচনা করিতে থাকেন। তাহার ফলে বাংলা ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে

তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। উনিশ শতকের ছন্দালোচনায় এই ত্রুটি সহজেই ধরিতে পারা যায়। যেমন, তখন সংস্কৃত বৃত্তছন্দ ও জাতিছন্দের অনুকরণে বাংলা ছন্দকেও অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দে বিভক্ত করা হইত, এবং সংস্কৃত ছন্দের পংক্তি-নির্ভরতার আদর্শে বাংলা ছন্দের গঠন নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইত। অর্থাৎ, পদ্যের এক একটি পংক্তিতে কয়টি অক্ষর (তাঁহাদের মতে 'হরফ') বা মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই ছিল তখন প্রধান লক্ষ্য। প্রচলিত দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দকে সে যুগের ছান্দসিকগণ ২৬ অক্ষরের ছন্দ বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের প্রভাবে পড়িয়া বাংলা ছন্দে পর্ব ও পর্বাঙ্গের মূল্য তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

বিশ শতক—বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে সবুজপত্রে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ নবযুগের ছন্দালোচনার সূত্রপাত করেন এবং ঐ দশকেই শশাঙ্কমোহন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি ছন্দ-সম্পর্কিত রচনা বাংলা ছন্দের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করে। পরে, বিশের দশকে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও ত্রিশের দশকে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করিয়া বাংলার নিজস্ব ছন্দ-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এবং চল্লিশের দশকে মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য বাংলা ছন্দের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী গবেষকগণের কতকগুলি অস্পষ্টতা দূর করিতে চেষ্টা করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বাংলা ছন্দ-শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আমরা পিঙ্গল-ছন্দ-সূত্রের আদর্শে বাংলা ছন্দের গঠন নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি না।

গত পঁচিশ বৎসরে বাংলা ছন্দের বিভিন্ন দিক লইয়া বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে

সম্ভব নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের গঠন ও বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকাংশ বাদানুবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সময় আমরা এই গোষ্ঠীর ছন্দ-সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আরবী-ফার্সী ছন্দ হরফ-গোণা ছন্দ। সম্ভবতঃ ইহারই অনুকরণে মধ্য যুগের শেষ দিকে পয়ার-জাতীয় ছন্দকেও হরফ-গোণা ছন্দ বলিয়া গণ্য করা হইত, এবং সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের প্রভাবে পড়িয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'অক্ষরছন্দ'। এই গোষ্ঠীর ছন্দকে বর্ণছন্দ (অর্থাৎ হরফ গোণা ছন্দ) অথবা 'অক্ষরছন্দ' বলিতে বাধা কোথায়, এ সকল কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। শুধু ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ নহে, অন্যান্য শ্রেণীর বাংলা ছন্দও যে প্রকৃত পক্ষে মাত্রাছন্দ, এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া মনে হয়।

উপসংহার—এখন ছন্দতত্ত্ব ভাষা-গবেষণার অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং ছন্দের গঠনে উচ্চারণ-কাল, স্বরাঘাত, সুর ও উচ্চারণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কতটা কার্যকরী হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা এখনও অতটা অগ্রসর হইতে পারি নাই, সত্য। আমরা পিঙ্গল-ছন্দ-সূত্রের প্রভাব এড়াইয়া বাংলা ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই পর্যন্ত বলা যায়। এই ব্যাপারে বাংলা দেশ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে সংক্ষেপে ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিবৃত করা হইল। জ্ঞানের রাজ্যে কোন বিষয়ে 'শেষ কথা' কেহ বলিতে পারে না। আমিও এরূপ স্পর্ধা করি না।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণ

বাংলা ছন্দের উপাদান চারটি—অক্ষরের মাত্রা পর্ব (ও পর্বাঙ্গ), চরণ (বা পংক্তি) এবং স্তবক বা চরণ-গুচ্ছ। সুতরাং বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া ছন্দোলিপি প্রস্তুত করিতে হইলে এই চারিটি বিষয়ে আলোচ্য অংশের বৈশিষ্ট্য কি কি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে। আমরা নীচে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, স্বরাঘাত বা পর্বাঘাত সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, সেজন্য শুধু প্রথম পংক্তিতে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইল :

```
     ʼʼ        ʼ   ʼ    ʼ     ʼʼ
     –   ●●   –   ●●   – ○   ●●●
(১)  ঐ : আসে : ঐ | অতি : ভৈরব | হরষে   I
        ●○   –○○   ○○   –○○   ○·○
        জল : সিঞ্চিত | ক্ষিতি : -সৌরভ | -রভসে   I
              ○○   –●○   ○○   –●○   ○○●
              ঘন  গৌরবে | নব  যৌবনা | বরষা   I
                  ●··   –● ●   ●○●
                  শ্যাম  -গম্ভীর  সরসা!  I
     ●○   –●○   ●○   –●●   ○●●
     গুরু  গর্জনে | নীপ  মঞ্জরী | শিহরে,  I
     ○●   ʼ –●○   ○●   –●●   ○●●
     শিখী  দম্পতি | কেকা  কল্লোলে | বিহরে।  I
           –   ○●   ●●   ○○○
           দিগ্  -বধূ  -চিত | হরষা,  I
     ○●   –●○   ○●   –●○   ○·●
     ঘন  গৌরবে | আসে  উন্মদ | বরষা॥  I
```

মাত্রা-পদ্ধতি—মৌলিক অক্ষর লঘু, যৌগিক অক্ষর গুরু।

পর্বাঙ্গ—২+৪ অথবা ২+২+২ মাত্রার।

পর্ব—ছয় মাত্রার; শেষ পর্ব আগাগোড়া অপূর্ণ।

চরণ—৬+৬+৩, ৬+৬+৩, ৬+৬+৩, ৬+৩;
৬+৬+৩, ৬+৬+৩, ৬+৩, ৬+৬+৩।

স্তবক—ত্রিপদী ও দ্বিপদী মিশ্রিত দুইটি গুচ্ছের সম্পৃক্ত স্তবক।

মিত্রাক্ষর-বিন্যাস—কক খখ গগ খখ।

শ্রেণী—দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ।

| | |
○○● ○– ○○ ○– ○○●
(২) ফাগুন মাসে | দখিন হতে | হাওয়া I

●○○ ○– ●– ○– ●–
বকুল বনে | মাতাল হয়ে | এল। I

– ●●– –○ ●– ●–
বোল ধরেছে | আম্র বনে | বনে, I

○●○ ● ○ – ○– ●–
ভ্রমর গুলো | কে কার কথা | শোনে, I

– ●○– ○ – ○– ●–
গুন গুনিয়ে | আপন মনে | মনে I

○– ●– ● – ●– ○–
ঘুরে ঘুরে | বেড়ায় এলো | -মেলো। I

●– ●– ○– ●– ● –
কেতুন পুরে | দলে দলে | আজি I

○ – ○– ● ○ – – ●–
পাঠান সেনা | হোরি খেল -তে | এল॥ I

মাত্রা-পদ্ধতি—মিশ্র

পর্বাঙ্গ—৩+৩ মাত্রার ; মাঝে মাঝে ২+৪ বা ৪+২ মাত্রার।

পর্ব—ছয় মাত্রার ; শেষ পর্ব আগাগোড়া অপূর্ণ।

চরণ—ত্রিপর্বিক ; প্রতি পংক্তি ৬+৬+৩ মাত্রার।

স্তবক—অষ্টক। মিত্রাক্ষর কখগগগখঘখ

শ্রেণী—দেশজ ছন্দ (ষণ্‌মাত্রিক)

(৩) দক্ষিণ : পবন : ভরে | অঞ্চল : উড়িয়া পড়ে।

কখন্ যে : নাহি পারি | লখিতে ; I

পুলক : -ব্যাকুল : হিয়া | অঙ্গে উঠে : বিকশিয়া,।

আবার : চেতনা : হয় | চকিতে।। I

মাত্রা-পদ্ধতি—শব্দান্ত যৌগিক অক্ষর গুরু, অবশিষ্ট অক্ষর লঘু। 'দক্ষিণ' ও 'অঞ্চল' শব্দ (এবং 'পবন' শব্দটিও) 'দক্ষিন্', 'অঞ্চল্' ও 'পবন'—এইভাবে দুই অক্ষরের করিয়া পড়া যাইতে পারে।

পর্বাঙ্গ—৩+৩+২ মাত্রার ; মাঝে মাঝে ৪+৪ মাত্রার।

পর্ব—৮ মাত্রার ; শেষ পর্বটি আগাগোড়া অপূর্ণ।

চরণ—চতুষ্পর্বিক ; প্রতি পংক্তি ৮+৮+৮+৩ মাত্রার।

গুচ্ছ—যুগ্মক।

শ্রেণী—ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ।

প্রসঙ্গ-সূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হইয়াছে	ছাপা হইবে
৫	২৪	উক্কিক্	উক্তিক্
১০	১০	অবহঠ্ঠ	অবহট্ঠ
১৬	৬	পৃথ্বিরাজ	পৃথ্বীরাজ
২৫	২০	ফাঁক	ফাঁক বা স্থিতি-স্বর
৩৭	১০	পঞ্চ-পার্বিকবা	পঞ্চ-পার্বিক বা
৪৩		মাত্রান্দছ	মাত্রাছন্দ
৪৪	২২	পর্বাষাত	পর্বাঘাত
৪৬	১	বোজান	বাজান
	১৯	বাংল,	বাংলা
৫৪	৪	ছোউ	ছোট্ট
৫৬	৪	লা-খব	লা-খ ব
৫৯	১০	ভর্তৃঃ	ভর্তুঃ
৬৪	৯	'ও'	'ও'র
৬৫	১৯	অদর্শে	আদর্শে
৬৬	১৭	০ -	● ●
		বাট	বাট
৬৯	৯	ভুস্মি	ভুস্মি
৭৫	১০	সুধীন্দ্রানাথ	সুধীন্দ্রনাথ
৮৯	১০	জাতীর	জাতীয়
৮২	শেষ	পয়ার '-অ'	পয়ার
৯৪	পত্র সংখ্যা	৪৩	৬৪
৯৯	১০	[illegible]	শুদ্ধ-

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হইয়াছে	ছাপা হইবে
১০৯	১	গগমে	গগনে
১১৩	১৫	অশেষ	অশেষ
১১৪	১	শাস্ত্রে	শাস্ত্রে
১২৬	১৭	১৮৬১	১৮৬২
১৩৫	১	হ্যায়	যায়
১৩৯	৫	ডেম্বী	ডোম্বী
১৪০	৬	ঝাণব	ঝাণ ব
১৪১	২০	ছন্দের	ছন্দে
১৪২	১৫	বাহত্র	বহিত্র
১৫২	৯	মধু	মধু
১৫৪	১০	অরুণ	অরুণ
১৫৯	২২	আাছ	আছে
১৮০	১৪	পায় !	পায় ।
„	২৩	পুথি	পুথি
১৮৭	৬	পাউক	যাউক
১৮৮	৬	দেশ	দেশজ
১৮৯	১৭	তুমি	তুমি
১৯৯	১	পর্তুগীজ	পোর্তুগীজ
২০৮	২৩	বাওয়া	যাওয়া
২১১	শেষ	চতুর্থ	চল্লিশের
২১৫	১৮	ওস ংযত	ও সংযত
২২৬	৮	তুই	তুই
২২৮	৪	কবি মন	কবি-মন
২৩৭	৪	যতীন্দ্রনাথ	যতীন্দ্রনাথ
„	১১	অতিমুক্তক	অতিমুক্তক